বিশ্বরূপিণী
মা সারদা

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

আমার প্রিয়তম স্বামী

অশোক ঘোষ

যিনি অমৃতলোকবাসী ও যাঁহার

কল্যাণ-প্রেরণায়

এই অমৃত-গ্রন্থের রূপায়ণ

আমি সেই অমরাত্মার উদ্দেশ্যে

"বিশ্বরূপিণী মা সারদা" গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

সত্য, সুন্দর
'মহান্ বীর',—
তুমি এগিয়ে চল।
যে পথে বিঘ্ন সে পথেই পাথেয়
যে পথে ব্যঞ্জনা সে পথেই ক্রন্দন
মৃত্যুর পরাভব—তুমি অজেয়
সত্য সন্ধান তুমি তা জান।
মলিনতা দূরেযায়
অম্লান মহাকাল
টেনে নেয় যাকে পায়
কত রং কত ছল্
তবু তুমি ভুল না
তুমি পুত্র অমর,—
তুমি বাধা মেন না
ক্ষয় নেই আত্মার।
অসীম যে ব্রহ্মাণ্ড
তুমি তার অংশ
কর্তব্য প্রকাণ্ড
যেমন পরমহংস
সংসার ধামে তোমার আসা মহান্ পরীক্ষা
তোমার নিষ্কাম কার্যের চাই শেষ রক্ষা
সে ভার তোমার উত্তর-সাধক
সব ভক্তের
তাই বলি 'ওহে বীর' ব্রতি হও
ওগো সেই অমৃতের।

—অশোক ঘোষ

নিবেদন

“বিশ্বরূপিণী মা সারদা” ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী মহাশক্তিরূপিণী ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর দিব্যজীবনের মহিমা ও ঘটনাবলী স্মৃতিচারণার আকারে লিখিত হইয়াছে। শ্রীসারদাদেবীর জীবনালেখ্য রচনা করা অতীব কঠিন, কেননা তাঁহার জীবনঘটনা বা লীলাকাহিনী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত তাঁহার আরাধ্য জীবনদেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম সন্তান ও ভক্তগণের জীবনচরিত্রের সহিত। কিরণমালাকে বাদ দিলে যেমন কিরণমালী সূর্যদেবতার সমগ্র রূপ কোনদিনই প্রকাশ পায় না, ঐশ্বর্য, গুণ, মহিমা ও মাধুর্যকে বাদ দিলে যেমন শ্রীভগবানবিগ্রহের পূর্ণরূপের পরিচয় লাভ করা কঠিন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তান ও ভক্তগণের লীলামাধুর্যকে বাদ দিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর জীবন ও লীলাকাহিনীর সামগ্রিক রূপ ফুটিয়া উঠে না। সেইজন্য বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীর লীলামাধুর্যের সঙ্গে তাঁহার সন্তান ও ভক্তগণের দিব্য-সম্বন্ধকে সম্পাকত করিয়াছি শ্রীমার সত্যকার মহিমা ও জীবনের মাধুর্যকে যতদূর সম্ভব রূপ দিবার জন্য। কিন্তু এইকথাও সঙ্গে সঙ্গে জানি যে, একটি দীপালোক কখনই প্রদীপ্ত সূর্যালোকের প্রকাশ ও প্রখরতার পরিচয় দিতে সক্ষম নয়। আমার রচনাও তাই বিন্দুর অঞ্জলি দিয়া সিন্ধুর মহিমাকে বরণ ও পূজা করার প্রচেষ্টামাত্র। তাই আমার অসমর্থ ও অপরিপক্ক লেখনীর প্রকাশে দৈন্য ও ত্রুটি থাকিবে যথেষ্ট। তবে সকল দোষকে যিনি গুণ করিয়াছেন সেই ক্ষমাসুন্দরী করুণাময়ী শ্রীসারদাদেবী নিজগুণে এই সামান্য শ্রদ্ধার অঞ্জলিকে গ্রহণ করিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া লইবেন এই মাত্র ভরসা ও সান্ত্বনা।

পরিশেষে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার পতিদেবতাকে—যাঁহার

দিব্যপ্রেরণা ও আশীর্বাদ ব্যতীত এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ও কর্মে ব্রতী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শ্রদ্ধাপ্রণতি জানাই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজকে—যিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া, বিভিন্নভাবে তাহা সংশোধন করিয়া ও তথ্যবহুল ভূমিকা লিখিয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাপ্রণতি জানাই কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরমপূজনীয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহারাজগণকে এবং আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজনদিগকে—যাঁহারা পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে প্রেরণা দান করিয়াছেন আমার এই গ্রন্থ-রচনার কার্যে।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থে বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর স্মৃতিতর্পণে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ এবং ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়, ভগিনী নিবেদিতা ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও সাধিকাগণের জীবনস্মৃতিকে সম্পর্কিত করিয়া যে ভাবদীপ্ত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি, তাহাতে সকলের জীবনের বহু ঐতিহাসিক ঘটনাকেই এই গ্রন্থে উপস্থাপন করি নাই এইজন্য যে, শ্রীসারদাদেবীর অপার্থিব জীবনলীলার সহিত নিবিড়ভাবে তাঁহাদিগের স্মৃতি যতটুকু জড়িত সেইটুকুমাত্রকেই নিবেদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। নচেৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান ও ভক্তগণের জীবনের অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনা শ্রীমা সারদার জীবনঘটনা ও জীবনকর্মের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত আছে জানি, কিন্তু সেইগুলির সমাবেশ করিয়া শ্রীমার দিব্যভাবদীপ্ত ও ধ্যানগম্য জীবনালোচনাকে আর ভারাক্রান্ত করি নাই। তাহা ছাড়া শ্রীমা ও তাঁহার সন্তানগণের

জীবনঘটনাপঞ্জীর যথাযথ সন, তারিখ প্রভৃতির সন্নিবেশকেও এই ভক্তিগ্রন্থে গৌণ প্রসঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

পরিশেষে নিবেদন করি যে, এই গ্রন্থের সর্বসত্ব কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পুস্তক-প্রচার-বিভাগে (Publication Department) অর্পিত হইল। ইতি

'অনুকূল ভবন'
১৬১/২/১, রাসবিহারী এভিনিয়ু
কলিকাতা-১৯

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

ভূমিকা

ভূমিকা লেখার উদ্দেশ্য—এই গ্রন্থ যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত তাঁহার দিব্য-নিরাবরণ-রূপকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গপার্ষদ ও ভক্তগণ যেভাবে চিন্তা ও উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন করা সাহিত্য বা কাব্য রচনার জন্য নহে, ধ্যানের জন্য ও জীবনদীপ্তির জন্য। অনুশীলনের উদ্দেশ্য, এই গ্রন্থের যিনি জীবনকেন্দ্র তাঁহার লৌকিক ও অলৌকিক লীলাবৈচিত্র্যপূর্ণ উভয় জীবনঘটনার সমাবেশই বিশ্ববাসীর জীবনযাত্রার পথে প্রেরণা ও প্রদীপ্তি আনয়ন করিবে।

শ্রীসারদাদেবী ছিলেন সাধারণের চক্ষে লোকনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিনী ও দিব্যলীলাকর্মের সহচারিণী। কিন্তু শ্রীসারদাদেবীর বিশ্বগত ও বিশ্বোত্তীর্ণ উভয় সত্তার মধ্যে বিশ্বোত্তীর্ণ শাশ্বত সত্তাই বিশেষভাবে ধ্যান ও উপলব্ধির বিষয়। এই বিশ্বোত্তীর্ণ শাশ্বত সত্তা নিত্য ও লীলাশ্রয়ী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত এক ও অভিন্ন। ভক্তির আতিশয্যে বা ভক্তির আকুলতায় মানবীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নহে, পরন্তু সত্যদৃষ্টির দিক হইতে বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অসামান্যা নারীচরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীর জীবনালেখ্য অনুধ্যান করিবার জন্যই এই গ্রন্থ রচনা।

শ্রীসারদাদেবীর বিবাহ দৈবনির্দিষ্ট

শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর যখন অবতারের রূপ পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার স্বভাব-চরিত্র ও জীবনকর্ম সকল-কিছুই হয় মানুষের মতো—যদিও সেই মানব-স্বভাবের মধ্যেই বিকশিত হয় অতিমানব বা দেবচরিত্রের বহু গুণ ও কর্ম। শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিবাহসম্পর্কের যতটুকু প্রমাণপঞ্জী আমরা পাই, তাহার মধ্যে দেখি মানবীয় লীলাকর্মের সংঘটন ও সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত ঘটনারও সমাবেশ।

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব—পূর্বার্ধ)-গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "পাত্রীর অন্বেষণে যখন কোনটিই আত্মীয়দিগের

মনোমত হইতেছিল না, তখন ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) স্বয়ং বলিয়া দেন—অমুক গাঁয়ে (গ্রামে) অমুকের 'মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে—দেখ্‌গে যা'। অতএব বুঝাই যাইতেছে ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার বিবাহ হইবে এবং কোথায় কাহার কন্যার সহিত হইবে। * * অবশ্য ঐরূপ জানিতে পারা তাঁহার ভাবসমাধিকালেই হইয়াছিল।" পুনরায় তিনি লিখিয়াছেন: "কারণ বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধানকালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিবাহ জয়রামবটীনিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইবে—ইহা পূর্ব হইতে স্থির আছে।"

এই সম্পর্কে আর একটি গ্রন্থ হইতে উল্লেখ্ করা সমীচীন মনে করি। গ্রন্থটি লিখিয়াছেন গুরুদাস বর্মন ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থ-পরিচয়ে তিনি লিখিয়াছেন: "স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ঐ সমস্ত গল্পের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণসম্পর্কে বিভিন্ন গল্পের) কতকগুলি একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন এবং আপনারা যে সকল ঘটনা তাঁহাদের গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক লিখিয়া রাখেন। ঐ খাতাখানি এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন" (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত)। শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের বিবাহ-সম্বন্ধে গুরুদাসবাবু লিখিয়াছেন: "এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবোন্মত্তাবস্থায় তিন চারি বৎসর অতিবাহিত করিলে পর তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে এক সময় তিনি তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের বসতবাটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন অতিথি খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল এবং পল্লী-নিকটস্থ অনেকেই সেই গান শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সঙ্গে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আপনার তিন বৎসরের দৌহিত্রীকে ক্রোড়ে করিয়া তথায় গান্ শুনিতে উপস্থিত হইলে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ সেই বালিকাকে বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই মা, এত লোকের মধ্যে কাকে বে (বিয়ে) করবি বলত ?' বালিকা অমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়।" (ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও [তখন শিশু গদাধর] তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সেই গান শুনিবার জন্য গিয়াছিলেন)। "হৃদয় পূর্বোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ঘটনার দুই বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মীয়গণ সেই বালিকার জন্মপত্রিকা দেখিয়া তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সহিত

বিবাহের স্থির করেন।”[১] (শ্রীমার বয়স বিবাহকালে পাঁচ বৎসর ছিল)।

কাহিনী বা ঘটনা যেমনই হউক না কেন, শ্রীসারদাদেবীর বিবাহের পশ্চাতে বেশ একটু অপ্রাকৃত ও অপূর্ব রকমের ঘটনার সমাবেশ দেখি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর ঈশ্বরীয় ভাব

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর জীবনচিন্তা, কর্ম, সাধনা ও সকল-কিছু সাধারণ ও অসাধারণ বিষয়ের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশ। উভয়ের জীবনকর্মের মধ্যে সাধারণত সাধারণ মানুষের চিন্তা ও আচরণই আমরা লক্ষ্য করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করি যে, তাঁহাদিগের সকল চিন্তা ও কর্মের প্রতিষ্ঠা ও উৎস ছিল ঈশ্বরীয় সত্তার প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং ছিল জীবনসিদ্ধির আশীর্বাদস্বরূপ শুদ্ধদৃষ্টি ও আত্মানুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সাধনার রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র। বিশ্বের সকল সাধনমত অনুসরণ করিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন এক অদ্বিতীয় সত্তা ও সত্য—যে সত্তা ও সত্যের সহিত বিরোধ ছিল না কোন ধর্মের চরমসিদ্ধান্তের ও চরমসত্যের সহিত এবং তাহারই জন্য তিনি আপনার সর্বসমন্বয়ী উদার উপলব্ধির আলোকে প্রচার করিলেন—‘যত মত তত পথ’। মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর বা ব্রহ্মবস্তু। এই চরম ও পরম উপলব্ধির পর বিশ্বগত ও বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তা ও সত্যের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ পাতাইলেন মিতালী ও বলিলেন, যিনিই কালী বা শক্তি, তিনিই ঈশ্বর বা শিব, আবার তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও জীব-জগৎ হইয়াছেন। সেইজন্য নির্বিকল্প-সমাধি হইতে মায়ার সংসারে নামিয়া আসিয়া তিনি রসে-বশে থাকিবার জন্য ভাবমুখে অবস্থান করিলেন দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের প্রাণময়ী প্রতিমা শ্রীশ্রীভবতারিণীকে আশ্রয় করিয়া এবং বলিলেন, “মা, আমায় বেহুঁস করিস্ নি, রসে-বশে ভাবমুখে রাখ্।”

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমুখে থাকা ও সন্তানভাব

এই ভাবমুখে থাকিতে বা অবস্থান করিতে হইলে লীলাকর্মক্ষেত্র মায়ার সংসারে একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। এই জন্য

---

[১] এই ঘটনাটি অন্যত্র একটু ভিন্নভাবেও লিখিত আছে

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতবেদান্ত-সাধনায় অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বের চরমানুভূতি লাভ করিবার পর যুগকর্মসাধনের জন্য সন্তানভাবকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিশ্বপ্রতিপালিনী আদ্যাশক্তির প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীভবতারিণী শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধ্যা ও আদরিণী জননী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শরণাগত সন্তান এবং এই পারম্পরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধানিবিড় মাতা-পুত্র-সম্বন্ধ-স্বীকারই শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভাবমুখে' অবস্থানের লীলা ও অভিনয়রহস্য। তাঁহার মধ্যে গুরুভাব ও ঈশ্বরভাবের প্রকাশ বিশেষভাবে থাকিলেও তিনি নিজেই স্বীকার করিতেন: "আমার সন্তানভাব"। তাহারই জন্য চরম-অদ্বৈতানুভূতির পর শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বিশ্বজননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর স্নেহ-নির্দেশ ও প্রাণময়ী প্রেরণা ব্যতীত কোন কর্মে কোনদিন অগ্রসর হইতেন না। তিনি বলিতেন, 'মার ইচ্ছা', 'মা যা করেন', 'তিনি ইচ্ছাময়ী, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল-কিছু হইবে'। বিশ্বকারণ মায়াধীশ ঈশ্বর অথবা কারণাতীত নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত আপনার অভিন্নভাব বা অভেদসম্পর্ককে অটুট রাখিয়া ও জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ বরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সকল কর্মই করিতেন সর্বকারণরূপিণী 'মা' শ্রীশ্রীভবতারিণীর আদেশ, কল্যাণ-নির্দেশ ও প্রেরণা লাভ করিয়া। ইহাই নিত্যের বা নিত্যস্বরূপের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া লীলার আনন্দে 'ভাবমুখে' শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান করার মর্মকথা। এই ভাবমুখে ব্রহ্মরূপিণী শক্তির যেমন স্বীকৃতি আছে, তেমনি আছে শিব-শক্তি-সামরস্যানুভূতিরও স্বীকৃতি। নিত্যে ও লীলায়—নির্গুণে ও সগুণে, আবার নির্গুণ ও সগুণের অতীত তুরীয়সত্তায় যুগপৎ স্থিতি বা সহাবস্থানই হইল ভাবমুখে থাকার তাৎপর্য। ভাবমুখে থাকার উদ্দেশ্যই মায়ার সংসারে থাকিয়া মায়াধীশ হইয়া বিশ্বকল্যাণকর্ম সাধন করা।

বাৎসল্যভাবময়ী বিশ্বজননী শ্রীসারদা

সুতরাং সন্তানভাবকে আশ্রয় করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রহ্মস্বরূপে সমাহিত হইয়া বিশ্ববাসীকে জীবনসিদ্ধির মন্ত্রে অভিষিক্ত করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ব্রত ও উদ্দেশ্য এবং এই ব্রতের ও উদ্দেশ্যের মন্ত্রেই দীক্ষিত করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার দিব্যসহধর্মিনী শ্রীসারদাদেবীকেও। কল্যাণীয়া গ্রন্থলেখিকার ভাষায়ই বলি: 'বিশ্বজননীর বাৎসল্যভাব লইয়া সেইজন্য মর্ত্যভূমিতে শ্রীমার আগমন। আবার গুরুরূপে আচার্যের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীমা সকলকেই জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। পার্থিব জগতের আদর্শ

ও মানবীয় সকল মাধুর্য ও স্নেহ-ব্যবহার লইয়া যেমন শ্রীমার আবির্ভাব, তেমনি অপার্থিব জগতে মহাজ্ঞানদায়িনী-রূপে ও দেবীরূপে তাঁহার প্রকাশও প্রত্যক্ষ ও নিবিড় অনুভবের বিষয় ছিল। স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধানকে তাই আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবী নিকট করিয়া বিশ্বের সকল মানুষের সাধনার, অধ্যাত্মভাবনার ও শাশ্বত শান্তিলাভের পথকে সুগম ও সচ্ছল করিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্গের দেবী হইলেও শ্রীমা সারদা ছিলেন মর্ত্যবাসীর স্নেহ ও আদরের জননী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমাকে ঠিক সেইভাবেই গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীমা ছিলেন বাৎসল্যময়ী চিরকল্যাণী ও অভয়দায়িনী। সেইজন্য তাঁহার মধ্যে সর্বদা সর্বভয়হরা অভয়ার আবেশ ও বরদাভাবের প্রকাশ বিদ্যমান ছিল।'

এই গ্রন্থ-রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমান "বিশ্বরূপিণী মা সারদা"-গ্রন্থ শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীর পার্থিব ও অপার্থিব লীলাকর্মের ঐতিহাসিক নির্দেশন মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীকে তাঁহাদিগের লীলাসহচর ও সহচরিগণের জীবনকথার সহিত সম্পর্কিত করিয়া স্মৃতিচারণার আকারে এই গ্রন্থ লিখিত। কল্যাণীয়া লেখিকা সাহিত্য ও জীবনী-রচনার ক্ষেত্রে নবাগতা হইলেও তাঁহার সাহিত্য-সম্ভার ও ঘটনাসন্নিবেশ বেশ পরিচ্ছন্ন, ভাবসম্পদযুক্ত ও রসোত্তীর্ণ হইয়াছে এবং কেবলই ভক্তজন-মনে নহে, সর্বশ্রেণীর জ্ঞানলিপ্সু মানুষের অন্তরে আনন্দস্মৃতি-জড়িত এক ভক্তি-শ্রদ্ধার আবেদন সৃষ্টি করিতে এই গ্রন্থ সক্ষম হইবে বলিয়া মনে করি।

জীবনচরিত্র-লেখার রীতিবৈচিত্র্য

কোন চিন্তাশীল ও খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ মানুষ অথবা দেবচরিত্রসম্পন্ন অতি-মানুষের জীবনী বা জীবন-ইতিহাস লিখিবার রীতি বা শৈলী ও গতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঠিক এক রকমের নহে। কোথায়ও সন, তারিখ ও ক্রমসজ্জিত ধারাবাহিক ঘটনাপুঞ্জের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিয়া জীবনচরিত লিখিবার রীতি ও নিয়ম আছে। আবার কোথাও বা সন, তারিখ ও জীবনের ঘটনাপারম্পর্যের সঠিক সমাবেশকে গৌণ করিয়া মুখ্যত বা প্রধানভাবে জীবনের আন্তর প্রকৃতি, মাধুর্য ও সর্বোপরি ভাবসম্পদ, চিন্তাবৈশিষ্ট্য ও নিবিড় অনুভূতির পরিচয় দেওয়ার রীতিকে

সমাদরের সহিত গ্রহণ করা হয়। তাহা ছাড়া স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়া জীবনের ঘটনাপারম্পর্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবনকর্মের সকল-কিছু প্রকাশের শৈলীরও প্রচলন আছে এবং এই শেষোক্ত রীতির সমাদরই সাহিত্য ও রস-রচনার ক্ষেত্রে ও বিশেষ করিয়া অধ্যাত্মসাধনচিন্তার জগতে দরদী মানুষের নিকট স্বীকৃত। কল্যাণীয়া ও শ্রদ্ধাশীলা লেখিকা এই শেষোক্ত শ্রেণীর রীতি বা ধারাকে গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষভাবে। সেইজন্য অপ্রাকৃত চরিত্রময়ী শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা এবং উপদেশ রচনা ও সংকলন করিয়াছেন তিনি কেবলই সাহিত্য বা অলঙ্কারসমৃদ্ধ কাব্যসৃষ্টির জন্য নয়, পরন্তু তিনি স্বর্গীয় ভাবপ্রেরণা, রসানুভূতির স্পর্শ ও আধ্যাত্মজীবনচিন্তার সার্থকতাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন মহাশক্তিরূপি লোকনায়িকা শ্রীসারদাদেবীর জীবনালোচনার মধ্য দিয়া আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণতির অঞ্জলি নিবেদন করিয়া। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান ও ভক্তগণের সহিত শ্রীসারদাদেবীর কী মধুর, স্নেহনিবিড় ও আনন্দমুখর সম্পর্ক ছিল তাহারই বাস্তব চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করিয়াছেন কল্যাণীয়া লেখিকা।

দেবচরিত্রের বর্ণনায় অপ্রাসঙ্গিকতা

দুঃখের বিষয়, মহামানব ও মহামানবীদের জীবনচরিত্র রচনা করিতে গিয়া অনেকে অপ্রাসঙ্গিক মানবীয় মনের সংস্কার এবং সামাজিক ও বংশানুক্রমিক আচার, কর্ম ও ঘটনার সমাবেশ করেন মানবপ্রকৃতির রীতি ও নিয়মের নিদর্শন দিবার জন্য—যাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। জাতিবিচার, বর্ণবিচার, খাদ্যবিচার, অথবা বংশানুক্রমিক ধারা ও প্রকৃতির অতিসাধারণ পরিচয়কে দেবচরিত্রের সহিত সম্পর্কিত না করাই সমীচীন। কেননা মহামানব বা অবতারকল্প মহাপুরুষগণের জীবনচিন্তা ও কর্মজীবন সমাজের সকল মানুষেরই অনুসরণীয়, সুতরাং লোকশিক্ষা দিবার জন্য যাঁহাদিগের আবির্ভাব ও যাঁহাদিগের ভাগবত জীবনকে অনুসরণ করিয়া অসংখ্য মানুষ তাঁহাদিগের জীবন গঠন ও জীবনে শান্তি ও পরমসান্তনার আশীর্বাদ লাভ করিবে তাঁহাদিগের জীবনচিন্তা ও জীবনকর্ম হইতে সাংসারিক ও সামাজিক সংস্কারের অনুলিখনকে দূরে রাখাই ভাল এবং ধীমান ও বিচারদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষমাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। মানবশরীর ধারণ করার জন্য মায়িক সংসারের দৈন্য ও দুর্বলতার কিছু কালিমা সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু একথাও আবার সত্য ও স্বাভাবিক যে, মহামানব ও

অবতারসংকল্প মহাপুরুষগণ মায়িক সংসারের সকল দৈন্য-দুর্বলতার বহু ঊর্ধে থাকিয়াই অসংখ্য মানুষের কল্যাণ সাধন করেন। তাই তাঁহাদিগের জীবনালোচনায় পার্থিব প্রকৃতি-প্রশ্রয়ের ইতিবৃত্ত না লিখিয়া বরং দমন ও সংযমনের ইতিকথার পরিচয় দেওরাই সমীচীন। সাধারণ মানবের সহিত অতিমানবের পার্থক্যও এইখানে।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

লীলাময়ী শ্রীসারদাদেবীর বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় দেওয়া সহজসাধ্য নয়। যিনি স্বর্গের দেবী প্রতিমা হইয়াও মর্ত্যলোকে আপনার দিব্য-রূপ ও মহিমাকে সর্বদা সাধারণ লোকলোচন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, যিনি পার্থিব সকল বন্ধন ও মায়াপ্রহেলিকার অতীতা হইয়াও বিশ্বের সকল মানুষকে আপনার হইতে আপনার করিয়া ভালবাসিয়াছিলেন এবং সকলের দুঃখ-বেদনায় কাতর হইয়া সমবেদনা ও স্নেহ-করুণার বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্র, জীবন ও লীলাকর্ম যে অসামান্য ও অসাধারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেইজন্য অসামান্য ও অপার্থিব শ্রীমার লীলাকথা ও মাধুর্য বর্ণনা করিতে হইলে অধিকার ও যোগ্যতা আহরণ করিতে হইবে এবং শরণাগতির ভাব ও শ্রদ্ধা থাকিলে তবে সেই অধিকারযোগ্যতা করুণাময়ী শ্রীমা-ই প্রদান করিবেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ উ° ২।২৩)। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুন যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন: 'শিষ্যস্তেঽহং স্বাধি মাং তাং প্রপন্নম্' ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহার সকল দৈন্য ও দুর্বলতা দূর করিয়াছিলেন তেমনি শ্রীমা সারদার শরণাপন্ন হইলে তিনি করুণা করিয়া সকল অসামর্থ্য দূর করিয়া দিয়া তাঁহার স্বরূপ ও তত্ত্ব বুঝিবার ও যথার্থ মহিমা অনুভব করিবার শক্তি দান করেন।

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্

তবে তাঁহাদিগকে বুঝিবার ও জানিবার শক্তি-সামর্থ্য শ্রীমা দান করিলেও অনেক ক্ষেত্রে "আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি অথৈব চান্যঃ। আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃনোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ,"—অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে বিস্ময়কর অভিনব স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে করেন, কেহ তাঁহার

অনন্যসাধারণ কর্ম, আচরণ ও মহিমাকে বিস্ময়কর ও অলৌকিক সামগ্রী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, আবার কেহ তাঁহার দিব্যলীলাকর্ম দেখিয়া ও শুনিয়াও রহস্যময় বলিয়া মনে করেন এবং সেজন্যই সচ্চিদানন্দরূপিণী শ্রীসারদাদেবী যদি আপনার স্বরূপ, সাধক ও সন্তানদিগের নিকট করুণা করিয়া প্রকাশ করেন তবেই তাহা তাহাদিগের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আমরা উপনিষৎ, গীতা ও অন্যান্য দর্শনগ্রন্থ হইতে আত্মস্বরূপের কথা শুনি ও মর্ম জানিতে পারি, কিন্তু সেই জানা বা অনুভব করাও নির্ভর করে জ্ঞানদৃষ্টি ও স্বরূপানুভূতির উপর। কঠোপনিষদে আছে: "তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্",—দুর্দর্শ ও রহস্যময় সেই আত্মবস্তু, সেইজন্য একমাত্র ধীর ও কৃপাপ্রাপ্ত জ্ঞানীই অধ্যাত্মযোগের সাহায্যে আত্মার নিরাবরণ রূপ দর্শন বা অনুভব করিতে পারেন। মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। মায়ার আবরণ মুক্ত না হইলে, অথবা মায়ার আবরণ শ্রীমা মুক্ত করিয়া না দিলে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করা কেবলই সাহিত্যকর্মের বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা সম্ভব নয়।

মনে পড়ে, ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র (ঘোষ) একবার শ্রীসারদাদেবীসম্বন্ধে ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন: "ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি চিন্তা করতে পার যে, তোমাদের সামনে গ্রাম্যবধূবেশে জগতের মা দাঁড়িয়ে আছেন! তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, যিনি আজ সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও সংসারের আর সব রকম কাজকর্ম করছেন তিনিই জগজ্জননী মহামায়া ও মহাশক্তি। সর্বজীবের মুক্তির জন্য তিনি মাতৃত্বের পরমাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাও তাই যে, শ্রীমা মহাজ্ঞান-দায়িনী সরস্বতী, সংসারে জ্ঞান দিবার জন্য আসিয়াছেন আপনার রূপ ঢাকিয়া ছদ্মবেশে।

শ্রীশ্রীভবতারিণী ও শ্রীসারদাদেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান ও ভক্তগণ জানিতেন যে, শ্রীসারদাদেবী শ্রীশ্রীভবতারিণী আদ্যাশক্তিরই প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং এই পরমরহস্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেও জানিতেন। সেইজন্য তিনি শ্রীসারদাদেবীকে সকল প্রকারে উপদেশ দান করিয়া 'সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনপথের অভিজ্ঞা পথিক' করিয়া লইয়াছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে (পঞ্চম খণ্ড) শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী

সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন: "সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ আবরণের দুর্ভেদ্য অন্তরালে সর্বদা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়া নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবীর মহাশক্তিময়ী বিশ্বমাতৃত্বের রূপ যে দক্ষিণেশ্বরী শ্রীশ্রীভবতারিণীর রূপ হইতে ভিন্ন নয় তাহারই একটি রহস্যময় স্বপ্ন-কাহিনীর কথা এখানে উল্লেখ করি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" হইতে। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন, পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য। "পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থানে দারুণ জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। ** পথিমধ্যে এরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল।"

শ্রদ্ধেয় সারদানন্দ মহারাজ তাহার পর শ্রীসারদাদেবীর নিজের উক্তি গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন: "জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁস, লজ্জাসরম-রহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল,—মেয়েটির রঙ কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই। বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল,—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত যে, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?' রমণী বলিল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (শ্রীঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐ সব আর হল না।' রমণী বলিল, 'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈকি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' আমি বললাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটি বলিল, 'আমি তোমার বোন হই।' আমি বললাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ?' ঐরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

কিন্তু কে ঐ কৃষ্ণবরণী রমণী—শ্রীমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়াছিলেন অপরূপ জ্যোতি ও লাবণ্যের ছটা লইয়া! মনে হয়, সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরের অধিশ্বরী শ্রীশ্রীভবতারিণী আসিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণসহচারিণী

শ্রীসারদাদেবীর নিকটে। শ্রীমার সেই দিব্যস্বপ্নই প্রমাণ করে তাঁহার দেবীত্বের, বিশ্বমাতৃত্বের ও ভাগবত স্বরূপের!

যাহা হউক কোনরূপে পিতার সহিত শ্রীমা উপস্থিত হইয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্নিধানে। "শ্রীমাকে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার (শ্রীমার) শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?" শ্রীমা আরোগ্য লাভ করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ঔষধ-পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া পরে নহবত-ঘরে নিজ জননীর (তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের বৃদ্ধা গর্ভধারিণী জননী জীবিতা) নিকটে শ্রীমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মাতৃতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবনের ঘটনাবলী সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। শিব ও শিবানীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও লীলা মাধুর্যপূর্ণ। সাধারণের নিকট তাহা অভিনব ও বিস্ময়কর হইলেও চক্ষুষ্মান মরমী সাধকগণের নিকট অর্থপূর্ণ ও গভীর ধ্যানের বিষয়। শ্রীসারদাদেবী তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিতেন সাক্ষাৎ শিবাবতার-রূপে এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবও শ্রীসারদাদেবীকে দেখিতেন সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিমূর্তি আদ্যাশক্তি-রূপে এবং শ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পূজাই তাহা প্রমাণ করে। শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'গুরু' বা 'গুরুদেব' বলিয়াও সম্বোধন করিতেন। তবে শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর পরস্পরকে কীভাবে দেখিতেন ও জ্ঞান করিতেন তাহার নিদর্শন দিতে গেলে সাধক রামপ্রসাদের একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গানটি হইল—

কে জানে মন কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে
সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে
হংসীরূপে করে রমণ॥

আত্মারামের আত্মা কালী
 প্রমাণ প্রণবের মতন।
তাঁরা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
 ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড
 প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মন
 অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে
 সন্তরণে সিন্ধু-তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না
 ধরবে শশী হয়ে বামন।[২]

গানটির মর্ম ও তত্ত্বকথা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিলে একটি বৃহৎ তন্ত্রগ্রন্থে পরিণত হইতে পারে। সাধক রামপ্রসাদও আপনার অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছেন মহাকালী ও মহাকালের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে। তিনি বলিয়াছেন

২। (ক) গানটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' থেকে ও 'শ্রীরামপ্রসাদসঙ্গীত' থেকে নেওয়া।
(খ) 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ৫ম খণ্ডে ইহার সাজানো একটু ভিন্ন রকমের:
কে জানে কালী কেমন॥
* * *
আত্মারামের আত্মা কালী
 প্রমাণ প্রণবের বচন।
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে
 ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
 প্রকাণ্ড তা বুঝে কেমন।
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মন
 অন্য কেবা জানে তেমন।
* * *
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Memoirs of Ramakrishna* গ্রন্থে এই গানটির ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন।

যে, একমাত্র মহাকাল শিবই মহাকালী শিবাণীর মর্মকথা জানিয়াছেন ও উপলব্ধি করিয়াছেন।

·

শ্রীসারদাদেবীতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে দেখা যায়, তিনি শ্রীসারদাদেবীর ভাগবত স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য বলিয়াছিলেন: "যে মা নহবতে বাস করেন, যিনি এখন আমার পদসেবা করিতেছেন, তিনিই মন্দিরে শ্রীশ্রীভবতারিণী-রূপে পূজিতা।' "শ্রীসারদা সাক্ষাৎ জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী।" আর একবার ভাগিনেয় হৃদয়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: "দেখ্ হৃদু, এটার মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়া) যে আছে, সে যদি ফোঁস করে তাহলে বাঁচলেও বাঁচতে পারিস, কিন্তু ওর মধ্যে (শ্রীমাকে দেখাইয়া) যে আছে সে যদি ফোঁস করে তাহলে তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।" শ্রীমা যে সাক্ষাৎ মহাশক্তিময়ী দেবী শ্রীশ্রীঠাকুর সে' কথারই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন হৃদয়নাথকে। তাহাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার সহিত নিজের অভেদভাবের কথাও বহুবার বহুভাবে বলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতে হয় যে, সাধক রামপ্রসাদের মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন, 'কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ'। মূলাধারশায়িনী কুলকুণ্ডলিনী কামকলা হংসী চক্রে চক্রে—পদ্মে পদ্মে (plexus) নিজেকে প্রকাশ করিয়া ও জ্ঞানের পরিধিকে পূর্ণ করিয়া পরিশেষে যেমন সহস্রার-পদ্মবনে সচ্চিদানন্দরূপী পরমশিবের সহিত আপন সত্তা মিশাইয়া দেন, তেমনি মহাশক্তি ও চৈতন্যরূপিণী শ্রীমা সারদা আপনার মাধুর্যময়ী মহিমা লীলার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে করিতে পরমহংসরূপী সচ্চিদানন্দ-শ্রীরামকৃষ্ণে আপনাকে মিশাইয়া দেন। এই তত্ত্ব পরমরহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয়। সেইজন্য রামপ্রসাদ বলিয়াছেন: "আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না"। অর্থাৎ মন বা বুদ্ধি (intellect) দিয়া পরমবোধির (intuition) স্বরূপকে বোঝা যায় না, বুঝিতে হইলে প্রাণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। প্রাণই প্রজ্ঞা—জ্ঞানানুভূতি। জ্ঞান অনুভূতিরই স্বরূপ। কালীতত্ত্ব বা মাতৃতত্ত্ব অথবা শ্রীসারদাদেবীতত্ত্ব বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে হইলে প্রাণের বা বোধির সহায়তা প্রয়োজন, মন বা বুদ্ধি সেখানে অচল ও পঙ্গু। মনের বুঝাবুঝিতে অনেক সময় সংশয় বা সন্দেহ থাকে, তাই প্রাণ বা বোধির সাহায্যে তত্ত্বের নির্ধারণই ভ্রম-প্রমাদশূন্য যথার্থ হয়। সাধক রামপ্রসাদেরও

অভিপ্রায় যে, শিব-শক্তিতত্ত্ব বুঝিতে বা হংস-হংসী-রহস্য ভেদ করিতে হইলে মন-বুদ্ধির পারে প্রাণের অনুভূতির প্রয়োজন। ঠিক সেইরূপ শ্রীসারদাতত্ত্ব কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাতত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে প্রাণের প্রসন্নতার সাহায্য লইয়া বোধি বা প্রজ্ঞালোকের পথচারী হইতে হইবে।

শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধক রামপ্রসাদের রচিত গানই বেশীরভাগ সময় গান করিতেন, আর গান করিতেন শক্তিসাধক কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ (রাণী ভবানীর পুত্র) প্রভৃতির। সাধক রামপ্রসাদ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসূরী ও অধ্যাত্মসাধনপথে প্রাণদীপ্ত প্রেরণার কেন্দ্র। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে কাল-ব্যবধান আনুমানিক ৬২ বৎসর, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের মহাসমাধির আনুমানিক ৩০২ বৎসর পরে রামপ্রসাদের আবির্ভাব। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিমতের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: "যেমন দেখ, চণ্ডীদাস সুর, তারপরেই শ্রীচৈতন্য সেই সুরকে প্রাণময় করিয়া জীবন্তরূপ। ঠিক তেমনি রামপ্রসাদে সুরু, আর তার পরেই রামপ্রসাদের সুর অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ। * * যাহা রামপ্রসাদে সুর, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণে রূপ।" ('শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষপ্রসঙ্গে', ১৯৬১, পৃ° ২৬)।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অধ্যাত্মসাধনা বা শক্তিসাধনার সময়েই শুধু নয়, জীবনের সকল সময়েই মাতৃতত্ত্বসাধক রামপ্রসাদকে স্মরণে রাখিয়াছিলেন এবং সেইজন্য রামপ্রসাদের গানে কালীর বিশ্বমোহিনী রূপ ও কালীতত্ত্বের মহিমাময় আদর্শ ও চিন্তাকে তিনি আপনার জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কালী-ব্রহ্মকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া সকল ধর্মাধর্মের পারে গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতের অতীত হইতে পারেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে সাধনার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই রামপ্রসাদের কথা বলিতেন। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের আপন মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: "এই সময়ে (সাধনার সময়ে) একদিন তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) গান শুনাইতেছিলেন, এবং তাঁহার (কালীর) দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 'মা, এত যে ডাকছি, তার কিছুই কি তুই শুনছিস্ না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস আমাকে কি দেখা দিবি না?" সত্যই

দিব্যোন্মাদের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিন বা কাতর হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া ও ঘাসে মুখ ঘসড়াইয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'মা, আর একদিন চলে গেল, রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিলি না?' দেখা যায়, সাধক রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণপথের যেন চিরসহচর ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃতত্ত্ব ও দর্শনদৃষ্টি অনেক পরিমাণেই সাধক রামপ্রসাদের মাতৃতত্ত্ব ও দর্শনচিন্তার সমতুল্য বলা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমান নয়; কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিচ্ছবি, আর সাধক রামপ্রসাদের কালীব্রহ্মতত্ত্বে মায়াবরণের কিছুটা স্পর্শ থাকায় (কালীরূপের প্রতি তাঁহার একান্ত আকর্ষণ ও মমতা থাকায়) তাহাকে অদ্বয়তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। অবশ্য এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার স্থান এখানে নয়। তবে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে বলা যায়, সাধক রামপ্রসাদ যেখানে তাঁহার আরাধ্যা দেবী জগদীশ্বরীকে বলিতেছেন,

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো মা দীন-দয়াময়ী)।

*　　*　　*

এবার, তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা করে যাব॥
খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব,
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে
মনোমানসে পূজিব॥

সেখানে 'আমি-তুমি'-র বিভেদহীন আত্মসমর্পণের মধ্যে একটু 'কিন্তু'-রূপের ব্যবধান আছে। রামপ্রসাদ একেবারে সাকার-রূপকে উদরস্থ বা বিলুপ্ত করিয়া নিরাকার ও নির্গুণ-রূপে ডুবিয়া যাইতে ইচ্ছুক নন। তিনি 'কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব' পরিত্যাগ করিলেও নির্বিকল্প-সমাধিতে আত্মস্থিতি অপেক্ষা মহাকালীরূপিণী জগদীশ্বরীকে সাকার ও সগুণ ভাবে (সবিকল্পক জ্ঞান লইয়া) হৃদিপদ্মাসনে বসাইয়া পূজা করিতেই অভিলাষী এবং সেইজন্য অদ্বৈতানুভূতির কিংবা নির্বিকল্প-সমাধির সমতলে দাঁড়াইয়া রামপ্রসাদের মাতৃতত্ত্ব ঠিক অদ্বয়ব্রহ্মবাদের দাবী করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব সগুণ ও সাকার—নির্গুণ ও নিরাকার এই দুই রূপকে লইয়া পূর্ণ ও অখণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মতত্ত্ব বা মাতৃতত্ত্বের সর্বগ্রাসী অনন্তপ্রসারী রূপ মায়াতীত ও মায়াবিলাসী সকল অরূপ ও রূপকে লইয়াই সামগ্রীকভাবে পূর্ণ ও অখণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্বের এই সামগ্রীক রূপে শিবও আছেন, শক্তিও আছেন,—নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যও আছেন, সোপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যও আছেন, আবার সেই মাতৃতত্ত্ব শিব-শক্তি এবং নিরুপাধি-সোপাধিক এই দ্বন্দ্বসত্তাবিহীন বা দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত হইয়াও বর্তমান আছে।

মোটকথা শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মময়ী মা বা মাতৃতত্ত্ব বিশ্বরূপে বা জীব-জগদ্রূপেও যেমন প্রকাশমান, তেমনি বিশ্বোত্তীর্ণ মায়ালেশশূন্য তুরীয়-ব্রহ্মরূপেও প্রকাশমান। একই বিশুদ্ধতত্ত্ব বা পরমসত্য দুই রূপে (in two orders of reality) প্রতিভাত বা প্রকাশিত হইলেও তাহার দ্বন্দ্বাতীত স্বরূপের কোন বিচ্যুতি বা বৈলক্ষণ্য হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বয়ব্রহ্ম বা মাতৃতত্ত্ব-রূপ দর্শন (philosophy) তাই স্বতন্ত্র ও অভিনব। ইহা আচার্য শঙ্কর-সমর্থিত মায়াতীত অদ্বয়তত্ত্ব নয়, তন্ত্রনির্দিষ্ট চনকাকারে[৩] শিব-শক্তিরূপ অখণ্ড শিবাদ্বৈত নয়, কিংবা আচার্য রামানুজ-প্রতিপাদিত গুণ-গুণী বা বিশেষণ-বিশেষ্যযুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতও নয়, পরন্তু সাকার-নিরাকার ও সগুণ-নির্গুণ অথবা সোপাধিক-নিরুপাধিক দুই ব্রহ্মরূপকে লইয়াই এক, অখণ্ড ও অদ্বৈত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, যিনি নির্গুণ মায়ার অতীত, আবার তিনিই সগুণ হইয়া জীবজগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপে প্রকাশমান। নিত্য ও লীলা সাধারণত পৃথক বলিয়া মনে হইলেও স্বরূপত এক ও অভিন্ন, কেননা যাঁহারই নিত্য, তাঁহারই লীলা; যেমন স্থির-সাপ ও চলা-সাপ, সাপ বা সর্প দুই নয়—এক, কেবল সর্পের স্থিরতা ও চলমানতা-রূপ প্রকাশসত্তা পৃথক বলিয়া প্রতীত হয়।[৪]

৩। এখানে তন্ত্রশাস্ত্রের অদ্বয়বাদ-সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্রের (তাহা হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক অথবা হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব হোক বা শৈব হোক বা শাক্ত হোক) মূল-দার্শনিক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরমসত্য অদ্বয়স্বরূপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ত্ব শুধু দ্বয়ের অভাব নয়—তাহা দ্বয়ের মিথুনতত্ত্ব, দ্বয়ের নিঃশেষ-সমরসতা, যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়সিদ্ধি হিন্দুতন্ত্রমতে দ্বয়তত্ত্বই হইল শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব—একই উৎসের যেন দুইটি ধারা। * * দার্শনিক ভাষায় শিবতত্ত্বই জ্ঞাতৃত্ব—শক্তিতত্ত্বই জ্ঞেয়ত্ব, শিবই পরমসঙ্কুচিত বিন্দু—শক্তিই পরম-প্রসারিতা নাদরূপিণী।

৪। এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকা-লেখক-লিখিত A Guide to the Complete Works of Swami Abhedananda গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'-রচয়িতা শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার সেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা'-গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন :

"বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
শূন্যেতে পাপ পুণ্য মান্য
গণ্য ক'রে সব খুয়ালে।

"বাষ্পের যেমন স্থূলাবস্থা—মেঘ, জলকণা, জল, বরফ তেমনি মহাকাশের স্থূলাবস্থা পঞ্চভূত। আবার এ' পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হয়ে জীব-জগৎ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম যেমন, তেমনি নিত্য থেকে লীলা ও লীলা থেকে নিত্য। * * তিনি (পরমহংসদেব) আরও একটি বড় সুন্দর কথা বলতেন—যাঁর লীলা, তাঁরই নিত্য। এজন্য ঠাকুর শঙ্করের মতো জীব-জগৎ মিথ্যা—একথা বলেন নি। তবে শঙ্করের মতকেও উড়িয়ে দেন নি" (পৃ° ৭৪)।

"শেষকথা—যিনি সাকারে, তিনিই নিরাকারে। সাকার নিরাকার দুই-ই তিনি। এ' দুই ছাড়া আরও যা-কিছু আছে—তাও তিনি। একটি বই তো আর দোসরা জিনিস নেই, সুতরাং যতই রকমারি কথা শুনেছ, যত রকমারি দেখেছ, সব সেই তাঁর, সকলেই সেই তিনি। যিনি আধার, তিনিই আধেয়। যিনি অদ্বৈত, তিনিই দ্বৈত। দ্বৈতাদ্বৈত দুই সে একেরই খেলা।" (পৃ° ১০৬)।

একজন ভক্তকে লিখিত শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর একটি পত্রে (১২/৩/১৯৩২ তারিখে লেখা) দেখি, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন : "তুমি প্রশ্ন করিয়াছ—শ্রীসারদাদেবী কে এবং কেন তাঁহার মন্ত্র দিয়াছি ইত্যাদি? তাহার উত্তর, শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করিলে ধ্যানের সময় তিনি বুঝাইয়া দিবেন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন : 'কে জানেরে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দর্শন' ইত্যাদি। তাঁহাকে বুঝিতে গিয়া শিব পাগল হইয়াছিলেন।

সাকার সাধকে তুমি মা সাকারা,
নিরাকার-উপাসকে নিরাকারা,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়,
সেও তুমি তারা ত্রিকালবর্তিনী॥

যে-অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে-অবধি সে পরব্রহ্ম কয় ;
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়,
সেও তুমি তারা ত্রিলোকব্যাপিণী ॥

"ইহা বুঝিতে পারিলে শ্রীসারদাদেবীকে চিনিতে পারিবে। কেবল intellect দিয়া বুঝিতে পারিবে না।[৫] যেরূপ অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভিন্ন, সেরূপ ব্রহ্ম ও মায়া, শ্রীঠাকুর ও শ্রীসারদাদেবীও অভিন্ন। মায়া সেই পরমেশ-শক্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী, অর্থাৎ শুদ্ধ-মন ও অশুদ্ধ-মন-রূপে আমাদের মধ্যে প্রকাশমান হন। অবিদ্যার দুই শক্তি (আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি) আছে।

ত্বমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম-আচ্ছাদিনী,
মহামায়া-রূপে ত্রিজগত-মনমোহিনী।—ইত্যাদি

শ্রীসারদাদেবীর কৃপা না হইলে সংসারের মায়া মোহ কাটে না, বিবেক-বৈরাগ্য আসে না এবং জ্ঞানচক্ষু খোলে না, সেইজন্য তাঁহার উপাসনা

৫। এখানে সাধক রামপ্রসাদের গানের 'আমায় মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না' অংশের অর্থ সুস্পষ্ট। ব্রহ্মবস্তু অবাঙ্‌মনসোঽগোচর,—বাক্য ও মনের (বুদ্ধির) ধারণার অতীত। যথার্থ উপলব্ধির জন্য তাই প্রাণ বা প্রজ্ঞারূপ-আলোকের প্রয়োজন। প্রাণ ঈশ্বর ও মন হিরণ্যগর্ভ। মায়াধীশ ঈশ্বরচৈতন্যের উপলব্ধিতেই মায়াতীত বিশুদ্ধচৈতন্যের উপলব্ধি সম্ভব, কেননা চৈতন্যাংশে ঈশ্বর ও মায়ানির্মুক্ত তুরীয়-ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন।

ব্রহ্মবস্তু মন-বুদ্ধির অগোচর হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ব্রহ্ম শুদ্ধমনের গোচর। শুদ্ধমন বা শুদ্ধবুদ্ধি ও শুদ্ধচৈতন্য একই। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'-রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা' হইতেই উদ্ধৃত করিয়া বলি : "শ্রীশ্রীঠাকুর গাহিতেন,

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে,

* * *

ভ্রমর কালো চরণ কালো কালোয় কালো
মিশে গেল। —প্রভৃতি

"মন যখন শ্যামাপদ-নীলকমলে মজে, তখন সে মন চৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তখন আর তার মন নাম থাকে না, তখন তার নাম শুদ্ধমন বা চৈতন্য। এখন তার পূর্বেকার বর্ণ ফিরে গিয়ে শ্যামার পায়ের যে বর্ণ সে বর্ণ হয়ে গেছে। আবার এদিকে মা চৈতন্যময়ী, সে চৈতন্যময়ীর সঙ্গে মন-চৈতন্য সমজাতি হওয়াবশতঃ কালোয় কালো মিশে গেল এবং এ' মিলনে সব গোল মিটে গেল, সংসারের খেলা ফুরালো এবং তত্ত্বে তত্ত্ব এক ঠাঁই হল।" —(ঐ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ° ৭২)। সুতরাং শ্রীরামপ্রসাদের 'মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না' কথার মধ্যে মন যখন প্রাণে রূপান্তরিত হয় তখন মনের অক্ষমতা প্রাণের সামর্থ্যে পরিণত হয় ও তখনই তত্ত্বোপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়।

আবশ্যক। তাঁহার কৃপা হইলে তিনি (শ্রীমা) শ্রীঠাকুরকে (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) দেখাইয়া দিবেন। সেইজন্য (শ্রীমার) কৃপা প্রার্থনা করা আবশ্যক।"[৬]

শ্রীমা সারদাদেবীর যথার্থ রূপের বা স্বরূপানুভূতির ক্ষেত্রে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও কৃপার কথা বলিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের সাধনায় জ্ঞানবিচারের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্নীত হইলেও ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কৃপা ও শরণাগতির প্রয়োজন আছে এবং এই কৃপাভিক্ষা অদৃষ্টের বা প্রারব্ধের (Providence) উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বরং পুরুষকার-সহকৃত ভক্তিসাধনার উপর। পুনরায় এই ভক্তিসাধনা বা ভক্তিযোগ জ্ঞানসাধনা বা জ্ঞানযোগের মোটেই অন্তরায় নয়, বরং অনুকূল বা সহায়ক।

মাতৃতত্ত্বের অনুধাবন ভাবের বিষয়

সত্যবস্তু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ও জানার প্রবৃত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রপত্তি বা শরণাগতির ভাব সাধকের মধ্যে থাকিলে দুর্জ্ঞেয় অধ্যাত্মতত্ত্বের মর্মভেদ করা সম্ভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাতত্ত্ব সেইরূপ সাধারণত দুর্জ্ঞেয়, সেইজন্য কোন একটি ভাবকে (সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, সন্তান প্রভৃতি ভাব) আশ্রয় করিয়া তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিলে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হয়। সাধক রামপ্রসাদ তাই বলিয়াছেন,

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার-ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধরতে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে।
ওরে, কোঠার ভিতর চোর-কুঠারী,
ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
* * *
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতারে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি,
বোঝ না রে মন ঠারেঠোরে॥

৬। পত্র-সংকলন (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)। কল্যাণীয়া শ্রীমতী শুক্লাদেবীও তাঁহার এই গ্রন্থে "শ্রীমা সারদা ও স্বামী অভেদানন্দ" প্রসঙ্গে এই পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়া তবে সাধন-জগতে তত্ত্ব-উপলব্ধি করিবার জন্য যত্ন বা চেষ্টা করিতে হয়। রামপ্রসাদ সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই সন্তান-ভাবকে আশ্রয় করিয়া শরীরগুহায় (কোঠায়) দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যময়ী মহাকালীর স্বরূপ ও তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীসারদা-মাতৃতত্ত্ব অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-জীবনতত্ত্বসাগরে অবগাহন করিতে হইলে শশী বা বৃত্তিচঞ্চল মনকে বশীভূত ও কেন্দ্রগত করিতে হইবে এবং বুদ্ধি-বিচারের চাতুর্যকে স্তব্ধ করিয়া শরীর কোঠার গহনরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়া, তবেই সেই ভাব পরিপক্ক বা সমৃদ্ধ হইয়া রূপে ও রসে তত্ত্ব বা সত্যোপলব্ধির আকারে ভক্ত-সাধকের নিকট ধরা দেয়—"হলে ভাবের উদয় লয় যে যেমন, লোহাকে চুম্বক ধরে"। শ্রীসারদাদেবী মহাশক্তি-রূপিণী বিশ্বজননী, সুতরাং এই অপার্থিব শ্রীসারদামাতৃতত্ত্ব বুঝিতে হইলে অভাবের পরিবর্তে ভাবের মধ্য দিয়া, নেতিভাব ত্যাগ করিয়া ইতিমুখে সন্তান-ভাবকে আশ্রয় করিয়া করুণাময়ী শ্রীমার শরণাগত হইলে তিনি কৃপা করিয়া আপন স্বরূপ ভক্ত-সন্তানকে বুঝাইয়া দিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাই তাঁহার দেবীত্ব ও বিশ্বমাতৃত্বের মাধুর্য বুঝিতে হইবে, কেবলই লীলাচঞ্চল জীবনচরিত্রের সহিত পরিচিত হইলে হইবে না। এই পরিচিতি বা জ্ঞানতত্ত্ব রহস্যপূর্ণ ও গোপনীয়, ইহা 'চাতারে' বা সর্বসমক্ষে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার বা প্রচার করিবার সামগ্রী নহে। সাধক রামপ্রসাদ এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুর্বিজ্ঞেয় মাতৃতত্ত্ব ভাবের সাহায্য লইয়া ঠারেঠোরে বা ইঙ্গিতেই বুঝিতে হইবে। এই ইঙ্গিতে বুঝিবার জন্যই প্রণব-রূপ বাচক বা প্রতীকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব নির্গুণ-ব্রহ্মকে বুঝিবার বা উপলব্ধি করিবার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে পূর্বে সামান্যভাবে আলোচিত হইয়াছে। তবে মাতৃতত্ত্বকে বিভিন্ন শাস্ত্রে বা ধর্মগ্রন্থে বিভিন্নভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাকে মাতৃতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব বলে, তাহাকেই ভিন্ন নামে সাংখ্যদর্শনে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকতত্ত্ব বা প্রকৃতিতত্ত্ব, গীতায় পুরুষোত্তমতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব, ভাগবতে ও শক্তিশাস্ত্রে প্রেমতত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধাতত্ত্ব বা শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব, বেদান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও পুরাণে নারায়ণতত্ত্ব বলা হইয়াছে।

নামে, আচারে, সাধনায় ও অনুভূতিতে পার্থক্য থাকিলেও পরমতত্ত্বে কোন ভেদ নাই এবং এ'কথাই নবযুগনায়ক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া সকল ধর্মমতের সাধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন মত ও পথ (সাধনা) পৃথক পৃথক হইলেও লক্ষ্যবস্তু এক ও অদ্বৈত। সেইজন্য তিনি প্রচার করিয়াছিলেন—'যত মত তত পথ'। কিন্তু 'যত মত তত পথ' এই সত্য-সিদ্ধান্তের দ্বারা আমরা এই অর্থ করিব না যে, সকল ধর্মমত ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্তকে এক (synthesize) করিয়া অখণ্ড একটি মতে বা সিদ্ধান্তে (সত্যে) উপনীত হওয়া, পরন্তু ইহার অর্থ হইল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও সাধন alternative পথ এবং তাহারা একই পরমার্থতত্ত্বের বা সত্যের উপলব্ধি করায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন মাতৃতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্বের সাধক ছিলেন, তেমনি ছিলেন ভক্তিতত্ত্বের, যোগতত্ত্বের ও অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বের সাধক। তাহারই জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট পথের ও তত্ত্বের তিনি সাধক ছিলেন বলিলে ভুল করা হইবে। সেজন্য সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বা সকল সাধনায় একই সত্য ও অদ্বয়তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া মায়াস্পর্শের অতীত হইয়াও যখন মায়ার সংসারে পুনরায় নামিয়া আসিলেন তখন শ্রীশ্রীভবতারিণীকে তিনি বলিলেন: "মা আমায় ভাবমুখে রাখ"; "মা আমায় রসে-বশে রাখ্"। স্থতরাং ভাবমুখে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় মাতৃতত্ত্বের আস্বাদনভূমিতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন 'লোকসংগ্রহ' বা মানবকল্যাণ-সাধন করিবার জন্য ইহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই মাতৃতত্ত্বের আস্বাদনভূমির সহিত পরমতত্ত্বদৃষ্টির দিক দিয়া অদ্বৈতব্রহ্মানুভূতির কোন বিরোধ নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের এই শক্তি বা সগুণ-সাকার-ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত শিব বা নিগুর্ণ-নিরাকার-ব্রহ্মতত্ত্বের কোন বিরোধ নাই, কেননা একই নির্লিপ্ত মায়ালেশশূন্য তুরীয় বা চতুর্থ ব্রহ্মচৈতন্যই শিব-শক্তি হইয়া, সাকার-নিরাকার বা সগুণ-নিগুণ হইয়া, অথবা ঈশ্বর ও জীব-জগৎ হইয়া প্রকাশ পান। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্বের সহিত সেইজন্য বেদান্তের অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বের কোনদিনই বিরোধ নাই।

তবে এইকথা ঠিক যে, মাতৃতত্ত্ব বা পরমাপ্রকৃতিতত্ত্বের মধ্যে গুণত্রয় বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার স্পর্শ থাকেই—যদিও সেই মায়া বা শক্তি মহামায়া-রূপে সাধককে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব, কালীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব তাই মায়াবিলাসী হইলেও মুক্তি ও অভয়দায়িনী। এই মাতৃতত্ত্বের পরিচয় দিতে গিয়া সাধক কমলাকান্ত ভিন্নভাবে পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির অভেদ স্বরূপের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন,

জাননারে মন পরমকারণ
শ্যামা (মা) শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥
যেরূপে সে জন করয়ে সাধন
সেই রূপে তার মানসে রয়।—প্রভৃতি

পুরুষ ও প্রকৃতি কিংবা শিব ও শক্তি নামভেদ ও রূপভেদ মাত্র। স্বরূপে একই, তবে বিশুদ্ধ অদ্বয়চৈতন্য নিজেকে মহামায়া, পুরুষ, প্রকৃতি, শিব, শক্তি বা মাতৃতত্ত্বরূপেও প্রকাশ করেন।

তত্ত্বানুভূতির বিচিত্র ক্ষেত্র ও সাধনা

তত্ত্বানুভূতির স্তর বা ক্ষেত্র বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতা অনুভূত হয় ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, ভাবনা বা সাধনার জন্য। অদ্বৈতবেদান্তে তুরীয়, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই চারিটি চৈতন্য বা জ্ঞানানুভূতির ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র বা স্তরগুলির মধ্যে অনুস্যূত বিশুদ্ধচৈতন্য এক ও অভিন্ন; অথবা বলা যায়, তুরীয় বা চতুর্থ (transcending) বিশুদ্ধ (মায়ালেশশূন্য) স্বপ্রকাশ চৈতন্যের সহিত ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই চৈতন্য বা জ্ঞানস্তর-তিনটির কোন ভেদ বা বিরোধ নাই, কিন্তু এই তিনটির প্রতিটির সঙ্গে পরস্পরের ভেদ বা বিরোধ আছে। তন্ত্রে মাতৃতত্ত্বানুভূতি তখনই সম্ভব হয়, যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার—শক্তি ও শিবের মধ্যে সামরস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদান্তে বা উপনিষদে আরও পাঁচটি জ্ঞানানুভূতির স্তর কল্পিত হইয়াছে এবং সেইগুলির নাম অন্নময়কোষ, মনোময়কোষ, প্রাণময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ। আসলে স্থূল ও পার্থিব অন্নময় (অন্নের দ্বারা পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট) শরীরের জ্ঞান হইতে কীভাবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কারণসত্তাজ্ঞানের ভাবনা ও বিচারের দ্বারা সাধক ধীরে ধীরে আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন পঞ্চকোষের তাহারই জন্য কল্পনা। 'কোষ' অর্থে আবরণ,—যাহা জ্ঞানের বা আত্মার স্বচ্ছ রূপকে ঢাকিয়া রাখে। কিন্তু আনন্দময়কোষই জীবনসিদ্ধির লক্ষ্য নহে, তাহারও উপরে বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া সাধককে আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রকার পঞ্চকোষের উপদেশ দিয়া অধ্যাত্মপথের সাধককে ক্রমসাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই কোষগুলি তত্ত্বানুভূতির ক্রমস্তরবিশেষ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উপদিষ্ট হইয়া ভগবতী শ্রীসারদাদেবী আত্মার সকল আবরণ ভেদ করিয়া নির্বিকল্প-সমাধিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে বা স্বরূপসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দর্শনে চেতন (conscious), অবচেতন বা অধিচেতন (sub-conscious) ও পরচেতন (superconscious) এই তিনটি জ্ঞানানুভূতির স্তর কল্পনা করা হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমানুভূতির পরিচয় দিবার সময় ইংরাজীতে সুপারকন্‌সাস্‌ বা গড্‌কন্‌সাস্‌ (superconscious বা Godconscious) অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্রে চরমজ্ঞানানুভূতির আবার সাতটি স্তর (চক্র বা পদ্ম) কল্পনা করা হইয়াছে এবং সেই স্তরগুলির নাম, মূলাধার (মূল+আধার—basic lotus), স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার। মূলাধার ও সহস্রার দুইটি পরম স্থান: একটিতে আত্মশক্তি অচল ও সুপ্ত ও অপরটিতে তাহা সচল ও পূর্ণজাগ্রত। মধ্যবর্তী চক্র বা স্তরগুলিতে শক্তি বা জ্ঞানানুভূতি ক্রিয়াশীল বা সঞ্চরণশীল। মূলাধার হইতে জ্ঞানের (অনুভূতির) ক্রমবিকাশ হইতে হইতে সহস্রারে পূর্ণবিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। এই সঞ্চরণশীল জ্ঞান বা অনুভূতির জাগরণের পরিপূর্ণতাকেই শিবশক্তি-সামরস্য বলে। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে ও কোন কোন উপনিষদে ছয়টি বা সাতটির অধিক চক্র, পদ্ম বা স্তর কল্পিত হইয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় মাতৃতত্ত্ব

বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় স্পন্দনাত্মিকা শক্তির চক্রে চক্রে বিকাশের উল্লেখ আছে। এই বিকাশ তত্ত্বানুভতিরই ক্রমবিকাশ এবং চরম-অবস্থায় তাহার পূর্ণস্থিতি হইয়া থাকে। বেদান্তের ব্রহ্মানুভতি, হিন্দুতন্ত্রের শিব-শক্তির মিলন-সামরস্য ও যোগশাস্ত্রের জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন তত্ত্ব বা সত্যানুভূতিরই মর্ম ও চরমকথা। বৌদ্ধতন্ত্রে শরীরের মধ্যে চারিটি চক্র বা পদ্মের কল্পনা আছে। নিম্নতম চক্র (জ্ঞানস্তর) হইল নির্মাণচক্র ও মস্তকে উষ্ণীষকমলে মহাসুখচক্র হিন্দুতন্ত্রের মূলাধার ও সহস্রার চক্রের পর্যায়ভুক্ত। বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় শক্তি বা শক্তিতত্ত্বের প্রথম জাগরণ (স্পন্দন) হয় নির্মাণচক্রের চৌষট্টিদলসমন্বিত চক্রে এবং ঐ চক্রে আনন্দতত্ত্বের উদ্বোধন হয়। আনন্দ ঊর্ধগতিতে পরমানন্দে, পরে বিরামানন্দে ও পরে (বা পরিশেষে) সহজানন্দে স্থিতি ও পূর্ণতা লাভ করে।

সহজানন্দদায়িনী শক্তি বা শক্তিতত্ত্বই বৌদ্ধসহজিয়াতত্ত্ব আনন্দরূপিণী। এই সহজানন্দের মধ্যেই চিত্ত বা মনের লয় হয় ও ইহার পূর্ণ-বিলয়েই মহাসুখ নৈরাত্মদেবীর প্রতিষ্ঠা। এই অবস্থাকে বা তত্ত্বানুভূতিকেই আদরিণী নৈরামণিদেবী বলে। শূন্যবাদী বৌদ্ধসাধনার ইহাই শূন্য বা শূন্যতত্ত্বানুভূতি। এই শূন্যানুভূতির রূপ সত্তাহীনতা (nothingness বা void) নয়, পরন্তু পূর্ণসত্তাবান (suchness বা thatness)।

মহাযানী বৌদ্ধসাধকরা মুক্তিময়ী শূন্যতার সহিত আবার ক্রিয়াচঞ্চল মহাকরুণার মিলন সাধন করেন। সেখানে শূন্যতা নেতি-বাচক অসত্তাবান 'প্রজ্ঞা' এবং করুণা হইল ইতি-বাচক 'উপায়'। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৬৭) লিখিয়াছেন, তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মহাযানের এই শূন্যতা ও করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্ত্ব হইয়া বোধিচিত্তলাভের সাধনা * * 'শূন্যতা-করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে',—শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্বই হইল বোধিচিত্ত। * * বোধিচিত্ততত্ত্বই হইল তন্ত্রের যুগল বা যামলতত্ত্ব। ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই মিথুনতত্ত্ব। 'শূন্যতা' প্রজ্ঞারূপিণী ভগবতী ও 'উপায়' নিখিল-ক্রিয়াত্মক ভগবান। এই ভগবান-ভগবতী-সামরস্য-রূপ মিথুনতত্ত্ব হইল অদ্বয়-বোধিচিত্ততত্ত্ব। হিন্দুতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও করুণাকে শিব ও শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব নেতি-বাচক অসত্তা নন, তিনি শক্তির মতোই সত্তাবান ও ইতিবাচক চৈতন্যস্বরূপ। একটিকে অব্যক্ত বা অচঞ্চল ও অপরটিকে ব্যক্ত বা ক্রিয়াচঞ্চল বলা যায়।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে দেখি যে, তন্ত্রসাধনসিদ্ধা ভৈরবী-ব্রাহ্মণী উত্তরসাধিকারূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সাধনা করাইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজানন্দ-রূপ নির্বিকল্পজ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় মায়াময় স্থূলজ্ঞানের রাজ্যেই লোকশিক্ষার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মহাজ্ঞানরূপিণী শ্রীসারদাদেবীকে তিনি অমানিশায় ষোড়শীজ্ঞানে পূজা করিয়া ও তাঁহার চরণে জপমালা সমর্পণ করিয়া আপনার চরমজ্ঞানানুভূতির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী শ্রীমা সেই সময়ে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং এই সমাধির অর্থ হইল শ্রীমা তন্ত্রের শিব-শক্তির সামরস্য ও বেদান্তের চরম-জ্ঞানানুভূতির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই সময়ে শ্রীসারদাদেবীর অধ্যাত্ম-তত্ত্বসাধনার উত্তরসাধক হইয়া শ্রীমাকে মাতৃতত্ত্বরহস্যের

অনুভূতিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শীপূজা তাহারই প্রতীক (সিম্বল বা সঙ্কেত) মাত্র। শ্রীসারদাদেবীকে আপন দিব্যমাতৃতত্ত্বানুভূতির স্তরে উন্নীত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার সহিত শ্রীমার অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। শিবাদ্বৈত ও অদ্বৈতজ্ঞানানুভূতির ইহা চরমকথা। অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে অলৌকিক পতী-পত্নীর বা শিব-শক্তির এই সামরস্যসাধনের নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণসাধনজগতে ইহা এক অভিনব রহস্যপূর্ণ ঘটনা ও তত্ত্বকথা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্বের স্বরূপ

এই শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাতত্ত্ব এবং শ্রীসারদামাতৃতত্ত্বের মর্মকথাও তাই। অদ্বৈতবেদান্তের বিশুদ্ধ জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়হীন পরমচৈতন্য যেরূপ শক্তিকে বাদ দিয়া অথবা সম্পূর্ণরূপে শক্তির ভিন্নসত্তাকে ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত এক ও অভিন্ন করিয়া সার্থক, যোগে ও তন্ত্রে (হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে) সেইরূপ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ইহার আভাস দিয়াছেন। কল্যাণীয়া লেখিকাও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন "শ্রীমা সারদা ও স্বামী তুরীয়ানন্দ" আলোচনায়। শ্রীঠাকুর একজন বেদান্তের পণ্ডিতকে (দক্ষিণেশ্বরে) বলিতেছেন, 'কিছু বেদান্ত শোনাও।' পণ্ডিত বেদান্ততত্ত্ব বুঝাইলে শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার কিন্তু বাপু অত-শত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আর আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে কিন্তু মা আর আমি, আর কিছুই নাই।' সকল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার পর তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই শেষ-কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা আর আমি, আর কিছু নাই' এই মাতৃসত্তানুভূতি প্রাণময়ী শ্রীশ্রীভবতারিণীরই পরমসত্তা ও বিশ্বের সকল আদ্যাশক্তিরূপিণী নারী-জাতির স্বরূপসত্তা এখানে 'মা' বা শক্তি সগুণ ব্রহ্মসত্তা বলিয়া প্রতীত হইলেও 'স্থির সাপ ও চলা সাপ' এই এক ও অভিন্ন সর্পসত্তারই মতো ব্রহ্মসত্তা হইতে পৃথক নয়। তন্ত্রেও শক্তি বা কালী চৈতন্যরূপী শিব বা মহাকাল[৭]

৭। তন্ত্রে দুইটি শিবের কল্পনা করা হইয়াছে—সদাশিব ও মহাকাল। সদাশিব নির্গুণ ও অচঞ্চল এবং শবরূপ শিব এবং মহাকাল তাহার সগুণ কিন্তু নিষ্ক্রিয় রূপ এবং কালী মহাকালের সক্রিয় রূপ। দুই শিবের ধারণায় সক্রিয়তা অব্যক্ত ও ব্যক্ত-রূপে প্রকাশিত। মোটকথা সদাশিবে সক্রিয়তা নাই, মহাকালে সক্রিয়তার উন্মুখতা ও মহাকালীতে তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত ও সচঞ্চল।

হইতে অভিন্না ও মহাসুখরূপিণী। শিব হইতে শক্তি অভিন্না এজন্য যে, সর্বক্রিয়া-শূন্য মহাকাল-শিবই আসলে সগুণ ও সচঞ্চল হইয়া কালী-রূপে আবির্ভূত, সেজন্য তত্ত্বদৃষ্টিতে তন্ত্রে শিব ও শক্তি এক ও অভিন্ন এবং এই অভিন্নতারূপ সামরস্যানুভূতিই মাতৃতত্ত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মাতৃতত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন একটু ভিন্ন দৃষ্টি লইয়া, কেননা তন্ত্রের (হিন্দু ও বৌদ্ধ) মাতৃতত্ত্ব অদ্বয় বা অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহাতে দুইটি পরমতত্ত্বের চনকাকারে মিলন বা মিথুন-রূপ থাকে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব দ্বৈতভাবের অতীত, তাহাতে মিথুন-রূপ নাই, আছে এক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় রূপ—যে রূপ অনুস্যূত সগুণে ও নিগুণে, সাকারে ও নিরাকারে এবং বিশ্বাতীত সত্যে ও বিশ্বগত সত্যে। শ্রীনন্দকুমার তাঁহার গানে বলিয়াছেন,

শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী।

শ্রীনন্দকুমার সুষুম্নাবর্ত্মের মুখ-আচ্ছাদিনী সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-রূপিণী প্রকৃতিতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রের প্রকৃতিতত্ত্ব মায়াতীত আবার মায়াগত, কেননা তন্ত্রে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপেও মহাকালী প্রকাশিতা, আবার ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধজ্ঞানরূপ শিবের (মহাকাল বা সদাশিব) সহিত একরসেও সম্পৃক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব সেইজন্য তন্ত্রসিদ্ধান্তগত মাতৃতত্ত্ব হইতে একটু অতীত। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ত্ব অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বেরই অভিন্ন রূপ এবং সেই সর্বানুস্যূত রূপে, তত্ত্বে বা সত্যে অখণ্ডতা একরূপে বিদ্যমান যে, এক মায়ালেশশূন্য তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্যই কখনও নির্গুণ ও নিরাকার হইয়া, আবার কখনও সগুণ ও সাকার হইয়া জীব-জগৎ ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব-রূপে প্রকাশিত। সুতরাং সত্য একটিই, কেবল বিভিন্নরূপে তাহা প্রকাশিত হয়। তত্ত্বদৃষ্টিতে একই চৈতন্য জীব-জগৎ-রূপে প্রতীত, আবার তাহাদেরও অতীত-রূপে প্রতীত। আচার্য শঙ্কর এই বহুরূপে বা নানারূপে অথবা জীব-জগৎরূপে প্রকাশমানতাকে মিথ্যা বা অনিত্য বলিয়াছেন অদ্বৈততত্ত্বকে রক্ষা করিবার জন্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই মা ব্রহ্মময়ী কালীরূপে প্রকাশমান, আবার জীব-জগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপেও প্রকাশমান। এখানে রূপভেদকে মিথ্যা বা অনিত্য না বলিয়া ব্রহ্মদৃষ্টি বা তত্ত্বদৃষ্টিতে নিত্য বলিতে কোন বাধা নাই। সেজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের মা ব্রহ্মময়ী কালী মিথ্যা নন, তিনি সত্য এবং সত্যরূপিণী মহাশক্তির বিকাশ ও স্বরূপ হইতে অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বে বা মাতৃতত্ত্বে

সেজন্য জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতিরও স্থান আছে, বিরোধ কোন-কিছুর সহিত নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৃত্তিকা ও মৃত্তিকানির্মিত সামগ্রীর উদাহরণ দিয়া মৃত্তিকাকেই নিত্য ও সত্য বলিয়া মৃত্তিকার দ্রব্য-সামগ্রীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে—অবশ্য শাঙ্করবেদান্তের দৃষ্টিতে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনদৃষ্টিতে বলিতে হয়, মৃত্তিকার দ্রব্য-সামগ্রী মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য-কিছু নহে, আকার থাকিলেও তাহা সত্য ও নিত্য মৃত্তিকারই ভিন্ন ভিন্ন আকার। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনদৃষ্টিতে এই আকার-ভিন্নতার সার্থকতা ও প্রাধান্য নাই, বরং একই তত্ত্ব, চৈতন্য বা সত্য নানা ও বিচিত্র এবং এই একত্বের বা অদ্বিতীয়ত্বের দৃষ্টিই গ্রহণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বয়তত্ত্ব ও অদ্বৈতদৃষ্টি এজন্য শ্রীশঙ্করের অদ্বিতীয়তত্ত্ব ও অদ্বৈতদৃষ্টি হইতে একটু পৃথক ও স্বতন্ত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃতত্ত্বানুভূতি

এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বিশেষভাবে মনে পড়ে। প্রসঙ্গটি হইল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্থায়ী পত্তনের পরিকল্পনা করিয়া বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে (বলরাম-মন্দিরে) একটি আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীসারদাদেবীকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ একটি মন্তব্য করেন এবং সেজন্য কিছুটা মতদ্বৈত দেখা দিলে স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে সকলকে (গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণকে) লক্ষ্য করিয়া বলেন: "সে কি ভাই, আমাদের সন্ন্যাস-জীবন। সন্ন্যাসীর 'করতলভিক্ষা তরুতলবাস' এবং এই হল আমাদের জীবন। আর 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সব-কিছু ত্যাগ করে তপস্যাই আমাদের ব্রত ও এই হল আমাদের আদর্শ। * * শ্রীমাকে পরমহংসদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে কি মনে কর? তিনি শুধু তা নন ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষয়িত্রী, পালনকারিণী; তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।"

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননীর রূপ ও দায়িত্ব গ্রহণ করার শক্তি ও সামর্থ্য একমাত্র মহাশক্তিরূপিণী ও সর্বজনপালিনী শ্রীসারদাদেবীর পক্ষেই যে সম্ভব তাহা দিব্যচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেজন্যই শ্রীমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া একদিন সর্বসমক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন: "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত

শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নাই।" স্বামী বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বলীলার জন্য একই পরমকারুণিক ভগবানঈশ্বর ও ঈশ্বরী, শিব ও শক্তিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ।

বিবেকানন্দের দিব্যানুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদের ফলশ্রুতি

স্বামী বিবেকানন্দ এই দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারই পরম-প্রেমাস্পদ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় ও আশীর্বাদে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অজস্র করুণার মধ্যে দুইটি ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করি। (১) একটি, দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসঙ্গীত শিক্ষাদান ও (২) অপরটি, কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে মহাসমাধির পূর্বে আপনার হৃদয়পদ্মাসনে চিরাধিষ্ঠিতা দেবী শ্রীশ্রীভবতারিণী মহাকালীকে নরেন্দ্রনাথের তথা বিবেকানন্দের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠা করা বিশ্বকর্মসাধনের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়-সিংহাসনে কালী প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছিলেন: "আজ সব তোকে দিয়ে আমি ফকির হলুম"। এই কালী মহাশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণেরই চির-আরাধ্যা দেবী শ্রীশ্রীভবতারিণী। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা ও নবশক্তি-প্রেরণার উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণদেব হইতে এবং তাহার পরিসমাপ্তি কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানী দর্শনের পর হইতে। দেবী ক্ষীরভবানীর দর্শন ও তাঁহার বাণী বা প্রত্যাদেশ লাভ করিবার পর সর্বদা শিবভাবে উদ্বুদ্ধ স্বামীজী পুনরায় মাতৃভাবে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত প্রথম ঘটনাটি হইল: একদিন শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন একটি মাতৃসঙ্গীত শিখাইয়া দিবার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া নিম্নলিখিত গানটি শিক্ষা করিয়াছিলেন,

আমার মা ত্বং হি তারা,
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে, জানি মা দীন দয়াময়ী,
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে তুমি স্থলে,
তুমিই আদ্য মূলে গো মা,

আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে
সাকার আকার নিরাকারা ॥—প্রভৃতি

এই গানের অর্থ ঈশোপনিষদের "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই সর্বানুস্যূত মন্ত্রের মতো। বিশ্বরূপিণী মহাকালী সর্বঘটে—পৃথিবীর সর্বত্র অনু-পরমানুতে চৈতন্য ও সত্তারূপে অনুস্যূত। স্বামী বিবেকানন্দ সেই গানটি শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে 'সাকার আকার নিরাকার' একাকার অখণ্ডমাতৃতত্ত্বে ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং এই মাতৃতত্ত্বানুভূতির প্রেরণা ও দিব্যস্পর্শ লইয়াই তিনি শ্রীসারদাদেবীকে বলিয়াছিলেন : "তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নাই।"

লীলাময়ী শ্রীসারদাদেবীকে বুঝিতে হইলে তত্ত্বানুভূতির প্রয়োজন

শ্রীসারদাদেবীর দিব্য-মাতৃলীলায় বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্যেরও বিকাশ আছে। শ্রীমা যেমন ছিলেন অন্নপূর্ণা, সুতরাং অন্নের অভাব তাঁহার কিরূপে হইতে পারে, তেমনি ছিলেন সর্বৈশ্বর্যরূপিণী, সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্যের দৈন্যও কীভাবে থাকিতে পারে। কিন্তু তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পরে কামারপুকুরে যখন শ্রীমা বাস করিয়াছিলেন তখন তাঁহার অভাব ও দৈন্যের পরিসীমা ছিল না। স্বামী ধ্যানাত্মনন্দ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : "কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভিটে আগলে জীর্ণবস্ত্রপরিধানা কঠোরতপস্বিনী সারদাদেবীর তুলনা মেলে কি! ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'শাক বুনবে আর শাক-ভাত খাবে। আর হরিনাম করবে'। তিনি (শ্রীমা) সে আদর্শ আক্ষরিকভাবেই পালন করেছিলেন। শাকের সঙ্গে নুনটুকুও জুটতো না, অথচ কারুর কাছে হাত পাততেন না। তাঁর দিকপালসদৃশ ত্যাগী সন্তানরা তখন ত্যাগ-বৈরাগ্য-সম্ভূত তপশ্চর্যায় মগ্ন। কে কার খবর করে?"[৮] পুরাণে পার্বতীর তপশ্চর্যাকেও পরাভূত করিয়াছিল শ্রীমার সেই কঠোর নিঃসঙ্গ তপস্যা। সত্যই কি তাহা লীলারহস্যময় এক খেলার অবতারণা নয়? মানবীয় কর্মে ও চরিত্রে দেবত্বের বা দেবীত্বের আরোপ কিংবা অনুভূতি সাধারণত সহজসাধ্য বলিয়া মনে হইলেও তাহা কিন্তু নিছক কল্পনাশ্রয়ী কবিকর্ম বা সৃষ্টিধর্মী শিল্পকর্ম নয়, তাহা মন ও প্রাণের—বুদ্ধি ও বোধির বহু ঊর্ধ্বে মাতৃতত্ত্বানুভূতির মহিমময় ও আনন্দময় লোকে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য বলিতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-

৮। উদ্বোধন, (শারদীয়া সংখ্যা), আশ্বিন, ১৩৭৫

সঙ্গিনী বিশ্বরূপিণী শ্রীমা সারদার লীলাকর্মের রহস্য ও মহিমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয় এবং তবেই "বিবৃণুতে তনূং স্বাম্"—তিনি আপনার স্বরূপ সাধক-সন্তানের নিকট প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত গিরিশচন্দ্র, নাগ মহাশয় প্রভৃতি শ্রীমার স্বরূপরহস্যের কিছুটা পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন—যেরূপ শিব মহাকালীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পাগল হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্বরূপিণী শ্রীমা সারদার স্মৃতিচারণে এই জীবনালেখ্যের পরিচয় দিতে গিয়া কল্যাণীয়া লেখিকা শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ সাহিত্য ও কাব্য-সুষমার পরিবর্তে ধর্মপ্রেরণাকেন্দ্রিক রস ও ভাবেরই প্রলেপ দিয়াছেন তাঁহার প্রতিটি আলোচনায়—যাহা মনে হয় সমীচীন হইয়াছে। সন্তান ও ভক্তগণের প্রতি লীলাময়ী শ্রীসারদাদেবীর কী নিবিড় স্নেহ-ভালবাসা ছিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমার অপূর্ব জীবন ও অমৃত-উপদেশ প্রভৃতি তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করিয়া এই গ্রন্থ সকলের জীবনে আনন্দমুখর প্রেরণা ও শান্তি আনয়ন করিবে একথা আমরা বিশ্বাস করি। অজস্র দুঃখ-বেদনাপীড়িত মানুষের মনে শ্রীমার কল্যাণ-আশীর্বাদ বর্ষিত হউক ইহা আমরা করুণাময়ী ও আনন্দময়ী শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করি এবং ইহাও প্রার্থনা করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদার গভীর জীবনতত্ত্বের ও দিব্যজীবনাদর্শের চিন্তা ও ধ্যান করিয়া তবে এই স্মৃতিগ্রন্থ সকলে পাঠ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

॥ সূচীপত্র ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা

সূচনা

শক্তিকে বাদ দিয়া শিব কোনদিনই পূর্ণ নন; শক্তির লীলাচঞ্চল রূপই বরং শিবের পূর্ণতাকে সার্থক করে। এই পরমকারণরূপিণী লীলাময়ী শক্তি কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের অনির্বচনীয়া মায়াশক্তি নয়, কেননা এই নিত্যা ও চৈতন্যময়ী শক্তিই বিশ্বসৃষ্টির উন্মুখতা ও বিকাশকে পূর্ণ করে।

বেদে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা ও বর্ণনা পাই। অর্ধনারীশ্বরই সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের আদিম পুরুষ ও নারী—পুরুষ ও প্রকৃতি, বা শিব ও সদানন্দময়ী শক্তি। পুরাণে কারণসলিলে শায়িত পুরুষোত্তম নারায়ণের বর্ণনা পাই এবং সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে রজোগুণসম্পন্ন রক্তবর্ণ চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টি। নারায়ণের পদপ্রান্তে সেবাপরায়ণা নারায়ণী লক্ষ্মীদেবী—মহাপ্রকৃতি ও মহাশক্তি। সৃষ্টির সুপ্তি-জাগরণের সাক্ষী ঐ পরমপুরুষ ও আদিনারী এবং পুরাণকার নির্বিকার শিব ও সবিকার শক্তির ঐভাবেই পরিচয় দিয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

সৃষ্টির প্রয়োজনে যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তিরূপে সঙ্গে আসেন লীলাসঙ্গিনী ভগবতী ঈশ্বরী। শক্তির অবতার-রূপেই আসেন ঈশ্বর 'লোকসংগ্রহ' বা বিশ্বকল্যাণের জন্য। তিনি আসেন সকল অপূর্ণতাকে বরণ করিয়া মানুষের বেশে। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব যুগ-প্রয়োজনে। মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবী তাই পরমশিবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীরূপে অবতীর্ণা। নিত্যে যে স্বরূপ থাকে এক, লীলায় সেই স্বরূপই হয় দ্বিধাবিভক্ত—ঈশ্বর ও ঈশ্বরী—শিব ও শক্তি। ঈশ্বর ও ঈশ্বরী কিংবা শিব ও শক্তি জীবজগৎ সকলকে লইয়া সাকার সচ্চিদানন্দ-রূপে লীলা করেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখিবার সময় স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে শ্রীমারও একটি সম্পূর্ণ জীবনী লিখিবার জন্য সকলে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ তাহার উত্তরে বলিতেন, চেষ্টা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী কিছু কিছু লিখিয়া হয়তো প্রকাশ করা সম্ভব, কিন্তু অনন্ত লীলাময়ী শ্রীমার জীবনী লেখা আমাদের সাধ্যাতীত। শ্রীমার আদরের সেবক ও সন্তান সারদানন্দ মহারাজের উক্তি অতীব সত্য, কেননা শ্রীমা সারদা লীলাময়ী ও পরম-ঐশ্বর্যময়ী হইলেও তাঁহার সকল লীলা ও ঐশ্বর্যই ছিল চির-আবৃত ও চির-অপ্রকাশিত। তিনি মায়ার আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার সত্যকার অপার্থিব রূপ। তাই শ্রীমা সারদা ছিলেন চিরদিনই নিরাভরণা সহজ-সরলা বালিকার মতো; আবার

দক্ষিণেশ্বর-পঞ্চবটী (শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ)
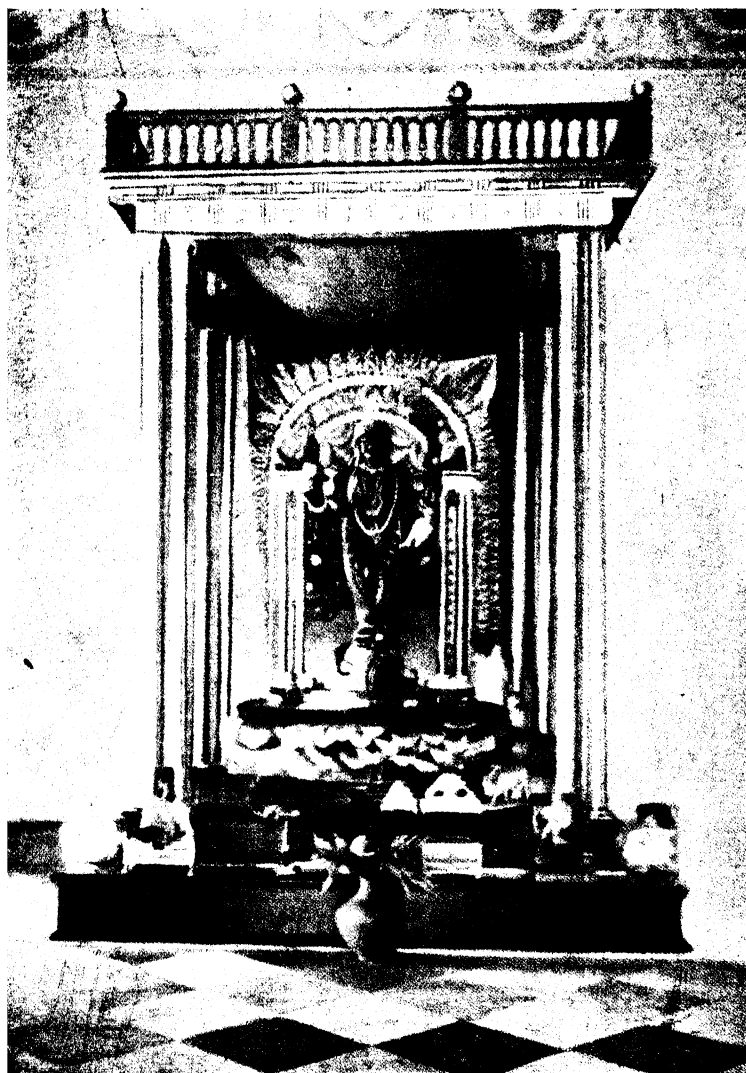
শ্রীশ্রীভবতারিণী

(দক্ষিণেশ্বর)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

—Frank Dvorak

দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানা

কখনো সাধারণ গ্রাম্য বধূর মতো, অথচ অনন্ত ভাব, বিকাশ ও ঐশ্বর্যের ছিলেন তিনি অধিকারিণী; অফুরন্ত স্নেহ, ভালবাসা ও করুণার ছিলেন তিনি মূর্তিময়ী দেবী। তাই লেখনীর পরিচ্ছিন্ন সীমায় শ্রীমার অনন্ত মহিমাকে প্রকাশ করা সহজসাধ্য কর্ম নয়। তবে প্রশ্ন হইতে পারে—তবে কি মহিমময়ী শ্রীমা সারদার মাধুর্যময়ী লীলাকাহিনী কেহ লিপিবদ্ধ করিবেন না? তাহার উত্তরে বলি, শ্রীমার অনুরাগী ও ভক্ত-সন্তানরা শ্রীমাকে যেমনটি ভাবে প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্তে দেখিয়াছেন ও উপলব্ধি করিয়াছেন, তেমনটি ভাবেই তাঁহারা তাঁহার অপার্থিব মহিমা ও লীলাকাহিনীর কথা প্রকাশ করিবেন বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য। দিশাহীন অন্ধকারে পথ-নির্দেশের জন্য আলোকের উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করেন এবং এই স্বীকৃতির সার্থকতায়ই যুগমানব ও যুগমানবীদের জীবনালেখ্য রচনা করা অনেক দিক দিয়াই প্রয়োজন। সাধারণ আমাদের কথাও তাই। আমরাও তাই সীমায়িত বুদ্ধি ও ধারণা লইয়া অনন্ত-ভাবময়ী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীর পুণ্য-স্মৃতিকথার সম্ভার রচনা করিয়াছি শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিবার জন্য শ্রীমা সারদাকে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার অনুষ্ঠানই এই রচনা।

একদিন দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে করিতে শ্রীসারদাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেনঃ "যে মা মন্দিরে আছেন, যিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ ব'লে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কথা শুনিয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার সহধর্মিণীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর চিন্ময় মূর্তি বলিয়া মনে করিতেন ও পূজা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, স্বীয় সহধর্মিণীর মতো বিশ্বের প্রতিটি নারীই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

নিকট পূজ্যা ও জগন্মাতার প্রতিচ্ছবি। সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় গর্ভধারিণী জননী ও দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করিতেন শ্রীমা সারদাকে। সেজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন গভীর অমানিশায় শ্রীসারদাদেবীকে যোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরী-রূপে পূজা করিয়া বিশ্বের নারীজাতিকে মাতৃত্বের মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ফলহারিণী কালীপূজার গভীর রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীসারদাদেবীকে সম্মুখে আসনে বসাইয়া যোড়শোপচারে পূজা করিলেন ও ধ্যান করিলেন এবং পূজা ও ধ্যানের শেষে শ্রীমাকে বন্দনা করিয়া জপের মালা শ্রীমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ইহাই দিব্যভাবের শক্তিপূজা। তন্ত্র বলে শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ, —সমগ্র বিশ্ব শিব-শক্তির দিব্যপ্রকাশ। দিব্যাচারের পূজায় শিব ও শক্তি অভিন্ন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ীর মধ্যে কোন ভেদ নাই, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্ন। দিব্যাচারী সাধকের দৃষ্টিতে বিশ্বচরাচর শিব ও শক্তির দ্বন্দ্বরূপ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শিব ও শক্তিরই মহিমময় লীলাক্ষেত্র। তন্ত্রে যিনি অচঞ্চল নির্বিকার সদাশিব বা মহাকাল-শিব, তিনিই আবার লীলায় চিরচঞ্চলা কালী। শিব যখন শব-রূপে আপন মহিমায় বিভোর থাকেন, তখন তিনি নিত্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম এবং শিব যখন লীলার জন্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন তখন তিনি নৃত্যচঞ্চলা ত্রিলোকপ্রসবিনী মহাশক্তি। তাই তন্ত্রশাস্ত্রের মতে মহাকাল ও মহাকালী এক ও অদ্বিতীয় সত্যের রূপভেদ ও নামভেদ মাত্র। আসলে লীলার জন্য শিব শক্তিরূপে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার প্রলয়সাগরে সকল-কিছুকে নিমজ্জিত করেন। তাই তন্ত্রদৃষ্টিতে শিবকে শক্তি বা কালীরই লীলাবিক্ষুব্ধ অশান্ত মূর্তি বলা যায়; অর্থাৎ লীলায় তিনি অশান্ত ও নিত্যে

তিনি শান্ত। লীলায় শক্তি শিবের বুকে দাঁড়াইয়া মহাশক্তিরূপে নৃত্য করেন।

ঠিক এইভাবে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা একই পরমসত্যের দুই রূপ। তাঁহারা পরস্পরে ভিন্ন আবার অভিন্ন। এইভাবে অগ্নি ও দাহিকাশক্তি ভিন্ন, আবার অগ্নিকে ছাড়িয়া কোনদিন দাহিকাশক্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং অগ্নিরই দাহিকাশক্তি, শক্তিমান অগ্নি ও দাহিকাশক্তি অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও পূর্ণশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করিয়া ও জগন্মাতারূপে আপন সহধর্মিণীকে পূজা করিয়া ধর্মসাধনার ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। গৌতম-বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যদেব আপন আপন শক্তিরূপিণী সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া সত্যানুভূতির জন্য গৃহ বা সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ না করিয়া, বরং সদাসর্বদা স্বীয় পার্শ্বে রাখিয়া পরমসত্যের সাধনায় উপলব্ধি করিলেন যে, নারী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী, নারী মুক্তিপথের প্রতিবন্ধক নন, বরং সহায়ক ও জ্ঞানদায়িণী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সংসার ত্যাগ না করিয়া, বরং সংসারের মধ্যেই আত্মধ্যানে ও ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন থাকিয়া বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিলেন যে, সংসার বা সংসারবন্ধনের কারণ তৃষ্ণা বা বাসনা, তাই বাসনাত্যাগই প্রয়োজন এবং সংসারকে বিশ্বজননীর লীলাক্ষেত্র মনে করিয়া মহামায়ার শরণাপন্ন হইলে মায়ার বন্ধনে আর মানুষ আবদ্ধ হয় না, বরং মায়ার পারে উপনীত হইয়া শান্তি লাভ করে।

মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীমার জীবনে সন্তান-বাৎসল্যের মন্দাকিনীধারা আরো প্রবলভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিল। অজস্র করুণাধারা বর্ষণ করিয়া তিনি শোকসন্তপ্ত নরনারীর জীবনে শান্তি বিতরণ করিতে লাগিলেন। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারি-ধারার মতো শ্রীমার অফুরন্ত স্নেহ নির্বিচারে সকলের উপরই বর্ষিত

হইতে লাগিল। শ্রীমার নিকট তাই ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, পুণ্যবান-পাপী, কৃতী-অকৃতী বলিয়া কোন ভেদ ছিল না। যে কেহই 'মা' বলিয়া একবার শ্রীসারদাদেবীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকেই তিনি স্নেহভরে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন এবং ধূলাবালি ঝাড়িয়া নির্মল করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অহেতুকী, কৃপা ও করুণা হইতে কেহই কখনো বঞ্চিত হয় নাই। ইহা অতি সত্য কথা যে, শ্রীমা নিজে সন্তানের জনয়িত্রী না হইয়াও বিশ্বসমাজে মাতৃত্বের মহিমময় আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-ভালবাসার অমৃতময় সাগরে যে কেহ অবগাহন করিয়াছে, সেইই শীতল হইয়াছে এবং ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। সাধক শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,

মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব করে হয় না মাতা
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

সকল মানুষের জীবন-ব্যথা অনুভব করিয়া সর্বংসহা জননী হইতে পারেন কয়জন? সমগ্র নারীসমাজে সত্যকারের স্নেহশীলা জননী হইতে পারেন কয়জন? কিন্তু শ্রীমা সারদার মধ্যে পাই আমরা প্রকৃত মাতৃত্বের পূর্ণ রূপের প্রকাশ—যে রূপের মধ্যে স্বার্থমালিন্যের বিন্দুমাত্র স্পর্শ ছিল না। শ্রীমার হৃদয় সকল সময়ই তাঁহার সন্তান ও ভক্তদিগের কল্যাণের জন্য উৎসারিত থাকিত। সকল সময়ের জন্যই শ্রীমা সন্তান ও ভক্তগণের কিসে মঙ্গল হয় তাহা চিন্তা করিতেন। কে কোথায় কিভাবে আছে ও জীবন যাপন করিতেছে শ্রীমার চিন্তা সর্বদাই সেইদিকে পড়িয়া থাকিত। তাহা ছাড়া সন্তানদিগের জপ-ধ্যানের প্রতি শ্রীমা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। শ্রীমা বলিতেন, সাংসারিক জীবনে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা তো আছেই, সংসারে সকল-কিছুর প্রাপ্তিতে সুখ ও অপ্রাপ্তিতে দুঃখ তো আছেই, কিন্তু সেই সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা বা সুখ-দুঃখের মধ্যে সমতা

রক্ষা করিয়াই জীবনে শান্তি লাভ করিতে হইবে, অন্যথা অশান্তিময় জীবনের কোন সার্থকতা নাই। তাই জপ-ধ্যানে ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ভক্ত-সন্তানদিগের মনকে সদাসর্বদা নিমগ্ন রাখার দিকে শ্রীমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি নিজেও সময় পাইলে ধ্যান-জপে ডুবিয়া থাকিতেন। তাহা ছাড়া সর্বদা অন্তর্মুখী আত্মস্থ অবস্থা তো তাঁহার সকল সময়ই দেখা যাইত। একবার শ্রীমার অসুস্থ অবস্থায় প্রায় সকল সময় জপ করিতে দেখিয়া জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "মা, আপনি অসুস্থ অবস্থায় এত জপ করেন কেন?" তাহাতে শ্রীমা সহাস্যে বলিয়াছিলেন: "কি করবো বাবা, কত সন্তান কত সময় এসে ব্যাকুল হয়ে ও আগ্রহ সহকারে আমার কাছে থেকে দীক্ষা নিয়ে যায়, কিন্তু সকলে কি আর ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান করতে পারে? আমি তাদের মা, আমি তাদের ভাল-মন্দ সকল-কিছুর ভার নিয়েছি। সেজন্য তাদের হয়ে আমি জপ করি, আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ক'রে বলি যেন তাদের চৈতন্য হয়, তাদের জ্ঞান লাভ হয়। কি জানো বাবা, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে আর যেন না তাদের আসতে হয়, তারা মুক্তি লাভ করুক এটাই আমার প্রার্থনা।" এমনি ছিল সন্তানদিগের প্রতি স্নেহময়ী মার গভীর স্নেহ-ভালবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ। তাহা ছাড়া শ্রীমা সারদা ছিলেন স্বভাবতই লজ্জাশীলা। তিনি ছিলেন সকলের চৈতন্যদায়িনী, কল্যাণকারিণী ও ক্ষমাগুণসম্পন্না। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই শ্রীমার স্তবমন্ত্রে লিখিয়াছেন: 'লজ্জা-পটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে'। সত্যই একাধারে লজ্জা, জ্ঞান, ক্ষমা ও করুণার তিনি ছিলেন জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। সাধারণ নারীর মধ্যে এই আদর্শ প্রত্যক্ষ করা সত্যই দুরূহ।

শ্রীমার মধ্যে সেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্তও অনুকরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেন তখন শ্রীমা প্রতিদিন নিজে খাবারের থালা লইয়া তাঁহাকে আহার করাইতেন। একদিন জনৈকা মহিলা

শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য খাবারের থালা লইয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল : "দিন্ মা, আমায় দিন্"। তাহাতে শ্রীমা খাবারের থালা মহিলাটীর হস্তে দিলেন এবং মহিলা খাবারের থালা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেইদিন কিন্তু খাওয়া হয় নাই। পরে তিনি শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন : "তুমিই আমার খাবারের থালা নিজে নিয়ে আসবে, অন্য কারুর হাতে দেবে না"। শোনা যায় যে, মহিলাটীর স্বভাব-চরিত্র নাকি বিশেষ ভাল ছিল না এবং অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া শ্রীমা করজোড়ে বলিয়াছিলেন : "তা আমি জানি, কিন্তু মা বলে যদি কেউ আমার কাছে আসে ও কিছু চায়, তাহলে তাকে আমি ফেরাতে পারবো না।" পুনরায় শ্রীমা বলিলেন : "ঠাকুর, তুমিতো শুধু আমার ঠাকুর নও, সকলেরই ঠাকুর।" শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার সেই কথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না।

এই ঘটনা হইতে আমরা বুঝি যে, পরিপূর্ণ মাতৃত্বের অধিকার লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটও শ্রীমা অবিচল ও অটল থাকিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও সেখানে শ্রীমার সকল কথা, সকল প্রতিবাদ ও আবদার মানিয়া লইতেন। শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে এই ধরণের ঘটনা কতবারই না ঘটিয়াছে এবং সকল-কিছুর মধ্যেই আমরা শ্রীমার মধ্যে পূর্ণ-মাতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছি। তাই বলি, শ্রীসারদাদেবী ছিলেন উনবিংশ-বিংশ শতকের সমগ্র মানবসমাজের একজন অসামান্যা আদর্শ নারী এবং বিশ্বমাতৃত্বের দিব্য-মহিমায় তিনি ছিলেন এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সকল-কিছু দুঃখ, অশ্রু ও বেদনাময় পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীমা ছিলেন সর্বংসহা ও সর্বদুঃখহরা। আপন অন্তর দিয়া তিনি সকল সন্তানের ব্যথা ও অপরাধ গ্রহণ করিতেন এবং সকলকে দুঃখ-বেদনা হইতে মুক্ত করিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিতেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা বলি। একজন বৃদ্ধা মাঝি-বউ শ্রীমার বাড়ীতে প্রায়ই যাইত। একবার কিছুদিন সে শ্রীমার নিকট আসিতে পারে নাই এবং পরে সে শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিলে শ্রীমা তাহাকে কাছে ডাকিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহার একটি পুত্র চিরদিনের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া অকালে চলিয়া গিয়াছে এবং তাহারই জন্য সে আসিতে পারে নাই। শ্রীমা সস্নেহে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শ্রীমার অপার স্নেহ-করুণা দর্শন করিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধার চক্ষে অশ্রুধারা দেখিয়া শ্রীমাও কাঁদিতে লাগিলেন। উভয়ের ক্রন্দন-শব্দ শুনিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধা ও শ্রীমার অপরূপ সেই ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে শ্রীমার ক্রন্দন প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তানহারা বৃদ্ধা মাঝি-বউয়ের দুঃখ ও ক্রন্দন প্রশমিত হইল এবং শ্রীমাও শান্ত হইলেন। শ্রীমা তখন নবাসনের বউকে বলিয়া তৈল আনাইয়া নিজে মাঝি-বউ-এর মাথায় তৈল ঢালিয়া দিলেন। মাথায় তৈল মাখানো শেষ হইলে শ্রীমা বৃদ্ধার আঁচলে মুড়ি ও গুড় বাঁধিয়া দিয়া ছল ছল নেত্রে তাহাকে বিদায় দিলেন এবং পরম-আদরের সহিত স্নেহভরে মাঝি-বউকে আবার আসিতে বলিলেন। শ্রীমার মধ্যে এইরূপ স্নেহ-করুণার মন্দাকিনীধারার নিদর্শন অনেকে বহুবারই প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছে। বৃদ্ধার মতো কত শত শোকসন্তপ্ত মানুষ শ্রীমার নিকট আসিয়া ও স্নেহ-করুণার স্পর্শ পাইয়া জীবনে ধন্য হইয়াছে।

আর একটি ঘটনার কথা এখানে বলি। শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে বাস করিতেন তখন জনৈকা বৃদ্ধা শ্রীমার কাছে প্রায়ই আসিয়া গল্প করিত। শ্রীমাও তাহাকে আপনার কন্যার মতো স্নেহ-যত্ন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু সেই বৃদ্ধাকে একটুও পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহার গতজীবন নাকি বিশেষ ভাল ছিল না। ত্রিলোকদর্শী শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বৃদ্ধাপ্রসঙ্গে শ্রীমাকে সেই কথা

বলিয়াছিলেন। শ্রীমা তাহা শুনিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিলে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া বরং স্নেহভরে প্রতিদিন নহবতে আসিতে বলিয়াছিলেন। বৃদ্ধা শ্রীমাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিত ও শ্রীমার নিকট আসিয়া সে সত্যই জীবনে শান্তি লাভ করিয়াছিল। অপার্থিব মাতৃস্নেহের নিকট সন্তানের অপরাধ তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল এবং কলঙ্কিনী কন্যাকে শ্রীমা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আর কোন কথা বলিলেন না, বরং শ্রীমার মাতৃত্বের নিকট নিজে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন।

এমনি আরও দুইজন বিখ্যাত অভিনেত্রী তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী শ্রীমার নিকট যাতায়াত করিত। শ্রীমা লক্ষ্য করিতেন যে, ঐ দুইজন রমণী আসিয়াই অতি সঙ্কোচের সহিত শ্রীমার নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাকিত, কারণ তাহারা নাকি ভাবিত যে, তাহাদের অশুচি ও অপবিত্রতা যেন শ্রীমাকে কোনদিন স্পর্শ না করে। কিন্তু অন্তর্যামিনী শ্রীমা তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অভয় দান করিয়াছিলেন। আর একদিন তাহাদের লক্ষ্য করিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "এদেরই ঠিক ঠিক ভক্তি। এই দীনতা দিয়েই এরা ভগবানের পূজা করে এবং যেটুকু ভগবানকে ডাকে, তারা নিষ্ঠার সঙ্গেই ডাকে।"

আর একদিন শ্রীমা ঠাকুর-ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময় অভিনেত্রী তিনকড়ি আসিয়া ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় বসিল। শ্রীমা তাহাকে আসিতে দেখিয়া একটি গান গাহিতে বলিলেন। তিনকড়ি শ্রীমার আদেশ পাইয়া সুকণ্ঠে গান ধরিল,

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে যাই সে যায় পাছে, বলতে হয় না জোর করে॥
আমি জানতে এলাম তাই
কে বলে রে আপন রতন নাই ?
সত্যি-মিথ্যে দেখনা এসে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে॥

সেই কিন্নর-কণ্ঠের গান শুনিয়া শ্রীমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। শ্রীমা স্নেহভরে তিনকড়িকে আশীর্বাদ করিলেন এবং আবার আসিতে বলিলেন। তিনকড়ি করুণাময়ী শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল এবং শ্রীমা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্তানবৎসলা শ্রীমার স্নেহ-করুণার নিদর্শন সত্যই জগতে বিরল।

দক্ষিণেশ্বরে তখন প্রায়ই একজন পাগলিনী আসিত। পাগলিনী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিয়াছিলেন: "আমি তোমার মধুরভাবের সঙ্গিনী"। শ্রীশ্রীঠাকুর পাগলিনীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জনৈক সন্তানকে বলিয়াছিলেন পাগলিনীকে বাহির করিয়া দিতে। শ্রীমা সেই দৃশ্য নহবতখানা হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কন্যাতুল্য অসহায়া পাগলিনীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে দেখিয়া শ্রীমার অন্তর দুঃখ-বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একটি স্ত্রীলোককে দিয়া পাগলিনীকে ডাকাইয়া আনিয়া সস্নেহে বলিলেন: "মা, তোমাকে ঠাকুর যখন দেখতে পারেন না, তখন তাঁর কাছে তুমি যাও কেন? তুমি আমার মেয়ে, আমার কাছে আসবে।" পাগলিনী শুনিয়া শান্ত হইল ও শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। করুণাময়ী শ্রীমা এই ভাবে পাগলিনীর ব্যথার ভার নিজে গ্রহণ করিয়া পরমস্নেহে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন।

শ্রীমার নিকট জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই ছিল সন্তানতুল্য। একবার জয়রামবাটীতে যখন শ্রীমা ছিলেন তখন প্রায়ই আমজাদ আলি নামে একটি মুসলমান ভক্ত শ্রীমার নিকট আসিত। সে মাঝে মাঝে অভাবের তাড়নায় চুরি-ডাকাতিও করিত। সেজন্য সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। শ্রীমা তাহা জানিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্ষমা ও করুণার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। তাই তাঁহার চক্ষে ভক্ত আমজাদের কোন দোষ-ত্রুটিই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীসারদাদেবীস্তোত্রে

লিখিয়াছেন : "দোষানশেষান্ সগুণী করোষি", অর্থাৎ মানুষের অসংখ্য দোষকে করুণাময়ী শ্রীমা গুণ বলিয়া দর্শন করিতেন, কাহারও দোষকে তিনি দোষ বলিয়া দেখিতেন না। সত্যই এই মহান্ আদর্শের প্রতিফলন আমরা শ্রীমার মধ্যে দেখি।

পুনরায় আমজাদের প্রসঙ্গেই বলি। একদিন শ্রীমা আমজাদকে জয়রামবাটীতে আপন ঘরের বারান্দায় বসাইয়া খাইতে দিয়াছেন এবং একজন স্ত্রীলোক-ভক্ত যখন আমজাদকে পরিবেশন করিতেছিল তখন দূর হইতে ছুড়িয়া ছুড়িয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তাহাকে পরিবেশন করিতেছিল। শ্রীমা তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে আমজাদকে পরিবেশন করিতে করিতে স্ত্রীভক্তটিকে বলিলেন, এই ভাবে পরিবেশন করিলে কাহারও খাওয়া হয় না, বরং যে খায় সে মনে কষ্ট পায়। তাই আদর যত্ন করিয়া খাইতে দিতে হয়। ইতিমধ্যে আমজাদ আলির খাওয়া শেষ হইল এবং শ্রীমা নিজের হাতে সেই উচ্ছিষ্ট স্থান পরিস্কার করিয়া দিলেন। শ্রীমাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া উপস্থিত কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, শ্রীমার জাত গিয়াছে। শ্রীমা তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন : "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদ আলিও তেমনি ছেলে।"

এই প্রসঙ্গে করুণাময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে। জাতি, মান, কুল প্রভৃতির অভিমান দূর করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে একদিন নর্দমার পরিত্যক্ত এঁটো-পাতা প্রভৃতি সরাইয়া নিজের কেশগুচ্ছের দ্বারা উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়াছিলেন; অভিমান ও অহঙ্কারই মুক্তিপথের অন্তরায় ও বন্ধন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণা শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নিরভিমান ও নিরহংকারের পবিত্রোজ্জ্বল আদর্শকেই জীবনে বরণ করিয়াছিলেন। আমজাদ আলির উচ্ছিষ্ট স্থান পরিস্কার করিতে তাই শ্রীমার মনে এতটুকুও সঙ্কোচবোধ হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার এই মহান্ আদর্শ

বিশ্বে বরনীয়। শ্রীমার নির্বিচার-ব্যবহারের মধ্যে সত্যই জাতি-বর্ণ-ভেদের স্পর্শ ছিল না, বরং তিনি কাহারও মধ্যে কোন দোষ বা দুর্বলতা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে তাহার মনকে জয় করিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া একবার শ্রীমার নিকট কেহ দাড়াইলে তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে তাহাকে স্থান দিতেন। সত্যই শ্রীমা ছিলেন চিরক্ষমাসুন্দর-মূর্তিময়ী স্নেহময়ী জননী।

শ্রীমার মধ্যে এমনি একটি অনন্যসাধারণ শক্তি নিহিত ছিল যাহার প্রভাবে কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত মানুষের মন পবিত্র ও নির্মল হইত। শ্রীমা বলিতেন: "দোষ তো মানুষের থাকবেই, কিন্তু সেই দোষকে ভুলে কিভাবে সন্তানদের ঠিক পথে পরিচালিত করা যায় সেটাই তো আসল কথা।" এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিব। একবার শ্রীমার নিকট একটি লোক আসিয়াছিল। সে জাতিতে ছিল তুঁতে-মুসলমান। সে লোকটি কয়েকটি কলা ঠাকুর-পূজার জন্য আনিয়াছিল, কিন্তু সেই সামান্য দ্রব্য কিভাবে ঠাকুর-পূজার জন্য দিবে সেইজন্য সে সংকোচবোধ করিতেছিল। শ্রীমা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাহার নিকট হইতে ফলগুলি গ্রহণ করিয়া শ্রীঠাকুরপূজার জন্য নিজেই সেইগুলি দিবেন বলিলেন। তাহার পর শ্রীমা সেই মুসলমান-লোকটিকে আদর যত্ন করিয়া মুড়ি-মিষ্টি খাইতে দিলেন। লোকটির প্রতি শ্রীমার সেই স্নেহপূর্ণ আচরণ দেখিয়া জনৈকা স্ত্রীলোক শ্রীমাকে বলিল: "মা, লোকটি চোর ও খারাপ, তা তুমি অত ওকে যত্ন কর কেন?" শ্রীমা শুনিয়া গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিলেন: "মা, কে মন্দ, কে ভাল, আমি তা খুব ভালভাবেই জানি। কিন্তু ভালবাসার কাছে ভাল-মন্দ কিছুই থাকে না। আমি ভালটাই দেখি, তাই সকলকে ভালবাসি।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় শ্রীমা বলিলেন:

"লোকেরা কেবল সবার দোষই দেখে, গুণকে আর কজন দেখে বলো? কিন্তু দোষের মধ্যে গুণকেই দেখতে চেষ্টা করা উচিত। আর কি করে সকলকে ভাল করা যায় তাই চিন্তা করা উচিত।" শ্রীমার এই সহজাত ক্ষমাদৃষ্টির কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি বিস্মিত হইল এবং শ্রীমার নিকট নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

এখানে মনে পড়ে আর একটি ঘটনার কথা। শ্রীমা তখন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে শ্রীবাঁকে বিহারী বা বঙ্কুবিহারীকে দর্শন করিয়া শ্রীমা ভাববিহ্বলা ও আনন্দে আত্মহারা। বঙ্কুবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীমা প্রার্থনা করিলেনঃ "হে বাঁকে বিহারী, রূপটি তোমার বাঁকা, কিন্তু মনটি তোমার সোজা। বাঁকে বিহারী, আমার মনের বাঁকটি তাই সোজা করে দাও।" যিনি বিশ্বজননী রাজরাজেশ্বরী, যাঁহার করুণা-কটাক্ষে মনের মালিন্য দূর হইয়া মানবের জীবনের গতি কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়, তাঁহার আবার মনের বাঁক বা গতি পরিবর্তনের জন্য শ্রীভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা কেন। রহস্যময় বটে ভগবতীর লীলা ও প্রার্থনা। তবে একথা সত্য যে, শ্রীমার সেই প্রার্থনার মধ্যে গভীর এক রহস্য নিহিত ছিল। তিনি নিজেকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্বের অগণিত মানবের কল্যাণের জন্যই বৃন্দাবনেশ্বর ভগবান শ্রীবঙ্কুবিহারীর নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লীলার মধ্যে তাই শুধুই রহস্য লুকানো থাকে না, থাকে অপরূপ স্বর্গীয় মাধুর্য ও মহিমার অনন্ত বিকাশ। যুগে যুগে এই লীলার অভিনয় হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-যুগেও তাহার সমাপ্তি নাই।

শ্রীমার মধ্যে আমরা অসাধারণ সহ্যগুণ ও ক্ষমার ভাব সর্বদাই লক্ষ্য করি। মনে পড়ে, শ্রীমার শেষ অসুখের সময় একজন স্ত্রীভক্ত কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলঃ "মা, আমাদের কি হবে।" শ্রীমা তাহাকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেনঃ "যদি শান্তি চাও মা, তবে কারও কোন দোষ দেখো না, বরং দোষ

দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার এবং তুমি জগতের।" শ্রীমার উপদেশে স্ত্রীলোকটি মনে সান্ত্বনা পাইয়াছিল।

শ্রীমার অমৃতময় জীবনের সংস্পর্শে যাঁহারা একবার আসিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। দুষ্কৃতকারী তস্করও তাহার নৃশংসতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমার উপদেশে সৎপথে পরিচালিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা সকলেরই নিকট বিদিত। শ্রীমা কিছুদিন জয়রামবাটীতে থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন স্থির করিলেন। সুতরাং একটি শুভদিন দেখিয়া কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পড়ে বিস্তৃত প্রান্তর তেলেভোলার মাঠ। মাঠের মধ্যে দিয়া পথটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক. সেজন্য সকলেই পথটিকে মনে মনে অত্যন্ত ভয় করিত। সকলেই তাহার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব সন্ধ্যার পূর্বেই ঐ পথটি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিত। শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গীগণ সকলেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন সন্ধ্যার পূর্বেই ঐ তেলেভোলার মতো দুর্গম মাঠের পথটি অতিক্রম করিবার জন্য, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীমা আর সঙ্গীদের সহিত চলিতে পারিলেন না। তিনি সঙ্গীদের বলিলেন ঃ "তোমরা এগিয়ে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে তারকেশ্বরে মিলিত হবো।" সঙ্গীরা শ্রীমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাই করিলেন। ক্রমশ পৃথিবীর কোলে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল ও সকল দিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নীরব নিথর প্রকৃতি। চারিদিকে কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকার কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাইতেছিল না। শ্রীমা একাকী অন্ধকারের মধ্য দিয়া কোন রকমে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ দূরে কি যেন একটা কালো ছায়ার মতো বস্তু দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমশই সেই ছায়া নিকটে আসিতে লাগিল ও অবশেষে শ্রীমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে গতিশীল ছায়াটি আর কিছুই নহে, তেলেভোলার মাঠে বাগ্‌দী ডাকাত-সর্দারেরই এক ভয়ঙ্কর ঃ করাল মূর্তি। তাহার আকৃতি ছিল অতিশয় ভীষণ ও ভয়ঙ্কর, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কাঁধে বড় একটি মোটা লাঠি, দুহাতে রূপার বালা ও মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। তাহাকে নিকটে দেখিয়া শ্রীমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই সেই ভয়ঙ্কর নৃশংস ডাকাত। শ্রীমা ইহার কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। ডাকাতের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া শ্রীমার অন্তরে কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া কেবল কি হয় তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ও ধীরে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বাগ্‌দী ডাকাত-সর্দার একেবারে শ্রীমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কর্কশস্বরে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ "কে গা, এই নির্জন মাঠে একা দাঁড়িয়ে ?" শ্রীমা বলিলেন ঃ "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে চলে গেছে, তুমি যদি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে তোমার জামাইয়ের কাছে আমাকে পৌছে দাও, তা' হলে আমার সুবিধা হয়!" নৃশংস ডাকাত-সর্দার সকরুণ কোমল কণ্ঠে 'বাবা' শব্দ শুনিয়া কি রকম যেন হইয়া গেল এবং নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে বাগ্‌দিনী ডাকাত-বউ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শ্রীমা ডাকাত-বউকে দেখিয়া 'মা' সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। ভাগ্যিস্ বাবা ও তুমি এসে পড়েছিলে তাই, তা না হলে আমি যে কি করতাম, তা বল্‌তে পারিনি।" শ্রীমার সেই নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাগ্‌দিনী-বউ ও ডাকাত-বাবার প্রাণ গলিয়া গেল। তাহারা সস্নেহে শ্রীমাকে সেই রাত্রি তাহাদিগের বাটীতে রাত্রি কাটাইয়া পরের দিন সকালে তারকেশ্বর অভিমুখে যাইতে অনুরোধ করিল। শ্রীমা অগত্যা ডাকাত-বউ ও ডাকাত-সর্দারের আদেশ মানিয়া লইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাহাদের বাটীতে গিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত

হইল। শ্রীমাও যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ডাকাত-সর্দার ও ডাকাত-বৌ মাঠের প্রান্তদেশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীমাকে বিদায় দিল। একটি মাত্র রাত্রির মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমা এবং ডাকাত-সর্দার ও সর্দার-পত্নীর মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল এক মধুর সম্পর্ক। শ্রীমাকে বিদায় দিবার সময় বাগ্‌দিনী-মা পার্শ্বের ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাইশুটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিল: "মা সারদা, এগুলি রাত্রে মুড়ির সঙ্গে খেও, তোমার কাপড়ে বেঁধে দিলাম।" তাহা এক মর্মস্পর্শী অথচ স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ বিদায়ের দৃশ্য। স্পর্শমণির পরশ লাগিয়া লৌহ স্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমার অপার্থিব মাতৃত্বের পুণ্যস্পর্শে নরঘাতক নৃশংস দস্যুর কঠিন প্রাণও স্নেহ-করুণায় দ্রবীভূত হইয়াছিল।

অলৌকিক চরিত্রময়ী শ্রীমার জীবনে এই রূপ কত আশ্চর্যময় ঘটনারই না সমাবেশ দেখা যায়! কত লোক কত-কিছু বিরূপ মনোভাব লইয়া শ্রীমার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু শ্রীমার পুণ্যস্পর্শে ও আশীর্বাদে তাহাদিগের জীবন আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। কত তাপবিদগ্ধ সহায়-সম্বলহীন মানুষ শান্তিলাভের জন্য আকুল হইয়া যে শ্রীমার নিকটে আসিয়াছে এবং জীবনে শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহার কিছু কিছু ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন, একজন ছিলেন পদ্মবিনোদ। করুণাময়ী শ্রীমার অশেষ কৃপা লাভ করিয়া তাহার জীবন শুচিশুভ্র ও পবিত্র হইয়াছিল। বাগবাজারের (কলিকাতা) পদ্মবিনোদ ছিলেন একজন নামকরা মাতাল। তিনি মাঝে মাঝে বলরাম বসুর বাড়ীতেও আসিতেন। তিনি শরৎ মহারাজ তথা স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে 'দোস্ত' বলিয়া ডাকিতেন। সেই সময়ে শ্রীমা থাকিতেন উদ্বোধন অফিসের দোতলায়। একদিন পদ্মবিনোদ প্রচুর মদ্য পান করিয়া মাতাল অবস্থায় গভীর রাত্রে উদ্বোধনের বাড়ীতে আসিয়া 'দোস্ত, দোস্ত'

বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিলেন। শরৎ মহারাজ কিন্তু সাড়া দিলেন না এবং অন্য সকলকে চুপি চুপি বলিয়া দিলেন যেন কেহ সাড়া না দেয়, কেননা শ্রীমা তখন দ্বিতলের ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। পদ্মবিনোদ দোস্তকে না ডাকিয়া সোজাসুজি শ্রীমাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন ঃ "মা, তোমার ছেলে এসেছে, ওঠো, দরজা খোল।" এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মবিনোদ মিষ্টকণ্ঠে গান ধরিলেন,

ওঠ গো করুণাময়ী, খোল মা কুটীর-দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতবার,
দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার।
সন্তানে রেখে বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
ধ্বনি-বর্ণ-তাল-লয়ে তিন গ্রাম বসাইয়ে,
ডাকিতেছি তবু নিদ্রে ভাঙ্গে নাকি মা তোমার ॥
খেলায় মত্ত ছিলাম বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর।
রাম বলে ত্যজি তোরে যাব কার কাছে আর,
মা বিনে কে লবে এই অকৃতি অধম-ভার ॥

আকুল কণ্ঠে সন্তান পদ্মবিনোদের গান শুনিয়া শ্রীমা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একেবারে জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলেন। তখন পদ্মবিনোদ উর্ধে শ্রীমার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন ঃ "সন্তানের ডাক শুনতে পেয়েছো মা করুণাময়ী? উঠেছো তো প্রণাম নাও।" এই কথা বলিতে বলিতে পানোন্মত্ত পদ্মবিনোদ রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও পথের ধূলা মাথায় দিয়া যাইবার সময় আবার সুকণ্ঠে গান ধরিলেন,

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে।
দোস্ত যেন নাহি দেখে ॥

আহা, পাষাণগলানো সুর। পদ্মবিনোদের গানে শ্রীমা বিচলিত হইলেন। পদ্মবিনোদ রাস্তার ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন এবং এক একবার শ্রীমার দিকে চাহিয়া পথের ধূলা মাথায় দিয়া বলিতেছেন: "মা, এই তোমার পদধূলি"। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিয়া শ্রীমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া করুণাময়ী শ্রীমা জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পদ্মবিনোদকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ধন্য পদ্মবিনোদ! সন্তানেরই জয় হইল। শ্রীমা সন্তানের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন এবং এখনও ডাকার মতো ডাকিতে পারিলে বিশ্বরূপিণী মা সন্তানের ডাকে সাড়া দেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। শ্রীমা পদ্মবিনোদের সম্বন্ধে পরের দিন জিজ্ঞাসা করিয়া সকল-কিছু শুনিলেন ও বলিলেন: "আহা, দেখেছ ছেলেটির জ্ঞান কত টনটনে।" উদ্বোধনের অনেকে তখন শ্রীমাকে 'পদ্মবিনোদের ডাকে রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠা শ্রীমার ঠিক হয় নাই, শরীর তাহাতে অসুস্থ হইতে পারে' বলিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "ওর ডাকে যে থাকতে পারি নে।" সত্যই সন্তানের করুণ আহ্বানে করুণাময়ী মা কি কখনো সাড়া না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন! সঙ্গত-অসঙ্গত—ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তো সাধারণ স্বার্থবিলাসী মানুষ করিয়া থাকে, স্বর্গের যিনি অপাপবিদ্ধ স্বার্থবিরোহী দেবী, বিশ্ববাসীর যিনি স্নেহময়ী ও প্রাণময়ী জননী, তাঁহার নিকট সঙ্গত-অসঙ্গত—ন্যায়-অন্যায়ের বিচার থাকে না, তিনি বরং তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-করুণায় সন্তানের সকল দুঃখ-বেদনা দূর করেন।

কিছুদিন পরে পদ্মবিনোদ দেহত্যাগ করিলেন। শোনা যায়, জীবনের শেষ কয়দিন সে 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ শুনিতেন ও শুনিতে শুনিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। মৃত্যুর দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম করিতে করিতে পদ্মবিনোদ শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কথা শ্রীমার কর্ণে পৌঁছিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "তা আর হবে না, শ্রীশ্রীঠাকুরের

ছেলে যে। কাঁদা মেখেছিল, ধুয়ে ফেলে যার ছেলে তাঁরই কোলে গেছে।”

॥ দুই ॥

বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর অপার্থিব দেবীভাব মাঝে মাঝে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি অতি সহজেই তাহা সংবরণ করিয়া ফেলিতেন। একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর শ্রীমার সহিত শিবুদাদা কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটীতে আসিতেছিলেন। শিবুদাদা জয়রামবাটীর প্রায় নিকটে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইলেন এবং তাহা দেখিয়া শ্রীমা সবিস্ময়ে বলিলেনঃ “ও কি রে শিবু, এগিয়ে আয়।” শিবুদাদা বলিলেনঃ “একটি কথা বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।” শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “কি কথা?” শিবুদাদা বলিলেনঃ “তুমি কে বলতে পার?” শ্রীমা উত্তর দিলেনঃ “আমি কে? আমি তোর খুড়ী।” শিবুদাদা বলিলেনঃ “তবে যাও, এই তো বাড়ীর কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।” তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। অতি বিব্রত-স্বরে শ্রীমা বলিলেনঃ “দেখ দেখি, আমি আবার কে রে? আমি মানুষ, তোর খুড়ী।” শিবুদাদা উত্তর দিলেনঃ “বেশ তো, তুমি যাও না।” শিবুদাদাকে নিশ্চল দেখিয়া শ্রীমা অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেনঃ “লোকে বলে কালী।” শিবুদাদা বলিলেনঃ “কালী তো? ঠিক?” শ্রীমা কহিলেনঃ “হ্যাঁ”। শিবুদাদা খুশী হইয়া বলিলেনঃ “তবে চল।” এই বলিয়া শিবুদাদা শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে জয়রামবাটী আসিলেন। ভক্তের কাছে যোগমায়া ভগবতী ধরা দিলেন। শ্রীমার প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরই জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়া ফলাহারিণী কালীপূজার এক অমানিশায় শ্রীমাকে পূজাপীঠে বসাইয়া

ষোড়শীজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। বিশ্বের নারীজাতি পুনরায় পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে সেইদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আর একবার জয়রামবাটী হইতে শ্রীমার কলিকাতায় যাইবার কথা স্থির হইয়াছে। শিবুদাদা এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীমার সহিত দেখা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, তিনি আর সেইদিন কামারপুকুরে ফিরিবেন না, কেননা শ্রীশ্রীরঘুবীরের পূজা, ভোগ, শীতল, সন্ধ্যারাত্রিক ও শয়নাদি শেষ করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমা তাহা শুনিয়া একটু অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারী বরদাকে কিছু ফল ও শাকসব্জি বাঁধিয়া শিবুদাদাকে সঙ্গে লইয়া আমোদর নদ পর্যন্ত আগাইয়া দিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারী বরদা তাহাই করিলেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল একটু পরেই শিবুদাদা আসিয়া শ্রীমার চরণে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেনঃ "মা, আমার কি হবে বলো, তোমার কাছে শুনতে চাই।" শ্রীমা অধীর হইয়া বলিলেনঃ "শিবু ওঠ্, তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেবা কর্‌লি। তিনি তোকে কত ভালবেসেছেন, তোর আবার চিন্তা কি? তুই তো জীবন্মুক্ত হয়ে আছিস।" শিবুদাদা তখনও ছাড়িলেন না, বলিতে লাগিলেনঃ "না, তুমি আমার ভার নাও, আর তুমি যা বলেছিলে, তুমি তাই কিনা বল।" শ্রীমা তখন সস্নেহে তাঁহার মাথায় ও চিবুকে হাত দিয়া যত প্রকারে আদর করেন ও সান্ত্বনা দেন, শিবুদাদা ততই অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ "বল, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ, আর তুমি সাক্ষাৎ মা কালী কিনা।" শ্রীমা শিবুদাদার অন্তরের সেই আকুলতা দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং শিবুদাদার মাথায় হাত রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেনঃ "হ্যাঁ, তাই।" শিবুদাদা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

শিবুদাদার চিবুক স্পর্শ করিয়া শ্রীমা পুনরায় চুমু খাইলেন। শিবুদাদাও চক্ষু মুছিয়া গাঁটরিটি কাঁধে লইয়া আনন্দে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীমার আদেশে ব্রহ্মচারী বরদা শিবুদাদার পুঁটলিটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে কামারপুকুর অভিমুখে চলিলেন। জয়রামবাটী গ্রামের বাহিরে কিছুদূর আসিয়া আনন্দে শিবুদাদা বরদা মহারাজকে বলিলেনঃ "ভাই, মা সাক্ষাৎ কালী। উনিই সাক্ষাৎ কপালমোচন; ওঁর কৃপাতেই মুক্তি, বুঝলে?" শিবুদাদার অগাধ ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখিয়া বরদা মহারাজ ভাবে গদগদ হইয়া বারবার চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীমা যে কি তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি মানবী—না দেবী!

একবার জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া শ্রীমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীমার সহিত কোন ভক্তের দেখা-সাক্ষাৎ তখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছিল। সেই সময় একজন ভক্ত শ্রীমার নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইল এবং শ্রীমার সহিত কাহারও দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ জানিয়া নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া পড়িল। বড় আশা করিয়া বহু দূর হইতে সে আসিয়াছে শ্রীমার আশীর্বাদ ও কৃপালাভের জন্য, কিন্তু তখন কি করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ জনৈক ভক্তের সহিত সে সেই সম্পর্কে কথাবার্তা কহিতেছিল এবং কোনরূপ উপায় হইতে পারে কিনা সেই সম্বন্ধে কাতরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। শ্রীমা দূর হইতে তাহাদিগের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন এবং শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আলুথালুভাবে দরজার নিকট আসিয়া শ্রীমা পরমেশ্বরানন্দ মহারাজকে বলিলেনঃ "কেন তুমি ওর আসা বন্ধ করেছ?" তাঁহার উত্তরে পরমেশ্বরানন্দ মহারাজ বলিলেনঃ "মা, শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন।" শ্রীমা

বলিলেন ঃ "শরৎ কী বলবে, আমাদের এ'জন্যই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।" পরমেশ্বরানন্দ মহারাজ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। এখানে ভক্ত ও ভক্তির জয় হইল। শ্রীমা নবাগত ভক্তকে দীক্ষা দান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ভক্ত শ্রীমার অনন্যসাধারণ কৃপার কথা ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল ও শ্রীমা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

শ্রীমার পক্ষেই তাহা করা সম্ভব হইয়াছিল। আপন শরীরের প্রতি শ্রীমা বড় একটা দৃষ্টি রাখিতেন না, বরং ভক্তসন্তানদিগের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য তিনি সকল সময়ই ব্যস্ত থাকিতেন। অশেষ কল্যাণময়ী ও করুণাময়ী শ্রীমা বলিলেন, সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই তো তাঁহার সংসারে আসা। শ্রীমার নিকট সেজন্য যে রকমভাবে যে কোন সন্তান যেরূপ অবস্থায়ই আসিয়া উপস্থিত হইত করুণাময়ী শ্রীমা তাহাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ভুলিয়া গিয়া সস্নেহে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া আশীর্বাদ করিতেন। দীন, হীন ও দুর্বল সন্তানকে শ্রীমা অভয়বাণী দিয়া হৃদয়ে সাহস, শক্তি ও বিশ্বাস আনয়ন করিতেন এবং সন্তানগণও শ্রীমার দেবদুর্লভ পবিত্র সান্নিধ্য ও অহেতুক করুণা লাভ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন।

একবার একজন ভক্ত জপ করিয়াও মনে শান্তি পাইতেছে না বলিয়া শ্রীমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করে এবং মন্ত্র জপ না করিলে শ্রীগুরুর অনিষ্ট হয় বলিয়া সে মন্ত্র শ্রীমাকে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল। তাহা শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন ঃ "দেখ, একি কথা! তোমাদের জন্য যে আমি ভেবে ভেবে অস্থির হলুম। ঠাকুর তোমাদের যে কবে (পূর্বেই) দয়া করেছেন।" বলিতে বলিতে শ্রীমার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। শ্রীমা আবেগের স্বরে বলিলেন ঃ "আচ্ছা, তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না।" ইতিমধ্যে ভক্তের হৃদয়ে চেতনার উদয় হইয়াছে। সে আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিল ঃ "মা, আমার সব কেড়ে নিলেন। এখন আমি কি করি? তবে কি

মা, আমি রসাতলে গেলুম ?” শ্রীমা তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সহিত অভয়মন্ত্র শুনাইয়া তাহাকে বলিলেন : “কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে ? যারা এখানে এসেছে আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নেই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে। আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আর—এটা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।” কি স্নেহপূর্ণ সেই বাণী ! শ্রীমার সন্তানবাৎসল্যের সঙ্গে সঙ্গে অমিত শক্তি ও করুণার তেজোদীপ্ত অথচ শান্তিময় আশ্বাস লাভ করিয়া ভক্ত শান্ত হইল। এজন্যই বলি যে, বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী একাধারে ছিলেন জননী, গুরু ও দেবতা। মানবীর বেশে ছিলেন শ্রীমা করুণার জাহ্নবীধারা !

বাগবাজারে উদ্বোধনের বাটীতে একবার শেষ অসুখের সময় এক ভক্তকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন : “তোমরা কি মনে কর, যদি ঠাকুর (নিজের দিকে দেখাইয়া) এ’ শরীরটা না রাখেন তাহলেও যাদের ভার নিয়েছি তাদের একজনও বাকী থাকতে আমার ছুটি আছে ? তাদের সঙ্গে থাকতে হবে, তাদের ভালমন্দের ভার যে নিতে হয়েছে। মন্ত্র দেওয়া কি চারটিখানি কথা। কত বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হয়, তাদের জন্য কত চিন্তা করতে হয়। এই দেখ না, তোমার বাপ মারা গেলেন, আমারও মনটা খারাপ হল। মনে হল, ছেলেটাকে ঠাকুর কি আবার একটা পরীক্ষায় ফেললেন ? কিসে ঠেলে-ঠুলে বেঁচে উঠবে—এই চিন্তা। সেই জন্যই তো এত কথা বললুম। তোমরা কি সব বুঝতে পার ? যদি তোমরা সব বুঝতে পারতে, আমার চিন্তার ভার অনেক কমে যেত। ঠাকুর নানান ভাবে নানান জনকে খেলাচ্ছেন, টাল সামলাতে হয় আমাকে। যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের তো আর ফেলতে পারিনে।” গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক যে অনন্তকালের একথাই শ্রীমা অতি সহজ সরল কথায় সেইদিন সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।
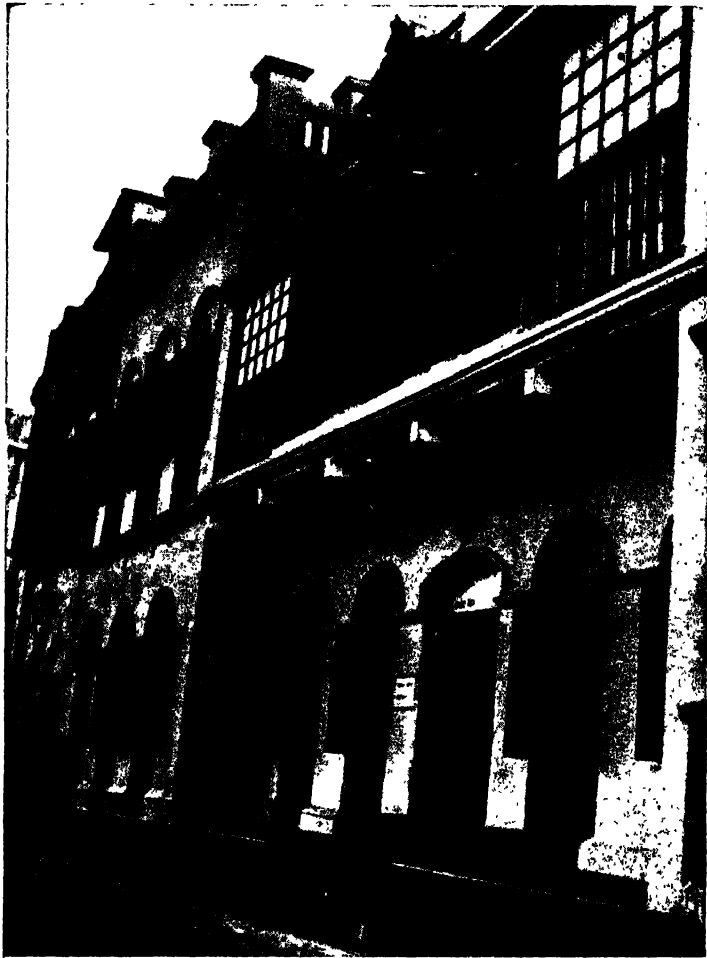
শ্রীমার বাটীর সম্মুখভাগ
(বাগবাজার)

উদ্বোধনে শ্রীমার বাটীর ঠাকুর-ঘরে

পূজারতা শ্রীমা

শ্রীমার প্রকৃত সন্তানবাৎসল্যের নিদর্শনস্বরূপ আর একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। একবার জয়রামবাটীতে শ্রীমার নিকট স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ মহারাজ আসিয়াছেন। তিনি আহারের পর তাঁহার উচ্ছিষ্ট দ্রব্য তুলিতে যাইবেন এমন সময় শ্রীমা হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া থালাখানি নিজেই তুলিয়া লইলেন। বিশ্বেশ্বরানন্দ মহারাজ সবিস্ময়ে বলিলেনঃ "মা, আপনি কেন? আমিই নিচ্ছি।" শ্রীমা তাহাতে বলিলেনঃ "আমি তোমার আর কি করেছি? মার কোলে ছেলে বাহ্যে করে, কত কি করে। তোমরা দেবের দুর্লভ ধন।" সেই সময় শ্রীমার নিকট অন্য যে সকল স্ত্রীভক্তরা থাকিতেন তাঁহারা শ্রীমার সেই ধরণের আচরণ বা ব্যবহার ঠিক পছন্দ করিতেন না, উপরন্তু সময়ে সময়ে অনুযোগ করিয়াও শ্রীমাকে বলিতেনঃ "তুমি বামুনের মেয়ে, আবার গুরু, এরা তোমার শিষ্য। তুমি এদের এঁটো নাও কেন? এতে যে এদেরই অমঙ্গল হবে।" শ্রীমা হাস্য করিয়া সহজভাবে তাহাদিগের কথার উত্তর দিয়া বলিতেনঃ "আমি যে মা গো! মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?"

আর একবার উদ্বোধনের বাটীতে একটি ছোট মেয়ে শ্রীমার কম্বলে শুইয়া উহা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাহার মা সেই কম্বলটি পরিষ্কার করিবার জন্য উঠিয়াছে, কিন্তু শ্রীমা তাহার হাত হইতে কম্বলটি জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া নিজেই ধুইয়া আনিলেন। মেয়েটির মা বিস্ময়ে আপত্তি করিয়া বলিলেনঃ "মা, তুমি কেন ধোবে?" শ্রীমা স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেনঃ "কেন ধোব না? ও কি আমার পর?" 'ও কি, আমার পর' এই কথাগুলি শ্রীমা এমনই স্নেহপূর্ণভাবে বলিলেন যে, মেয়েটির মা ও উপস্থিত সকলে আনন্দাশ্রু ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সত্যই শ্রীমার অন্তর হইতে শুচি-অশুচির ভেদভাব ও সংকীর্ণতা চিরদিনের জন্য মুছিয়া গিয়াছিল। তাহারপর শুধুই তিনি ভক্ত-সন্তানদিগের স্নেহময়ী মা-ই ছিলেন না,

ছিলেন সকলের পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বজন-পরিজন সকল-কিছু। সেইজন্য কোন সংস্কার ও বাধা-বিপত্তিই তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত করুণা-প্রবাহকে ব্যাহত করিতে পারিত না। আশা ও ভরসার বাণীই তিনি সকলকে সকল সময়ে শুনাইতেন এবং সকলের অন্তরে অসীম শক্তির সঞ্চার করিতেন। যেমন একবারের এক ঘটনা। শ্রীমার নিকট এক শিষ্য দুঃখ করিয়া বলিল, তাহার ভয় হয় যে, মার মত মা পাইয়াও সে জীবনে কিছু করিতে পারিল না। শ্রীমা তাহার মুখে নিরাশার বাণী শুনিয়া অভয়দান করিয়া বলিলেন: "ভয় কি বাবা, সর্বদাই জানবে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আর আমি রয়েছি। আমি মা থাকতে ভয় কি তোমাদের। ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবো'। যে যা খুশী কর না কেন, যে যেভাবে খুশী চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন; তারা তো তাদের খেলা খেলবেই।" শিষ্য আশ্বস্ত হইয়া শ্রীমার চরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

আর একদিন উদ্বোধনের বাটীতে শ্রীমার নিকট সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নিজ জীবনের ভুল বুঝিতে পারিয়া আপন দুষ্প্রকৃতির জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া শ্রীমার ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন: "মা, আমার উপায় কি হবে? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্য নই।" শ্রীমা তাহার সকল কথা শুনিয়া এবং নিজের বাহুদ্বারা তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন: "এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও। ভয় কি?" সত্যই শ্রীমা স্ত্রীলোকটিকে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীমা ছিলেন পতিতোদ্ধারিণী ক্ষমাসুন্দর জননীমূর্তি; কাহারও পাপকে

ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া কৃপার চক্ষেই শ্রীমা সর্বদা দেখিতেন এবং একান্ত অপরাধীকেও তিনি ক্ষমা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এজন্যই শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তোত্রে লিখিয়াছেন ঃ "দোষান্ অশেষান্ সগুণী করোষি",—যিনি অসংখ্য দোষকে গুণ বলিয়া দর্শন ও গ্রহণ করিতেন। তাহার পর হইতে স্ত্রীলোকটি শ্রীমার নিকট মাঝে মাঝে আসিতেন। শ্রীমা তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন।" অর্থাৎ শ্রীমা বলিতেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের দোষ ক্ষমা করিয়া মুক্তি দিতে আসিয়াছেন।

শেষ অসুখের সময় শ্রীমা সারদা সর্বদাই জপ করিতেন। একদিন রাত্রে শ্রীমাকে বসিয়া জপ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আপনি কি ঘুমান নাই, বা ঘুম হচ্ছে না?" শ্রীমা সস্নেহে তাহাকে বলিলেন ঃ "কি করি বাবা, ছেলেরা সব ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, আগ্রহ করে, দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত কেন, কিছুই করে না। তা—যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি, আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, 'হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো। এ' সংসারে বড় দুঃখ-কষ্ট! আর যেন তাদের না আসতে হয়।" সেবক শ্রীমার কথা শুনিয়া বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আর একদিন একজন ভক্তকে শ্রীমা আশ্বাস দিয়া বলিলেন ঃ "তোমার চিন্তা কি বাবা; তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়। তোমার কিছু করতে হবে না, তোমার জন্য আমিই করছি।" ভক্তটি শ্রীমার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ "তোমার যেখানে যত সন্তান আছে, সকলের জন্যেই তোমার করতে হয়।" শ্রীমা শুনিয়া বলিলেন ঃ "হ্যাঁ"। ভক্ত আবার জিজ্ঞাসা করিল ঃ "তোমার

এত ছেলে রয়েছে, সকলের কথা মনে পড়ে মা ?” শ্রীমা সেইবারও হাসিয়া বলিলেনঃ “যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্য জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্য ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি, ‘ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাই করো’।” শ্রীমার জীবনে সকলই অসাধারণ, আবার সকলই সাধারণ ছিল। সন্তানের তিনি স্নেহময়ী মা, সুতরাং সন্তানের মঙ্গলের জন্য সকল-কিছু করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না।

আর একদিন একজন ভক্ত শ্রীমাকে জপ করিলে কি ফল হয় সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা তাহাকে বলিলেনঃ “জপ-টপ কি জানো ? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়।” কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীমা আবার তাহাকে বলিলেনঃ “জপ ধ্যান সব যথাসময়ে আলস্য ত্যাগ ক’রে করতে হয়। রোজ পনেরো-বিশ হাজার ক’রে সকলে জপ করতে পারে তাহলে হয়। আগে করুক, না হয়, তখন বলবে। কেবল বলে, কেন হয় না ?” ভক্তটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলঃ “জপের পর কাজ-কর্ম করবো কি ?” শ্রীমা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেনঃ “কাজ কর্ম করবে বই কি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপ, ধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার, অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যাকালে একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি করলাম—না করলাম, তার বিচার আসে। তারপর কালকের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা ধ্যান-জপ না করলে কি করছ—না করছ বুঝবে কি করে ? ধ্যান-জপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার।” সময়কে অবলম্বন করিয়া ও সময়ের পারে গিয়া ইষ্টমন্ত্রে না ডুবিলে জপ হয় না সেই রহস্য শ্রীমা জানিতেন, কিন্তু তাহলেও প্রথম প্রথম ধ্যান-

জপ করিবার সময় সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন, ধ্যান-জপ বেশী হল—কি কম হল তা বোঝবার জন্য।

শ্রীমা বিশেষ অধিকারীকে আবার সর্বদা ইষ্টদেবতার স্মরণ-মনন করিতে বলিতেন। এই স্মরণ-মননই বেদান্তের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাধনা। একজন ভক্ত দীক্ষার পর বাড়ী যাইবার সময় শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন : "মা, জীবনে উপায় কি?" শ্রীমার ঘরে একটি ঘড়ি ছিল, শ্রীমা উহা দেখাইয়া বলিলেন : "ঐ ঘড়ি যেমন টিক্ টিক্ করছে, ঠিক তেমনি নিয়মিত নাম করে যাও, তাতেই সব হবে, কিছু করতে হবে না।" ভক্তসন্তান ও সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীগণকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে শ্রীমা উপদেশ দিতেন। যাহার মধ্যে ভক্তির ভাব প্রবল দেখিতেন, তাঁহাকে ভক্তির উপদেশ দিতেন এবং বলিতেন ভগবানকে আপনার জন ভাবিয়া ভক্তি করিবে ও ভালবাসিবে, তাহা হইলেই জীবনে শান্তি ও মুক্তি পাইবে। আবার অন্য জনকে হয়তো জ্ঞানের উপদেশ দিয়া বলিতেন : "জপ বিড়বিড় করা মেয়েদের কর্ম, তোমাদের জ্ঞান আছে।" অর্থাৎ জ্ঞান-বিচারের ভাব যাহাদিগের মধ্যে লক্ষ্য করিতেন শ্রীমা তাহাদিগকে বিচারের কথাই বলিতেন। শ্রীমা আবার মাঝে মাঝে বলিতেন : "মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয় মা, ভক্তিই সব। ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট সব পাবে। উনিই সব।" কৃপার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার বলিতেন : "এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়, মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।" এই জপের প্রসঙ্গে একদিন একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন : "জপ-তপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়, কিন্তু ভগবানকে প্রেম-ভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। রাখালেরা কি কৃষ্ণকে জপ-ধ্যান ক'রে পেয়েছিল, না তারা 'আয়রে, নেরে, খারে' করে পেয়েছিল?" শ্রীমা এখানে সরল

বিশ্বাসে ও ছোট শিশুর মতো সরলতার মধ্য দিয়া শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় একথারই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

শ্রীমা সকল সময়ে সকলের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। ছোট-বড় ও ধনী-নির্ধনের ভেদ তাঁহার মধ্যে ছিল না। যদি কোনদিন কোন ভক্ত না আসিতেন তবে বলিতেনঃ "ভক্তেরা কেউ এলো না।" একবার গৌরীশানন্দ মহারাজ যখন জয়রামবাটীতে ছিলেন তখন শ্রীমার পায়ে বাতের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই অবস্থায় শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিলেনঃ "আজও দিনটা বৃথাই গেল! একজনও তো এল না! তুমি না বলেছিলে, 'তোমাকে নিত্যই কিছু-না-কিছু করতে হবে?" এই কথা বলিয়া শ্রীমা একবার ঘরের বাহিরে ও একবার ভিতরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যেন কী এক দিব্যভাবের আবেশে উন্মনা। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেনঃ "কই ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাবে?" তাহার পর কি জানি কেন শ্রীমা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন ও পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন। সেইদিন তো কাটিয়া গেল। পরের দিন এক অঘটন ঘটিল। কোথা হইতে তিনজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া শ্রীমার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

এখানে সত্যই আমরা লক্ষ্য করি, সন্তানের জন্য শ্রীমার কী আকুল স্নেহ ও আকর্ষণ। মাতৃভাবের জাহ্নবীধারা শ্রীমার হৃদয়-গোমুখী দিয়া অবিশ্রান্তভাবেই অবিরত প্রবাহিত হইত। স্নেহময়ী শ্রীমা সকলের জন্য চিন্তা করিতেন এবং সকলের জন্যই নিজের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া কল্যাণ-কামনা করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোন অন্যায় বা অত্যাচার তিনি জীবনে কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। মনে পড়ে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় কোয়ালপাড়া আশ্রমে কিছুদিনের জন্য ধ্যান-জপ, পূজা-পাঠ প্রভৃতি অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের চর্চা এবং তাঁত-চরকা ও

দেশসেবা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার দিকেই সকলের দৃষ্টি অধিক পড়িয়াছিল। সেইজন্য ঐ আশ্রমের প্রতি ইংরাজ-সরকারেরও বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। একদিন শ্রীমা তদানীন্তন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কেশবানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন: "দেখ বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য একটি ঘর এবং আমাদের পথের বিশ্রামের জন্য একটু স্থান করেছ, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করতে থাকবে। শুধু স্বদেশী ক'রে কি হবে? আমাদের যা-কিছু—সবের মূল ঠাকুর। তিনিই আদর্শ। যা-কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।" শ্রীমার এই কথা শুনিয়া কেশবানন্দ মহারাজ সকল-কিছু বুঝিতে পারিলেন এবং শ্রীমার ইঙ্গিত কোন্‌দিকে তাহাও অনুধাবন করিলেন। তবে তিনি শ্রীমাকে প্রকারান্তরে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন: "স্বামীজী তো দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে নিষ্কাম-কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না হত।" কেশবানন্দের কথা শুনিয়া শ্রীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিলেন: "ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা মোটেই দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তলোয়ার। বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, মা, আপনার আশীর্বাদে এ' যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুলুকে গিয়েছি। সেখানেও দেখলাম, ঠাকুরের কি মহিমা, কত অন্তরঙ্গ সজ্জন লোক আমার কাছে তাঁর (ঠাকুরের) কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো আগ্রহ সহকারে শুনেছে এবং এই ভাব নিয়েছে। তারাও তো আমার ছেলে—কি বলো?" তাঁহার সীমায়িত বুদ্ধিতে ত্রিকালদর্শিনী শ্রীমাকে তিনি স্বদেশী আন্দোলন ও চর্চার কিছু কিছু উপযোগিতার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া নিজের ভুল ও অজ্ঞতা বুঝিতে

পারিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া শ্রীমার চরণে মাথা রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

কেশবানন্দ মহারাজ সেইদিন শ্রীমার মধ্যে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং শ্রীমা যে স্বদেশ ও বিদেশের সকল সন্তানকেই আপনার ভাবিয়া ভালবাসেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তাই বলিয়া কোন জাতির অন্যায়-অত্যাচারকে শ্রীমা কোনদিন সহ্য করিতেন না। ঐ ঘটনার পর শ্রীমা পুনরায় সকলকে বুঝাইয়াছিলেন, সাধন-ভজন বা সাধনা ব্যতীত নিষ্কাম-কর্ম কেহ কোনদিন করিতে পারে না। কর্ম করিতে হইবে ও দেশের সেবা করিতে হইবে নারায়ণ-বুদ্ধিতে। প্রতিটি মানুষের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যই হইবে ঈশ্বর বা নারায়ণ-বুদ্ধিতে দেশসেবা ও জনসেবা করা এবং সেই ভাবদীপ্ত সেবার আদর্শকে হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের মহিমা ও স্বরূপ সর্বদা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। নিষ্কাম-কর্ম করিয়া চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কেহ কখনও নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবা বা জনসেবা করিতে পারে না এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবা বা জনসেবা না করিলে কর্মের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীমা এই সকল কথাই প্রকারান্তরে সকল সন্তান ও ভক্তগণকে উপদেশ দিলেন। উন্নত অধ্যাত্মজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে শ্রীমার যেমন লক্ষ্য ছিল, তেমনি লক্ষ্য ছিল সংসারের ও সমাজের ছোট-বড় সকল কাজের দিকে। মোটকথা পার্থিব ও অপার্থিব সকল বিষয়ের উপরই শ্রীমার ছিল সর্বদা সতর্ক-দৃষ্টি। মিথ্যা বা অনিত্য বলিয়া শ্রীমা কোনদিনই সাংসারিক কাজ-কর্মকে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতেন না, বলিতেন, ভগবানের সংসার, বা মহামায়ার সংসার। সংসারে থাকিয়া ভগবানের পাদপদ্মে এক হাত রাখিতে হইবে এবং অন্য হাত থাকিবে সংসারের সকল কাজে ও সকলের কল্যাণপ্রচেষ্টায়। ভগবানকে স্মরণে রাখিলে

শ্রীমার বাটী (জয়রামবাটী)

কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের (আদি-পুরাতন) বাটী

কিংবা বিশ্বসৃষ্টির মূলকারণ মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তবে মানুষ মায়ার মধ্যে থাকিয়াও জীবনে যথার্থ শান্তির পথ খুঁজিয়া পায়।

একবার কেদার মহারাজ শ্রীমাকে কোয়ালপাড়া আশ্রমের ব্যাপারে সেখানকার কর্মীদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করিয়াছিলেন। শ্রীমা শুনিয়া বলিয়াছিলেনঃ "সে কি গো কেদার, আমাদের ভালবাসাতেই তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় নরেন আমার ধীরে ধীরে এই সব করলে। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ঘর-সংসার ছেড়ে নরেন, রাখাল, শরৎ, বাবুরাম—সব ছেলেরা ঠাকুরের ভাব আশ্রয় ক'রে একসঙ্গে জুটল। এই দেখে আমার খুব আনন্দ হল। ওমা! কিছুদিন পরে দেখলাম তাদের বৈরাগ্য এল, সকলেই সংসারত্যাগী, কেউ কাউকে তেমন মানতে চায় না। একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে। এখানে ওখানে ভিক্ষা করে খায়, আর গাছের তলায় তলায় ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম, ঠাকুর, তুমি এলে, এই ক'জন শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেদের নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, এই ক'জনকে না হয় ধন্য করলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল! তা হলে এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? এত তপস্যারই বা কী প্রয়োজন ছিল? দেশে এ'রকম সাধুর তো অভাব নেই। আমার ছেলেরা তোমার ভাব নিয়ে এক একটি স্থান আশ্রয় করে বসবে, আর এ' সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার ভাব পেয়ে শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে এই জন্যই তো আসা।" কেদার-বাবা শ্রীমার কথা শুনিয়া একদিকে যেমন লজ্জিত হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি শ্রীমার ক্ষমাসুন্দরমূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া-ছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ সঙ্ঘজীবনের উপর শ্রীমার কি সতর্ক-দৃষ্টি ও মমতা!

বিদেশী শাসকদিগের অত্যাচারের জন্য দেশের জনগণের এত দুঃখ-দুর্দশা এবং সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্যই যে জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সেই কথা শ্রীমা ভালভাবে জানিতেন। সেইজন্য দেশের এখানে-সেখানে অত্যাচার ও বিপ্লবের কথা শুনিলে বা খবরের কাগজে পড়িলে শ্রীমা দীপ্ত কণ্ঠে কখনও কখনও বিদেশী ইংরাজ-সরকারের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেন। আবার কখনও কখনও সকল-কিছু অত্যাচারের কথা শুনিয়া তিনি গম্ভীরভাবে নীরব থাকিতেন। কুচবিহার জেলায় কোন একটি গ্রামে বিপ্লবাত্মক কর্মে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ভক্ত দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভগিনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সংবাদটি মুখে মুখে ছড়াইতে ছড়াইতে ক্রমে শ্রীমার নিকট আসিয়া পৌঁছাইল। দেবেনবাবুর ভগিনী তখন অন্তঃসত্বা ছিলেন। শ্রীমা সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কালীমামা (শ্রীমার কনিষ্ঠভ্রাতা) অত্যন্ত বিচলিত হইয়া যখন শ্রীমাকে আবার বলিলেন যে, দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভগিনীকে পুলিশ সারাপথ হাঁটাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছে, তখন শ্রীমা আর থাকিতে পারিলেন না, উত্তেজিত হইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: "বল কি?" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীমা অকস্মাৎ অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন: "এটা কি কোম্পানীর আদেশ, না পুলিশ সাহেবের কেরামুতি? নিরপরাধী স্ত্রীলোকের ওপর এত অত্যাচার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় তো কই শুনি নি? এ' যদি কোম্পানীর আদেশ হয়, তো আর বেশীদিন নয়। এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে, দু'চড় দিয়ে মেয়ে-দুটিকে ছাড়িয়ে আন্‌তে পারে?" কল্যাণীমূর্তির পরিবর্তে শ্রীমার তখন ভয়ঙ্করী রুদ্রমূর্তির বিকাশ। কিন্তু সেই তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার মধ্যেও ছিল শ্রীমার মুখে এক প্রশান্তির স্নিগ্ধ দ্যুতি। শ্রীমার সেই প্রসন্ন-গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মতো বলিতে ইচ্ছা হয়,

মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা
মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ-শোক, দারিদ্র-যাতনা,
ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা,
জীবে বল—কেবা কিবা করে?

অথবা,

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী,
সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ,
হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়
ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘটনা ঘটিল অপূর্ব রকমের। নিরাশার পটপরিবর্তন হইয়া ভাসিয়া উঠিল আশার এক উদ্দীপনা। কালীমামা ছুটিয়া আসিয়া শ্রীমাকে পুনরায় সংবাদ দিলেন, দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভগিনী পুলিসের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া শ্রীমা শান্ত হইলেন ও বলিলেন: "এ' খবর যদি না পেতুম তবে আজ আর ঘুমুতে পারতুম না।" শ্রীমার করালিনী অশান্ত রূপ তখন শান্ত হইয়াছে।

শ্রীমা যখন একবার কোয়ালপাড়ায় ছিলেন তখন একদিন একজন ভক্ত আসিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া শ্রীমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ জটিল। শ্রীমা ভক্তটিকে কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "হ্যাঁগা, যুদ্ধের কি খবর? কি লোকক্ষয়টাই না হল। কি মানুষ-মারা কলই না বের করেছে! আজকাল কত রকম যন্ত্রপাতি—টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। এই দেখনা, রাসবিহারী কাল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ এখানে পৌঁছে

গেছে।” এই কথা শুনিয়া প্রবোধবাবু পাশ্চাত্যদের প্রশংসায় অকস্মাৎ মুখর হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেনঃ “ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করেছেন।” প্রবোধবাবুর অকারণ উচ্ছ্বাসের কথা শুনিয়া শ্রীমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেনঃ “কিন্তু বাবা, ঐসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্ন-বস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।” প্রবোধবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেশের দুঃখ ও দুর্দশার জন্য শ্রীমার অন্তর একান্তভাবে ব্যাকুল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

আর একদিনের একটি ঘটনা। দেশে সর্বত্র তখন বস্ত্রাভাব। বস্ত্রাভাবে বিশেষ করিয়া কুলবধূরা ঘরের বাহিরে আসিতে পারে না। এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, লজ্জানিবারণে অসমর্থা হইয়া কোন কোন রমণী আত্মহত্যা করিতে লাগিল। সংবাদপত্রে সেই সকল মর্মন্তুদ আত্মহত্যার সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। একদিন ঐ সংবাদ শুনিতে শুনিতে শ্রীমা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ “ওরা (ইংরাজরা) কবে যাবে গো? ওরা কবে যাবে গো?” অতি করুণ অথচ কঠোর সেই কণ্ঠস্বর! অবশেষে নীরব থাকিয়া শ্রীমা বলিলেনঃ “তখন ঘরে ঘরে চরকা ছিল, ক্ষেতে কার্পাস-চাষ হত, কাপড়ের অভাব ছিল না। কোম্পানী এসে সব নষ্ট করে দিলে। কোম্পানী সুখ দেখিয়ে দিলে—টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাও। সব বাবু হয়ে গেল—চরকা উঠে গেল—এখন বাবু সব কাবু হয়েছে।” দেশের প্রতি শ্রীমার স্নেহদৃষ্টি ও ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাহা এই সকল ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

স্বদেশী-আন্দোলনের আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীমা একবার জয়রাম-বাটীতে একজন ভক্ত-যুবককে ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন কাপড় কিনিয়া আনিতে বলিলেন। যুবকটি একটু দেশপ্রেমিক ছিল।

শ্রীমার আদেশ শুনিয়া যুবক কোন বিদেশী কাপড় না কিনিয়া অনেকগুলি মোটা মোটা কাপড় কিনিয়া আনিয়া শ্রীমাকে দেখাইল। কিন্তু সেই কাপড়ের কোনটাই ছেলেমেয়েরা পছন্দ করিল না, সুতরাং শ্রীমাও পছন্দ না করিয়া ঐ কাপড়গুলি ফেরৎ দিয়া আরও মিহি ধরণের কাপড় কিনিয়া আনিতে বলিলেন। তখন দেশের সর্বত্রই বিদেশী কাপড়বর্জনের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। যুবক একটু বিরক্তস্বরে শ্রীমাকে বলিল: "ওসব তো বিলেতী হবে, ও আবার কি আনব মা?" শ্রীমা একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন: "বাবা, তারাও বিলেতের লোক তো,—আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন যেমন বলছে, তাই এনে দাও।" যুবকটির মনে একটু দ্বিধাভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীমা তাহাকে আর কাপড় কিনিয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন না, কেননা শ্রীমা কাহারও কোন ভাব নষ্ট করিতেন না।

॥ তিন ॥

সত্যই শ্রীমা সারদার জীবন ছিল অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। সহজ সাধারণ ভাবে তিনি জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু সেই সাধারণ আচরণের মধ্যেই এক অসাধারণ ও দিব্যভাবের বিকাশ অনেকে লক্ষ্য করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের কিছুদিন পরে শ্রীমা দক্ষিণ-দেশে তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশে শ্রীমার পদার্পণে বহু ভক্ত নরনারীকে তিনি কৃপা ও দীক্ষা দানও করিয়াছিলেন।

দক্ষিণদেশে যাইয়া তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে শ্রীমার একটু অসুবিধা হইলেও তাহাদের পক্ষে শ্রীমার অন্তরের ভালবাসার ভাষা বুঝিয়া লইতে বিশেষ-কিছু অসুবিধা হইত না।

বাঙ্গালোরে যখন শ্রীমা উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার আগমন-সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালোরের

আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে শ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য আকুল হইয়াছিল এবং যাহার যেমন সামর্থ তেমনি ফল, ফুল, মিষ্টি ও পুষ্পমাল্য লইয়া শ্রীমাকে দর্শন ও বন্দনা করিবার জন্য দলে দলে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এমনও এক এক দিন গিয়াছে যে, ভক্তগণের নিবেদিত পুষ্প-মাল্য শ্রীমার চরণে স্তূপাকারে পরিণত হইয়া উঠিত। শ্রীমা বাঙ্গালোরে প্রায় এক সপ্তাহকাল থাকাকালে সেখানে আনন্দের হাট বসিয়াছিল। সেই সময় একদিন স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী শ্রীমাকে গাড়ী করিয়া অদূরবর্তী একটি গুহা-মন্দিরে দেবতা দর্শন করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। মন্দিরাদি দর্শন করিয়া মঠে ফিরিবার সময় তাঁহারা দ্বারদেশে দেখিলেন যে, আশ্রমের সম্মুখের জমিতে দর্শনার্থী অগণিত নরনারীর ভীড় হইয়াছে। শ্রীমার গাড়ী ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইতেছিল। গাড়ীর শব্দ পাইয়া সকলে আগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেই সকলে সষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। সেই দৃশ্য দেখিয়া শ্রীমা গাড়ী হইতে নামিয়া অপূর্ব এক আবেশে অভয়-মুদ্রায় দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকেন। সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ ও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমার চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি ধীরে ধীরে আশ্রমের একটি বড় ঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সম্মুখে উপবেশন করেন। চতুর্দিক নীরব ও নিস্তব্ধ। শান্তির স্নিগ্ধ তবঙ্গ যেন চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সেই নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীমা বিশুদ্ধানন্দজীকে বলিয়াছিলেনঃ "এদের ভাষা তো জানিনা, দুটি কথা বলতে পারলে এরা কত শান্তি পেত।" যাহা হউক শ্রীমা বাংলা ভাষাতেই সমবেত ভক্তগণের উদ্দেশে কয়েকটি আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ বাণীগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া সমবেত সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাহারা শ্রীমার আশীর্বাণী শুনিয়া বলিয়াছিলঃ "না না, এই বেশ, এতেই আমাদের হৃদয়

আনন্দে ভরপুর হয়ে গেছে। এরকম ক্ষেত্রে মুখের ভাষার কোন দরকার নেই।" শ্রীমা ভক্তগণের কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

॥ চার ॥

শ্রীমার জন্মভূমি জয়রামবাটীর প্রসঙ্গে পুনরায় বলি। শ্রীমার পুণ্যস্মৃতিজড়িত জয়রামবাটী বাঙলার বারাণসীধাম। শ্রীমার পদধূলির পুণ্যস্পর্শে জয়রামবাটীর পবিত্র হইয়া রহিয়াছে ও চিরদিন থাকিবে। জয়রামবাটীর বৃক্ষ-লতা-নদী-পুষ্করিণী শ্রীমার পুণ্যস্মৃতির কথাই চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিবে।

জয়রামবাটী ক্ষুদ্র গ্রামটির প্রতি শ্রীমার অন্তরের আকর্ষণ বড় কম ছিল না। গ্রাম হইতে শ্রীমা যখন একবার কলিকাতায় রওনা হইবেন তখন তাঁহার খুড়ীমা আদরের সঙ্গে বলিলেন: "সারদা, আবার এসো।" শ্রীমা উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন: "আসব বই কি?" তাহার পর ঘরের মেঝেতে বারবার হস্ত স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া শ্রীমা বলিতে লাগিলেন: "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" সত্যই শ্রীমা দেবদুর্লভ স্বর্গ অপেক্ষা আপন জন্মভূমিকে অধিক পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন। গ্রামের সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে ছিল শ্রীমার একান্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক। সকলের সহিত ভালবাসার নানান সম্পর্ক পাতাইয়া শ্রীমা যেন গ্রামটিকে আপনার একটি বৃহৎ সংসারে পরিণত করিয়াছিলেন। গ্রামের ছোট-বড় সকল স্তরের মানুষই শ্রীমার আদর-যত্ন ও ভালবাসা লাভ হইতে বঞ্চিত হইত না।

শ্রীমার অলৌকিক জীবনচরিত্র ও জীবনাদর্শের কথা চিন্তা করিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। দিব্যভাবে পরিপূর্ণ ছিল শ্রীমার সহজ সরল মানবীলীলা। ধনী-নির্ধনের বিচার শ্রীমা জীবনে কোনদিন করিতেন না, বরং 'মা' বলিয়া যে কেহ একবার শ্রীমার নিকট উপস্থিত

হইয়াছে তাহাকেই করুণাময়ী আপনার জন করিয়া লইতেন। অধ্যাত্ম-জীবনসাধনার পথচারীদের প্রতি ছিল যেমন একান্ত দৃষ্টি, তেমনি ছিল তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অফুরন্ত করুণা। যে সকল বস্তু মানুষ জন্ম-জন্ম তপস্যা করিয়াও লাভ করিতে পারে না, শ্রীমার অহৈতুকী করুণায় ভক্ত-সন্তানগণ সেই সকল বস্তু সহজেই লাভ করিত। তাই পার্থিব জগতের সঙ্গে সঙ্গে অপার্থিব অতীন্দ্রিয় জগতের আনন্দ ও অনুভূতির আস্বাদন হইতে কেহই কোনদিন বঞ্চিত হইত না। আর শ্রীমার নিজ জীবনকর্মের কথাই যদি বলি, তবে বলিব যে, সংসারের সকল কর্মের সহিত ছিল শ্রীমার মন-প্রাণ জড়িত, অথচ কোন-কিছুর মায়াই তাঁহাকে কোনদিন স্পর্শ করিতে পারিত না। তাঁহার কারণ এই যে, শ্রীমার মন ছিল যেন একটি পদ্মপত্রে রক্ষিত নির্লিপ্ত জলবিন্দুর মতো। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার ভক্ত-সন্তানরা তাঁহার অপার স্নেহ-মমতা লাভ হইতে কোনদিনই বঞ্চিত হইত না। সন্তানদিগের সকল ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখ গ্রহণ করিয়া তিনি নিজে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে থাকিতেন। সত্যই শ্রীমা ছিলেন মহামায়ার জীবন্ত প্রতিমূর্তি, তাই অবিদ্যা বা মায়ার মালিন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

শ্রীসারদাদেবীর এই দিব্যস্বরূপের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর ভালভাবে জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই শ্রীমাকে কেহ কখনও কোন অন্যায় কথা বলিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীমাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতেন নিজের আরাধ্য-দেবতার মতো এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে দর্শন করিতেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী বলিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর এই পারস্পরিক দেবভাব ও অপার্থিব সম্বন্ধ বুঝিয়া ওঠা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত ছিল। দিব্যলীলা করিবার জন্যই বিশ্বজনক ও বিশ্বজননীর ধরায় পুণ্য-আবির্ভাব।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের ঘরের চৌকির উপর বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীমা ঘর ঝাঁট দিতে দিতে হঠাৎ তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন: "আমি তোমার কে?" অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর কোন রকম চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন: "তুমি আমার আনন্দময়ী।" হৃদয়রাম নিকটেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কৌতুক করিয়া বলিলেন: "মামী, তুমি মামাকে বাবা বলে ডাক না।" শ্রীমা উত্তর দিলেন: "উনি বাবা কি বলছ? মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন—সবই উনি।" শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। আর একবার শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন: "উনিই মনসা, গঙ্গা—সব।"

পূর্বের একটি ঘটনার কথা এখানে মনে পড়ে। সুরেন্দ্রবাবু নাকি একদিন জয়রামবাটীতে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজা করিতে গিয়া তিনি একটু দ্বিধায় পড়িয়াছেন, কেননা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ইষ্টদেবীকে "ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বরি" বলিয়া জপ বিসর্জন করিতে গেলে তিনি মনে একটু সঙ্কোচবোধ করেন। তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রীমা হাসিয়া বলিয়াছিলেন: "তা বাবা, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই মহেশ্বরী; তিনিই সর্বদেবময়, তিনিই সর্বজীবময়। তাঁতে সব দেবদেবীর পূজা হয়। মহেশ্বর বললেও হবে, মহেশ্বরী বললেও হবে।" শ্রীমার সেই কথা বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া সুরেন্দ্রবাবুর মনের সকল সংশয় দূর হইয়াছিল। আবার ঠিক ঐ' ধরণেরই আর একটি সময়ে দেখি শ্রীমা একজন স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন: "উনিই সব। উনিই পুরুষ, উনিই প্রকৃতি। ঐ (ঠাকুর) হতেই সব হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর যে সাক্ষাৎ ভগবান এবং তিনিই সকল দেবদেবীর স্বরূপ এই কথা শ্রীমা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন।

আর একদিনের কথা। জয়রামবাটীতে একবার শ্রীমা একজন ভক্তকে দীক্ষা দিবার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ভক্তের সকল ভার অর্পণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমর্পণ করিলেন ভক্তের সকল কর্ম, পাপ-পুণ্য ও ধর্মাধর্ম সমস্তই। তাহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুরূপে দেখাইয়া শ্রীমা ভক্তের কর্ণে ইষ্টমন্ত্র শুনাইলেন। কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানের

তখন মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে যদি শ্রীমা গুরুরূপে দেখাইলেন, তবে মা নিজে কে? দীক্ষামন্ত্র কর্ণে বা হৃদয়ে যিনি দান করেন তিনিই তো আসলে গুরুরূপে পরিচিত হন। তাই ভক্তের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, শ্রীমা যখন মন্ত্র দান করিলেন তখন শ্রীমাই তো তাহার গুরু বা আচার্য। কিন্তু ভক্ত এই রহস্য কীভাবে বুঝিবে যে, শ্রীমার মন-প্রাণ শ্রীশ্রীঠাকুরময়, শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মেই অর্পণ করিয়াছেন শ্রীমা নিজেকে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যতীত শ্রীমার পৃথক অস্তিত্বের কোন অর্থ থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর যে তত্ত্বে ও স্বরূপে এক ও অভিন্ন এই রহস্য বোঝা ভক্তের সাধ্যাতীত। সেইজন্য ভক্ত সন্দেহ-আন্দোলিত মন লইয়া শ্রীমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল: "ঠাকুরকে তাহলে কিভাবে চিন্তা করব?" শ্রীমা একটু গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "ইনিই সব,—পুরুষ, প্রকৃতি। এঁকে ভাবলেই সব হবে।" তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীমা সস্নেহে ভক্তকে বলিলেন: "ঠাকুরের ভেতর সব দেব দেবীই আছেন,—এমন কি শীতলা, মনসা পর্যন্ত।" শ্রীমা ভক্তের জ্ঞানদৃষ্টি খুলিয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরই সর্বদেবদেবীস্বরূপ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই সকল দেবতার অধিষ্ঠান।

এখানে এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ধ্যানে দিব্যদর্শনের কথা। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার আত্মজীবনী 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে তাঁহার যে দিব্যদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন: "একদিন গভীর রাত্রে ধ্যানস্থ হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম, আর আমার আত্মা যেন দেহরূপ পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যে আকাশে স্বাধীন বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। ক্রমশঃ তাহা উর্ধ্বে উঠিয়া অনন্তের দিকে উড্ডীয়মান হইল। আমি তখন অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এক

সুন্দর সুশোভিত প্রাসাদোপম সুরম্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া স্তরে স্তরে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাবের মূর্তিসকল দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া গেলাম। ক্রমে কোন অনির্বচনীয় আতিবাহিক আত্মার প্রেরণায় যেন প্রণোদিত হইয়া এক বিরাট (বড় হলের ন্যায়) কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেই কক্ষের চতুষ্পার্শে এক একটি বেদীতে সকল দেবদেবী, অবতার পুরুষ ও ধর্মপ্রবর্তকগণের মূর্তি, যথা হিন্দুদিগের দশাবতার, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, জারাথুষ্ট্র, মহম্মদ এবং অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকগণ উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। আর সেই হলের মধ্যস্থলে পরমহংসদেব দণ্ডায়মান ছিলেন। আমি সেই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতেছি, এমন সময় পরমহংসদেবের মূর্তি জ্যোতির্ময় হইয়া বিরাট রূপ ধারণ করিল এবং তাঁহার মধ্যে সকল দেবদেবী, আধিকারিক ও অবতার পুরুষ (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধ প্রভৃতি দশাবতার), শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, জারাথুষ্ট্র, নানক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি আপনাপন আসন (বেদী) হইতে উঠিয়া পরমহংসদেবের বিরাট শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই অপূর্ব দর্শনের কোন মর্ম বুঝিতে না পারিয়া আমি দ্রুতপদে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পরমহংসদেবকে সকল কথা বর্ণনা করিলাম। পরমহংসদেব শুনিয়া বলিলেনঃ 'তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়েছে। এবার দেবদেবীদর্শনের চরমসীমায় পৌঁছেছিস।'"[১] পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঐ ধ্যানে দিব্যদর্শনকে অবলম্বন করিয়া 'হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং' প্রভৃতি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারস্তোত্র' রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে নির্বিকল্প নিরঞ্জন এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল দেবদেবী, অবতার ও মহাপুরুষগণের সমন্বয়মূর্তি তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

১। 'আমার জীবনকথা' (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা হইতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত), পৃঃ ৪১-৪২

গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের মর্মকথাও তাই, বিশ্বের সমগ্র রূপ, দেবদেবী, প্রাণবান ও নিষ্প্রাণ পুরুষ ও সামগ্রী সমস্তই বিশ্বব্যাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিত। ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' মন্ত্রের তত্ত্বকথাও তাই। বিশ্বরূপিণী মা সারদা ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা ও বিশ্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপের পরিচয় দিয়া তাই বলিয়াছিলেন: "ঠাকুরই সব ; তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।" মন্ত্রদাতা গুরু বা আচার্য ও মন্ত্রাধিষ্ঠিত বা মন্ত্রভাস্য দেবতায় যে ভেদ নাই এই মর্মই মহাসরস্বতীর প্রতিমূর্তি জ্ঞানদায়িনী মা সারদাদেবী শিষ্যকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং শ্রীমা যে সাক্ষাৎ জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী ও মহামায়া—তাহা 'যে-মা নহবতে বাস করেন ও সে মা মন্দিরে ভবতারিণীরূপে বিরাজ করছেন, তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন" এই কথা হইতে প্রমাণ হয়।

শ্রীসারদাদেবী ছিলেন সকলের পাতানো মা নয়, কিন্তু প্রকৃত জননী, তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা শ্রীমার জীবনে বহুবার বহুভাবে প্রত্যক্ষ করি। জনৈক ভক্ত-সন্তান জয়রামবাটীতে গিয়া শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন এবং কয়েকদিন অসুখে ভুগিয়া জয়রামবাটীতেই দেহত্যাগ করেন। শ্রীমা তাহার জন্য শোকাতুরা জননীর ন্যায় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমার সোনার চাঁদ ছেলে একটি চলে গেল। আহা, বাছার আমার শেষ জন্ম।" শোক-তাপের অতীত হইয়াও মায়োত্তীর্ণা মহামায়া সন্তানের শোকে অধীরা হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও দেখি যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার ও মায়ার অধীশ্বর হইয়াও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় যখন মারা যায় তখন তার বিয়োগব্যথায় কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন: "অক্ষয় যখন মোলো, তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম।" তাহারপর কালীবাড়ীর উঠানের সামনের বারাণ্ডার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: "ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি, যেন প্রাণের

ভিতরটায় গামছা যেমন নেংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে। অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি করছে।" স্বীয় গর্ভধারিণী চন্দ্রমণিদেবীর অন্তর্ধানেও শোকাকুল হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গঙ্গায় তর্পণ করিয়াছিলেন, যদিও তিনি ঠিকভাবে সেই তর্পণ করিতে সক্ষম হন নাই। ঈশ্বরীয় লীলারহস্য অনুধাবন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। ভারতের ইতিহাসে এবং পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে ইহার নিদর্শন অল্প নয়। অবতার ও অবতারসংকল্প মহাপুরুষদের জীবনেও সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের খেলা কম হয় নাই; মায়ার সংসারে তাঁহাদিগের জীবনেও শোক-তাপের অভিনয় কম হয় নাই। সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার হইয়াও সীতাদেবীর জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া কম জীবনসংগ্রাম করিতে হয় নাই!

শ্রীমার চরিত্র ছিল সত্যই অদ্ভুত ও অতুলনীয়। তাঁহার চরিত্রের একটি মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি কখনও ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী-সন্তানদের নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেন না। জনৈক ভক্ত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "আমি মা কিনা, তাই সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে।" সন্ন্যাস মানুষের জীবনে একটি শ্রেষ্ঠতম আশ্রম। তাই জননী হইয়াও সন্ন্যাসী-সন্তানদের পবিত্র জীবনব্রতের সম্মান রক্ষা করিতে শ্রীমা সদাসর্বদা চেষ্টা করিতেন। একদিন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ শ্রীমার সঙ্গে নানা কথোপকথনের পর প্রশ্ন করিয়াছিলেনঃ "মা আপনি আমাদের কিভাবে দেখেন?" শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "নারায়ণ ভাবে দেখি।" তাহার উত্তরে বিশ্বেশ্বরা-নন্দজী বলিয়াছিলেনঃ "আমরা আপনার সন্তান, নারায়ণভাবে দেখলে সন্তানভাবে দেখা হয় না।" তাহার উত্তরে শ্রীমা বলিয়া-ছিলেনঃ "নারায়ণ ভাবেও দেখি, সন্তান ভাবেও দেখি।" জীব শিব বা জীব ব্রহ্ম একথা তন্ত্র ও বেদান্ত শিক্ষা দেয়। আমরা শঙ্কর ও শঙ্করমতাবলম্বী অদ্বৈতবেদান্তের আচার্যদিগের ভাষ্যে ও রচনায় এই সিদ্ধান্ত পাই, কিন্তু কথা হইল, শিক্ষার আদর্শকে জীবনে

বাস্তবে পরিণত করা যে কঠিন কাজ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'। মানুষ ঈশ্বর, প্রতিটি প্রাণী ঈশ্বর, বৃক্ষ, লতা, পর্বত, অরণ্য, নদ-নদী ও প্রকৃতির সকল-কিছুই ঈশ্বরের পবিত্র প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই মহান্ সত্যকে জীবনে উপলব্ধি না করিলে শুধুই শাস্ত্রবাক্যের বা মহাপুরুষ-দিগের পবিত্র বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা সকল আদর্শের পূর্ণ-প্রতিফলন লক্ষ্য করি। বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর ভাগবত জীবনেও আমরা শাস্ত্রীয় আদর্শের ও সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন পাই। শ্রীমা বলিয়াছেন, আমি নারায়ণভাবে দেখি এবং আমি নারায়ণভাবে দেখি, সন্তানভাবেও দেখি। সন্তানে নারায়ণ-বুদ্ধি ব্রহ্মানুভূতিরই কথা। ব্রহ্মানুভূতি হইলে পিতা, মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থাকে কিনা ইহার উত্তরে ব্রহ্মবিজ্ঞানীরা বলেন, লবণকে জলে ফেলিলে যেমন গলিয়া জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মানুভূতির পর ব্রহ্মজ্ঞানী দেখেন এক ব্রহ্মচৈতন্যই পিতা, মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল-কিছু হইয়া আছেন। ব্রহ্মচৈতন্যই যখন একমাত্র সত্য, অবিকারী ও নিত্য ও তিনিই নানা বা বিচিত্র হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে থাকেন, তখন উপনিষৎ বলে, নানা রূপবিকৃতির পরিবর্তন আছে বটে, কিন্তু যিনি নানা রূপ ধরিয়াছেন তিনি অপরিবর্তনীয় ও নিত্য। উপনিষদের 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব' কথার মর্মার্থই তাই। উপনিষদের এই তত্ত্ব বা মর্মকথার জ্বলন্ত প্রতিফলন ও দৃষ্টান্ত আমরা এই যুগে দেখি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ও শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীতে।

সত্য সত্যই শ্রীমা সকলের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণপ্রকাশ দর্শন করিতেন, অথচ সকলের দুঃখ ও কষ্টে শ্রীমা বিচলিত ও ব্যথিত হইতেন। সামান্য বলিয়া মনে হইলেও একটি ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করি। একদিন একটি বাছুর অসুস্থ হওয়ায় সে কাতর হইয়া

ডাকিতে লাগিল। তাহার ডাকে শ্রীমা ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বাছুরটিকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহার পেট ও নাভি টিপিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। পশু হইলে কি হইবে, শ্রীমার নিকট সেই বাছুরটি ছিল একান্ত আপন জন। তাহার সুখ-দুঃখ ও অশ্রু-আনন্দকে শ্রীমা নিজের বলিয়া মনে করিতেন। ইহা অপেক্ষা সর্বভূতে নারায়ণ দর্শনের জ্বলন্ত নিদর্শন আর কি হইতে পারে!

শ্রীমার নিকট একটি বিড়াল থাকিত। শ্রীমা তাহার জন্য নিত্য-নিয়মিতভাবে এক পোয়া করিয়া দুগ্ধ রাখিতেন, কেননা দুগ্ধ না হইলে বিড়ালের অনেক অসুবিধা হইত। শ্রীমা বিড়ালটিকে এতই যত্ন করিতেন যে, যদি কেহ বিড়ালকে কোন কারণে মারিত তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইতেন। বিড়ালও শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসা বুঝিতে পারিত। সেইজন্য কেহ লাঠি দিয়া মারিতে যাইলে সে তৎক্ষণাৎ শ্রীমার নিকটে গিয়া আশ্রয় লইত ও শ্রীমার পায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত। শ্রীমা তাহাকে অভয় দিয়া তখন খাইতে দিতেন। শ্রীমা বলিতেনঃ "বিড়ালের স্বভাব চুরি করে খাওয়া। সে তো করবেই ও চুরি করা তো ওদের ধর্ম। তা বাবা, কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে।" দেখা যাইত যে, কতদিন কত সময় বিড়ালের উৎপাতে অন্য অনেকে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু শ্রীমা কোনদিন কখনও এতটুকু বিরক্ত হইতেন না, বরং তিনি মাঝে মাঝে বিড়ালের কার্যকলাপে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন। একদিনের কথা, ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ বিড়ালের উৎপাতের বিরুদ্ধে শ্রীমাকে নানা অভিযোগ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞান মহারাজের অভিযোগগুলি শুনিয়া প্রতিকার করিবেন বলিয়া শ্রীমা আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার আদরের বিড়ালকে জ্ঞান মহারাজ তুলিয়া আছাড় মারিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া শ্রীমার হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে শ্রীমার বাহিরে যাওয়া স্থির হইল। শ্রীমা তখন জ্ঞান মহারাজকে ডাকিয়া

বলিলেন ঃ "জ্ঞান, বেড়ালটির জন্য চাল নেবে। যেন কারো বাড়ী না যায়,—গাল দেবে বাবা।" কিছুক্ষণ পরে পুনরায় শ্রীমা বলিলেন ঃ "দেখ জ্ঞান, বেড়ালটিকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।" 'বিড়ালের মধ্যে আমি আছি' এই কথা শুনিয়া জ্ঞান মহারাজ বিস্মিত হইলেন এবং নিজকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমার চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর দিব্য-আবির্ভাব যে সর্বভূতে জ্ঞান মহারাজ তাহা সেইদিন মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তখন হইতে তিনি আর কোনদিনও বিড়ালের প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করেন নাই। বরং নিজে নিরামিষ খাইলেও প্রতিদিন বিড়ালের জন্য হাট হইতে চুনামাছ কিনিয়া আনিতেন ও মাছ ভাজিয়া ভাতের সহিত মাখিয়া বিড়ালদের খাইতে দিতেন। ভাবিতেন তিনি সাক্ষাৎ জননীরই সেবা করিতেছেন। সেইদিন জ্ঞান মহারাজ "সর্বভূতস্থমাত্মানম্" গীতার এই দিব্যবাণীর মর্ম উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রীমা তাঁহার স্নেহের সন্তানদের নানাভাবে শিক্ষা দিতেন। জ্ঞান মহারাজকে শ্রীমা এভাবেই শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সাধারণ ও লৌকিক উদাহরণ দিয়া শ্রীমা তাঁহার সকল ভক্ত-সন্তানকে বুঝাইয়া দিতেন যে, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ; বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে শ্রীভগবানের পূর্ণ-আবির্ভাব। শ্রীমা সকলকে বলিতেন ঃ "সংসারের সকল কাজ করিবে, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন ফেলিয়া রাখিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, যেমন জাহাজের কম্পাস্ থাকে সর্বদাই দক্ষিণ দিকে ধ্রুবতারার দিকে।" আর একবার শ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ "নৈবেদ্য থেকে পি পড়েটাকে পর্যন্ত তাড়াতে পারিনে, বোধ হয় যেন ঠাকুর খাচ্ছেন।" সর্বানুভূতির বহির্বিকাশ এই রকমই। সর্বভূতে ঈশ্বরানুভূতি হইলে তখন কোন-কিছুকেই ছোট বা বড় বলিয়া জ্ঞান হয় না, তখন সকলই সমান। শ্রীমার এই সমদৃষ্টি বা

সমদর্শনের কথায় মনে পড়ে, ক্ষেত্রীর রাজবাড়ীতে বাঈজীর ভজন-গানের কথা। ভজনগানটি শুনাইয়াছিল বাঈজী স্বামী বিবেকানন্দকে। ভজনগানটি হইল,

প্রভু মেরো অবগুণ চিত ন ধরো।
সমদরশী হৈ নাম তিহারো,
চাহে তো পার করো॥
ইক লোহা পূজা মে রাখত,
ইক রহত ব্যাধ-ঘর পর,
পরশ কে মন দ্বিধা নহী হৈ,
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো॥
ইক নদিয়া ইক নার, কহাবত মৈলী নীর ভয়ো,
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো
সুরসুরি নাম পর;
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম, কহাবত সুরদাস ঝগেরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

ভজনগানটি অন্ধকবি সুরদাসের রচিত। সুরদাস ছিলেন বর্ষার কবি। অন্ধ হইলেও সুরদাস জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য কোথায়। জ্ঞানদৃষ্টি ছাড়া সমদর্শন বা সর্বানুভূতি অসম্ভব। বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন জ্ঞানমূর্তি দেবী সরস্বতী। তাই তাঁহার চক্ষে বিশ্বের সকল-কিছু ছিল ঈশ্বরের মহিমময় প্রকাশ।

একদিন রাসবিহারী মহারাজ শ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: "মা, তুমি কি সকলের মা?" শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন: "হ্যাঁ"। রাসবিহারী মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "এই সব ইতর জীবজন্তুরাও?" শ্রীমা একটু গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন: "হাঁ, ওদেরও"। শ্রীমার মধ্যে সর্বভূতে ঈশ্বরানুভূতির ভাব লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং

সেইদিন হইতে কীভাবে সকল সঙ্কীর্ণতা ও পঙ্কিলতার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় সেই কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি তখন হইতে শ্রীমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি উদার-আচরণ ও ভাব লক্ষ্য করিতেন এবং শ্রীমার নিকট কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেন মহামুক্তির আশীর্বাদ লাভ করিবার জন্য।

সামান্য পশুপক্ষীর উপর শ্রীমার কিরূপ স্নেহ-ভালবাসা ছিল তাহারও দুই একটি কথার এখানে উল্লেখ করি। শ্রীমার বাড়ীতে একটি গঙ্গারাম নামে পোষা চন্দনা-পাখী ছিল। শ্রীমা তাহাকে নিজ হস্তে প্রতিদিন স্নান করাইতেন, জল ও খাবার দিতেন, তাহার খাঁচা পরিষ্কার করিতেন, তাহাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরাইয়া রাখিতেন ও আদর-যত্ন করিয়া তাহার সহিত নানান কথা বলিতেন। তাহা ছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় চন্দনার নিকট আসিয়া শ্রীমা বলিতেন: "বাবা গঙ্গারাম, পড়তো।" অমনি গঙ্গারাম শ্রীমার দিকে তাকাইয়া পড়িত: "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম রাম।" চন্দনার মুখে রাম নাম ও কৃষ্ণ নাম শুনিয়া শ্রীমা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন। তাহা ছাড়া শ্রীমার মুখে শুনিয়া সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের নামগুলিও চন্দনা বেশ শিখিয়া ফেলিয়াছিল। মাঝে মাঝে গঙ্গারাম আবার বলিত: "মা, ওমা।" ঐ সময় শ্রীমাও 'যাই বাবা, যাই' বলিয়া চন্দনাকে আদর করিয়া ছোলা ও জল দিয়া আসিতেন। শ্রীমা বুঝিতেন, পাখীর 'মা' বলিয়া ডাকার অর্থই তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। সেইজন্য বলি, শ্রীমার প্রাণ যেমন তাঁহার স্নেহের ভক্ত-সন্তানদিগের জন্য কাঁদিত, তেমনি কাঁদিত তাঁহার আদরের পোষা বাছুর, বিড়াল ও পাখীর জন্য। তাহার পর সন্তানরাই যে কেবল তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন ও তাঁহার স্নেহ ও করুণা লাভ করিতেন তাহা নহে, পশুপক্ষীরাও 'মা' বলিয়া ডাকিত এবং শ্রীমার অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা লাভ করিয়া ধন্য হইত। এমনই ছিলেন বিশ্বরূপিণী মা সারদা! অবলা পশুপক্ষীরাও ব্যথায়, ক্ষুধায় ও ভয়ে

করুণাময়ী শ্রীমাকে ডাকিয়া স্বস্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিত এবং শ্রীমার আদরের স্পর্শ পাইয়া তাহারা মনে শান্তি পাইত।

সমাগত ভক্ত-সন্তানদিগের তত্ত্বাবধানের ভারও শ্রীমা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেন। বলিতেনঃ "ওরা আমার ছেলেমেয়ে, ওদের আমি না দেখলে দেখবে কে।" প্রাতঃকাল হইতে রাত পর্যন্ত শ্রীমার তাই কর্মের আর অন্ত ছিল না। সকালে তরকারি কাটা, ভাঁড়ার বাহির করা, পূজার আয়োজন করা ও স্বহস্তে পূজা করা। তাহার পর পূজার প্রসাদ বাঁটিয়া দেওয়া ও প্রতিদিন প্রায় ভক্ত-সন্তান-দিগের জন্য একশো খিলি পান সাজা—এইসব কাজ তো ছিলই। তাহা ছাড়া বৈকালে নিজ হস্তে আটা-ময়দা মাখিয়া রুটি-লুচি তৈয়ারী করা, দুধ জ্বাল দেওয়া ও লণ্ঠনাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতি কর্মগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন শ্রীমা প্রীতির সহিত করিতেন। কোনদিন এতটুকু বিরক্তির ভাব তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত না। তিনি নিজে যেমন কাজ করিতেন, ঠিক তেমনি ভাবে অন্যেকেও কাজ করিতে শিক্ষা দিতেন এবং কাজ করাইয়াও লইতেন। একদিন স্বামী শান্তানন্দকে শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজন করবে। কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। বরং একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।" এই রকম কত কথাই না শ্রীমা কত লোকের সহিত বলিতেন। শ্রীমার উপদেশ দিবার রীতিই ছিল নূতন ধরণের এবং উপদেশদানেরও অন্ত ছিল না।

একবার কয়েকজন সাধু তপস্যায় যাইবেন। শ্রীমার সেবক কিশোরী মহারাজও সেই কয়েকজনের মধ্যে ছিলেন। কিশোরী মহারাজ ভরসা করিয়া শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ "এই কর্মের মধ্যে থাকা যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। আমিও তপস্যা করতে যাব। মা, আপনি অনুমতি দিন।" শ্রীমা কিশোরী মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া ও একটু হাসিয়া

বলিলেনঃ "সে কি গো, আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, এ কি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে? হাঁওয়া গুণ্‌তে কোথায় যাবে?" এখানে 'হাওয়া গুণা' অর্থে শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা-রূপ প্রত্যক্ষ সাধনা ও মঠ-আশ্রমের কর্ম-রূপ উপাসনা ছাড়িয়া বাহিরে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ানোকে বুঝাইতেছেন। তীব্র বিবেক-বৈরাগ্য না থাকিলে বাহিরে এখানে সেখানে তপস্যা ও জপ-ধ্যান কীভাবে ও কতটুকু হয় শ্রীমা তাহা ভালভাবে জানিতেন। মঠ ও আশ্রমের কর্ম ফেলিয়া বনে-জঙ্গলে বা অন্যত্র আশ্রমে-কুঠিয়ায় থাকিয়া ছত্রে ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাপন করা শ্রীশ্রীঠাকুরও পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, যাহার ত্যাগ-বৈরাগ্য আছে ও তীব্র তিতিক্ষা আছে, তাহার এখানেই (শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠে-আশ্রমেই) হইবে, অন্যত্র কোথাও যাইতে হইবে না। 'যেই মন লইয়া অন্যত্র তপস্যায় যাইবে সেই মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া শ্রীভগবানের চরণে দিতে পারিলেই তপস্যা হইবে' এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরাও বলিতেন। শ্রীমার মনোভাব ও বিচার-দৃষ্টি এই ধরণেরই ছিল। শ্রীমা তাই কিশোরী মহারাজকে উপলক্ষ্য করিয়া 'হাওয়া গুণা'-র কথা বলিলেন। বলিলেনঃ "যার এখানে আছে, তার সেখানে আছে।" মঠে ও আশ্রমে থাকিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধচিত্তে বা নির্মল বৃত্তিহীন একমুখী মনে শ্রীভগবানের পূর্ণপ্রকাশ ও মহিমা উপলব্ধি হইবে। শ্রীমার কথা ও অন্তরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কিশোরী মহারাজ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা অন্যত্র যাইয়া তপস্যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীমা তাঁহাদিগের শুভবুদ্ধি দেখিয়া তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

করুণাময়ী শ্রীমার দৃষ্টি ছিল সকল দিকে ও সকল বিষয়ে প্রসারিত। ভক্ত-সন্তানদিগের অধ্যাত্মসাধনা, ঈশ্বরলাভ, জপ-ধ্যান প্রভৃতির কথাও যেমন তিনি ভাবিতেন, তেমনি ভাবিতেন সকলের সাংসারিক দুঃখ-দৈন্য ও অভাব-অনটনের কথা। সংসার তো শ্রীমার

চক্ষে আমাদের মতো অজ্ঞানের বা মায়ার সংসার ছিল না, শ্রীমা ভাবিতেন সংসারে শ্রীভগবানেরই পুণ্যপ্রকাশ। তাই আমাদের চক্ষে সংসারের যে সকল কর্ম ও ঘটনা তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, শ্রীমার চক্ষে সেগুলি ছিল পালনীয় বস্তু, উপেক্ষার বস্তু নয়। যেমন কোঠারে এক ভক্ত শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ একখানি কাপড় ও টাকা দিয়াছিলেন। ভক্তটির সাংসারিক অবস্থা যে মোটেই সচ্ছল ছিল না শ্রীমা তাহা ভালভাবে জানিতেন। সেজন্য ভক্ত যখন কাপড় ও টাকা দিয়া প্রণাম করিল তখন শ্রীমা তাহাকে বলিয়াছিলেন: "তোমার টানাটানি—অভাব, আবার টাকা কেন?" ভক্ত বলিয়াছিল: "এ' টাকা মায়েরই। পুত্রের অর্জিত অর্থ যদি কিছু মায়ের সেবায় লাগে তবেই পুত্র ধন্য ও আনন্দিত হয়।" শ্রীমা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিয়াছিলেন: "আহা, কি টান গো, কি টান!"

আর একদিনের কথা। ভক্ত অপরের মুখে শুনিয়াছিল যে, শ্রীমা সাক্ষাৎ কালী, আদ্যাশক্তি ও মা ভগবতী। তাহার অন্তরের ইচ্ছা যে, শ্রীমা ঐকথা নিজে তাহার নিকট বলেন। সুতরাং সে একদিন শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: "মা, তোমার কথা যা শুনেছি, তা আমি বিশ্বাস করি। তবে তুমি স্বয়ং যদি সে কথা বল, তাহলে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তোমার নিজের মুখে শুনতে চাই, ওকথা সত্য কিনা।" ভক্তের কথায় শ্রীমা দ্বিধাবোধ না করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন: "হ্যাঁ সত্য"। শ্রীমা এমনিই দৃঢ় ও গম্ভীভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, যেন সেই কথা ত্রিকালসত্য। শ্রীশ্রীঠাকুর 'এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ' প্রভৃতি বলিয়া বহুবারই শ্রীশ্রীভবতারিণীর চরণে সকল-কিছু সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'এই নাও তোমার মিথ্যা, এই নাও তোমার সত্য' বলিয়া সত্যকে কোনদিনই বিসর্জন দিতে পারেন নাই, কেননা যাহা সৎ বা সত্য তাহা চিরকালই সৎ এবং তাহা

বিশ্বচরাচরের কারণ ও আধার, সুতরাং বিশ্বের অধিষ্ঠান ও স্বরূপ সৎ বা সত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর চিরদিনই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবীর জীবনেও আমরা দেখি, তিনি সত্যস্বরূপ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই জীবনে সকল কর্ম করিতেন। তাই 'হ্যাঁ সত্য' তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণীর মধ্যে ত্রিকালসাক্ষী সনাতন সত্যব্রহ্মের উপর নির্ভরতার ভাব ও মর্ম প্রকাশ করে।

জয়রামবাটীতে একদিন এক ভক্ত আসিয়া শ্রীমার নিকট দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, এত দেখিয়া শুনিয়াও সে শ্রীমাকে আপনার 'মা' বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। সে হতভাগ্য ও অধম। তাহার গতি কি হইবে! ভক্তের মর্মবেদনা শ্রীমা অনুভব করিলেন এবং সান্ত্বনা দিয়া হাসিয়া বলিলেনঃ "বাবা, আপনার না হলে এত আসবে কেন? 'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার'। আপন মা, সময়ে চিনবে।" শ্রীমার স্বভাবই ছিল নিজেকে ঢাকিয়া রাখা। কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ আলোকের জ্যোতির্ময় দীপ্তিকে কতক্ষণ অন্নর আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায়। তাই চিরনিরাভরণা মা নিজেকে প্রকাশ না করিলেও কোন-না-কোন সময় তাঁহার দিব্যভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত।

বিশ্বরূপিণী মা সারদার স্বভাবের রীতিই ছিল, অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর সুন্দর উপমার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনার গভীর রহস্যসকল ভক্ত-সন্তানদের বুঝাইয়া দেওয়া। সন্তানগণের স্বভাব বা প্রকৃতি বুঝিয়া তিনি কখনও জ্ঞানের, কখনও ভক্তির, কখনও কর্মের আদর্শের কথা বলিতেন। তবে ঈশ্বরের কৃপার কথা তিনি অনেক প্রসঙ্গে অনেককে বলিতেন। বলিতেনঃ "ঈশ্বরলাভও তাঁর (ঈশ্বরের) কৃপাতেই হয়। তবে ধ্যান-জপ করতে হয়, তাতে মনের ময়লা কাটে। যেমন নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে গন্ধ বের হয়। তবে নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষণি হয়।" ভক্তদিগের মধ্যে কোন সাংসারিক সমস্যা দেখা দিলে বা কোন মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইলে

শ্রীমা তাহারও সমাধানের চেষ্টা করিতেন। ইহা ঈশ্বর-বিষয়ক ও উহা সংসার-বিষয়ক এই বলিয়া একটি শ্রেষ্ঠ ও অপরটি নিকৃষ্ট এই বুদ্ধি শ্রীমার মধ্যে ছিল না। সকল দিক দিয়া কল্যাণী শ্রীমা তাঁহার সন্তানদিগের জীবনে যথার্থ কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। একবার দুইজন ভক্তের মধ্যে কোন একটি বিষয় লইয়া বেশ-কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীমা তাহা জানিতে পারিয়া দুইজনকেই একত্রে ডাকাইয়া আনিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিয়াছিলেন: "সময়ে সবই সহ্য করতে হয়। সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়।" শ্রীমার কথায় ভক্ত দুইজন অনুতপ্ত হইয়া তাহাদিগের কর্মের জন্য শ্রীমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং দুইজনে পরস্পরে ভালবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সকল দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান করিয়াছিলেন।

আবার অনেক ভক্ত শ্রীমার নিকট আসিয়া অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার (শ্রীমার) ন্যায় গুরু লাভ করিয়াও তাঁহাদের জীবনে কিছু হইল না। 'গুরু পাইয়াও জীবনে কিছু হইল না বা হইতেছে না' এইরূপ নিরাশা ও নিরুৎসাহের কথা কাহারও নিকট শুনিলে শ্রীমা অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইতেন। তিনি ঐ ধরণের কথা শুনিয়া বলিতেন, তাহা হইলে তো সকলই মিথ্যা হইয়া যাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর (নিজের কথা আর বলিতেন না) তো চিরদিনই সত্য। আকাশে দেদীপ্যমান সূর্যের মতো শ্রীশ্রীঠাকুর চিরদিনই শাশ্বত। সুতরাং তাঁহার নিকট আসিলে জীবনে কিছু হইবে না এই কথা চিন্তা করিতে বা মুখে আনিতে নাই। 'হইবে' বা 'নিশ্চয়ই হইবে' এই কথাই দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস ও পুনঃপুনঃ মুখে উচ্চারণ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন: "যে এখানে (শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট) আসিবে, তার শেষজন্ম।" শ্রীমা বলিতেন, সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর এই যুগের কাণ্ডারী। সকলকে সংসার-সাগর

হইতে করুণায় পার করিবার জন্যই তো তিনি এই যুগে আসিয়াছেন। তাই কিছুই জীবনে হইল না এইরূপ নিরাশার কথা কাহারও নিকট শুনিলে শ্রীমা তাহাকে স্নেহপূর্ণ বাক্যে আশ্বাস দিয়া বলিতেন: "আমার যা করে দেবার, আমি সেই এক সময় (দীক্ষাকালে) করে দিয়েছি। তবে যদি সত্ত শান্তি পেতে চাও, সাধন-ভজন কর, নতুবা দেহান্তে হবে।" অথবা বলিতেন: "বিশ্বাস কর, জীবনে নিশ্চয়ই শান্তি ও মুক্তি পাবে।" পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের কৃপালাভের কথা শ্রীমা প্রায়ই সকলকে বলিতেন। তবে কৃপালাভ ও কৃপাবস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা তাহা বুঝাইতে গিয়া শ্রীমা একজন ভক্তকে একদিন বলিয়াছিলেন: "বাবা, তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ যদি সেই খাটখানাসমেত তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙ্গতেই কি বুঝতে পারবে যে, স্থানান্তর হয়েছে, না, যখন বেশ পরিষ্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে অন্যত্র এসেছ?" এইভাবে শ্রীমা সহজ সরল কথায় ও উপমা দিয়া বহু কঠিন ও জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া দিতেন। শাস্ত্রের তর্কজাল যেন তখন অসার ও আলুনি হইয়া যাইত। তাহাছাড়া শ্রীমার স্নেহপূর্ণ সরল ব্যবহার ও অমৃতময়ী বাণী এতই সান্ত্বনাদায়ী, শান্তিপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ছিল যে, ভগিনী নিবেদিতার মতো বিদুষী ও বিচারশীল পাশ্চাত্য মহিলাও এক সময় লিখিয়াছিলেন: 'শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে যে জ্ঞান ও মাধুর্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা হয়তো অতি সরল স্ত্রীলোকের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব। কিন্তু তবুও আমার দৃষ্টিতে তাঁহার (শ্রীমার) পবিত্রতা যেমন চমকপ্রদ ছিল, তেমনি অপূর্ব ছিল তাঁহার সমার্জিত সৌজন্য এবং অপরের ভাব বুঝিবার মত তাঁহার পরম-উদার মন। তাঁহার (শ্রীমার) নিকট উত্থাপিত প্রশ্নগুলি যতই কঠিন বা অভিনব হউক না কেন, আমি তাঁহাকে কখনও উত্তরদানকালে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই।' সত্যই শ্রীমার অগোচরে সমাজে যে সকল

বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা ঘটিত, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত বা বিপর্যস্ত হইয়া যদি কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তবে অভ্রান্ত-দৃষ্টিতে তিনি সকল সমস্যার মর্মোদঘাটন করিয়া প্রশ্নকর্তার মনকে সেই বিপদ কাটাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও প্রতিভার অধিকারিণী নিবেদিতা শ্রীমার অভয়া ও জ্ঞানদায়িণী মহিমময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একদিকে শ্রীমার জীবনে গম্ভীর পরিবেশের যেমন সমাবেশ ছিল, তেমনি অন্যদিকে ছিল সহজ-সরল ও সরস প্রকৃতির বিকাশ। তবে এই দ্বন্দ্ব-সমাবেশের মধ্যেও বেশ একটি মিলন বা ঐক্যের ভাব ছিল। রঙ্গরসের বিকাশও তাঁহার মধ্যে কম ছিল না। নিবেদিতা-সম্পর্কে একদিনের এক ঘটনার কথা বলি। ভগিনী নিবেদিতা ও কৃস্টীন একদিন শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় নিবেদিতা কয়েকটি বাংলা কথা শিখিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ধীরে ও সন্তর্পণে বাংলাভাষাতেই তিনি বলিলেন : "মাতৃদেবী, আপনি হন আমাদিগের কালী।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমা একগাল হাসিয়া বলিলেন : "না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।" শ্রীমার ঐ কথাগুলি জনৈক ভক্ত ইংরাজীতে নিবেদিতা ও কৃস্টীনকে তর্জমা করিয়া বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা হাসিতে হাসিতে বলিলেন : "মাকে অত কষ্ট করতে হবে না, আমরাই তাঁকে জননীরূপে দেখব। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব।" 'শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব' এই কথা শুনিয়া শ্রীমা বেশ একটু গম্ভীর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন : "তা না হয় দেখা যাবে।" এই কথা বলিয়া প্রসন্নময়ী শ্রীমা পুনরায় মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। অবশ্য এইটি বড় একটি কৌতুক বা রঙ্গরসের কথাবার্তা না হইলেও শ্রীমা তাঁহাদিগের কথায় বেশ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এইরূপ ছোটখাট কৌতুক ও পরিহাস অনেকের

সহিত অনেক সময়ই শ্রীমা করিয়াছেন ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তাহাছাড়া তিনি নিবেদিতা, কৃষ্টীন প্রভৃতির সহিত এতই আপনার হইয়া মিশিতেন, মনে হইত না যে তাঁহারা বিদেশের অধিবাসিনী। অবশ্য শ্রীমা স্ত্রী-পুরুষ সকলের সহিত এমনই আপনভোলা হইয়া সরল ব্যবহার করিতেন যে, কেহ কোনদিন কখনও মনে করিত না যে, তিনি বা তাঁহারা শ্রীমার অপরিচিত, বরং মনে করিত শ্রীমা তাহার বা তাহাদিগের আপন গর্ভধারিণী জননী। আসলে শ্রীমার নিকট যাইলে সকলের অন্তর হইতে আপন-পর ভাব দূর হইয়া যাইত। তাহাছাড়া শ্রীমার জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ছিল কাহাকেও তিনি কোনদিন পর বলিয়া বা সামান্য বলিয়া দেখিতেন না। তাহার পর দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাট সকল ঘটনা ও বিষয়ের প্রতি শ্রীমার বিশেষ দৃষ্টি থাকিতই। কোন জিনিষ অযথা অপচয় হয় তাহাও শ্রীমা সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার জয়রামবাটীতে শ্রীমার নিকট একজন স্ত্রীলোক গৃহকর্মের জন্য কিছুদিন নিযুক্ত ছিল। একদিন স্ত্রীলোকটি ঘর ঝাঁট দিবার পর ঝাঁটাটি ছুড়িয়া একদিকে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহা দেখিয়া শ্রীমা তাহাকে ডাকিয়া আদর করিয়া বলিলেনঃ "ঝাঁটাটিকেও সম্মান দিতে হয় মা। সামান্য কাজও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয় ; ছোট জিনিষ বলে তুচ্ছ করতে নেই।"

এই প্রসঙ্গে আর একদিনের কথা মনে পড়ে। শ্রীমা তখন কলিকাতায় বাগবাজারে। একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীর চাকর চুপড়িতে করিয়া কিছু আতা আনিয়া ঠাকুর-ঘরে রাখিয়া গেল। চাকরটি নীচে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপড়িটি কি হইবে? নীচের তলায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বলিলেনঃ "ও আর কি হবে, রাস্তায় ফেলে দেব।" শ্রীমা উপর হইতে তাঁহাদিগের কথা শুনিতে পাইয়া বারান্দায় গিয়া দেখিলেন সত্যই চুপড়িটি রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চুপড়িটি দেখিতে সুন্দর ও তাহা অনেক কাজে লাগিতে পারে দেখিয়া শ্রীমা রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনাইয়া ধুইয়া

একটি স্থানে রাখিয়া দিলেন। শ্রীমার কর্ম সকলেই সেইদিন লক্ষ্য করিলেন এবং মর্মে মর্মে শিক্ষা লাভ করিলেন যে, যে কোন জিনিস যতই তুচ্ছ হউক না কেন, তাহাকে অবহেলা করিতে নাই।

শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। একদিন একজন ভক্ত সুদূর বদনগঞ্জ হইতে হাঁটিয়া জয়রামবাটী আসিয়াছেন। ভক্তের অসীম ধৈর্য, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীমা মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভক্তটি কয়েকদিন শ্রীমার সহিত জয়রামবাটীতে অতিবাহিত করিল। শ্রীমা নিজে তাঁহার যত্ন করিতেন ও কোন-কিছু ভাল রান্না করিলে তিনি তাহার জন্য তুলিয়া রাখিতেন। একদিন শনিবার জয়রামবাটীরই একজন স্ত্রীলোক-ভক্ত খিচুড়ি রাধিয়া শ্রীমার জন্য আনয়ন করিয়াছিল ও তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমা নিজে তাহা গ্রহণ করেন। অন্তর্যামিনী শ্রীমা স্ত্রীভক্তের মনের ইচ্ছা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য খিচুড়ির কিছু অংশ নিজে গ্রহণ করিয়া পরে বদনগঞ্জ হইতে আগত ভক্তটিকে প্রসাদ খাইতে দিলেন। ভক্তটি পরিমাণমত খাইয়া খিচুড়ির বাকী অংশ ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীমা বাধা দিয়া বলিলেনঃ "ও কি বাবা, এমন ভাল জিনিস ফেলো না। কোন জিনিস অপচয় করতে নেই।" তিনি পাশের বাড়ী হইতে একটি মেয়েকে ডাকিয়া আনিয়া সেই অবশিষ্ট খিচুড়িপ্রসাদ তাহাকে দিতে বলিলেন। ভক্ত নিজের ভুল বুঝিয়া শ্রীমার আদেশমতো পাশের বাড়ী হইতে একটি মেয়েকে ডাকিয়া আনিয়া খিচুড়িপ্রসাদ দিল এবং মেয়েটিও অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা লইয়া গেল দেখিয়া শ্রীমা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। তাহার পর তিনি ভক্তকে বলিলেনঃ "দেখ বাবা, যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষ খায়, তা গরুকে দিতে নেই; যা গরুতে খায় তা কুকুরকে দিতে নেই। গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছ খায়,—তবু নষ্ট করতে নেই।" ভক্ত জীবনে শিক্ষা লাভ করিল যে, 'কিছুই ফেলিতে নাই,' কেননা তাহাতে কাহার-না-কাহারও উপকার

হয়। শ্রীমার শিক্ষাদানের রীতি এই ধরণের ছিল। সংসারের সকল মায়ার ঊর্ধ্বে থাকিয়াও সংসারের নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট সকল জিনিসের উপর শ্রীমার সজাগ দৃষ্টি থাকিত। তরকারী কাটা হইলে তাহার খোলাগুলি পর্যন্ত ফেলিয়া না দিয়া সেইগুলি তিনি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেন, কেননা গরুতে সেইগুলি খাইবে। পাতের ভাত বেশী হইলে শ্রীমা পশুপক্ষীদের ডাকিয়া আদর করিয়া দিতেন। স্নেহময়ী শ্রীমার এমনই ছিল সকলের জন্য স্নেহ ও ভালবাসা। শ্রীমার সেই অসংসারী হইয়া সংসারীর ন্যায় আচরণ দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞানবরিষ্ঠ জনক রাজার কথা মনে পড়ে। জনক রাজা সংসার ও অসংসাররূপ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ এদিক ও ওদিক দুইদিক রাখিয়া প্রজাপালন করিতেন। শ্রীমার জীবনেও দেখি যে, কখনও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি সংসারের সকল কর্ম ভুলিয়া যাইতেন, আবার কখনও কখনও সংসারের তুচ্ছ কর্মে লিপ্ত থাকিয়া সকল কর্তব্য ভুলিয়াও যাইতেন। তাহা হইলেও ব্রহ্মময়ী শ্রীমার মন কিন্তু তন্ময় হইয়া থাকিত সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাবে। একটি হস্ত ঈশ্বরে ও অপর হস্ত সংসারে রাখিয়া শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শই সকলকে শিক্ষা দিতেন।

একদিন একজন ভক্ত শ্রীমাকে ধরিয়া বসিলেন: "মা, তুমি কে বল। তুমি কি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী?"। শ্রীমা বলিলেন: "হবেও বা"। তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীমা তাহাকে বলিলেন: "ওরা বলে ভক্তিতে। আমি কি মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—আমার আমিত্ব যেন না আসে।" ক্রমে শ্রীমার মধ্যে যেন একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া একজন স্ত্রীভক্ত বিনীতভাবে বলিল: "অনেকেই তো মাকে জগদম্বা বলে, কিন্তু কার কত বিশ্বাস তা ঠাকুরই জানেন। অবিশ্বাসী আমাদের মুখে এই কথা যেন নিতান্ত মুখস্ত করা কথার মত শোনায়।" শ্রীমা ততক্ষণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন: "তা ঠিক মা"। মহিলাটি আবার বলিল: "শ্রীমা দয়া করে নিজ স্বরূপ

বুঝিয়ে না দিলে অপরের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব এখানেই যে, মায়ের ভিতর আদৌ অহঙ্কার নেই। জীবমাত্রেই অহং-এ ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা' বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহঙ্কারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি।" শ্রীমা ছোট একটি সরলা বালিকার মত সেই কথা শুনিতেছেন, যেন আর কাহারও প্রসঙ্গে সেই কথা হইতেছে। মহিলাটি শ্রীমার সরল ভাব দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, সত্যই জগজ্জননী মহামায়া দয়া করিয়া নিজেকে না বুঝাইয়া দিলে তাঁহাকে কাহারও বুঝিবার ধরিবার সাধ্য নাই। একটি গানে আছে,

মা ক্যামন তা কেউ জানে না।
নানা লোকে বলছে নানা॥

সত্যই বিশ্বকারণের স্বরূপ-সম্বন্ধে নানান শাস্ত্রে নানান সিদ্ধান্ত করা হয়, কিন্তু তিনি নিজে ধরা না দিলে কেহই তাঁহার সত্যকার স্বরূপ ধরিতে বা বুঝিতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুরও এই কথাই বলিতেন। তিনি বলিতেন, মন পরিশুদ্ধ না হইলে বিশ্বকারণ বা বিশ্বজননীর কৃপা লাভ করা দুর্লভ।

শ্রীভগবান যুগে যুগে মানুষের বেশেই পৃথিবীতে লীলার জন্য আসেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহা সহজে বুঝিতে বা ধরিতে পারে না। সত্যযুগে শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও পরে ভগবান তথাগত বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তরঙ্গ ভক্তেরাই বা কয়জন তাঁহাদিগকে ঠিক ঠিকভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভগবান যীশুখ্রীষ্টকেও তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য বুঝিতে পারেন নাই। বর্তমান যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার মুষ্টিমেয় কয়েকজন অন্তরঙ্গপার্ষদ এবং গিরিশবাবুপ্রমুখ কয়েকজন ভক্ত-শিষ্য ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে অবতার বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। গীতায়, নারদপঞ্চরাত্র, পুরাণ ও

অন্যান্য শাস্ত্রে আমরা মনুষ্যবেশে ঈশ্বরাবতারের অবতরণের কথা পড়ি ও জানি। শ্রীমদ্ভাগবতে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে পূর্ণ ও অংশরূপে ঈশ্বরের অবতরণের কথা আলোচিত হইয়াছে। ভাগবতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ-অবতার বলা হইয়াছে। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্ণ-অবতার, কেননা তিনি নিজেই বলিয়াছেন: "এবার ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য-পরিভ্রমণ।" ঈশ্বরাবতারের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: "খোলো রাম, খোলো খোলো কৃষ্ণ"; অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে অসংখ্য অবতারের সৃষ্টি যুগে যুগে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন অবতারত্বের ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছিলেন: "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে শ্রীসারদাদেবী তাঁহার লীলাসঙ্গিনী বা দিব্যলীলার সহচারিণী। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার স্বরূপের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন: "ও সরস্বতী। এবার নিজের রূপ ঢেকে সকলকে জ্ঞান দিতে এসেছে।" সত্যই বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন জ্ঞানদাত্রী ও জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। শুধুই জ্ঞান নয়, ভক্তিরও তিনি ছিলেন প্রতিমূর্তি। সাধারণ মানুষের বেশে তিনি আসিয়াছিলেন সুখ-দুঃখের সংসারে, কিন্তু সংসারের কোন মালিন্য কোনদিন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি সকল-কিছুর উর্ধ্বে, অথচ ছিলেন সকল-কিছুর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মহামায়ার সংসারে কাহারও পরিত্রাণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হইয়াও ব্যাধের বিষাক্ত বাণে শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বরাবতার হইয়াও সতীদেবীর জন্য কতই না দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছিলেন। সংসারবন্ধনের উর্ধ্বে থাকিয়াও সংসারের অসংখ্য বেদনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে সে অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী হইয়াও শ্রীসারদাদেবীকে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত কম সহ্য করিতে হয় নাই। রাম-অবতারে সাধ্বীসতী

সীতাদেবী, বুদ্ধ-অবতারে গোপাদেবী, চৈতন্য-অবতারে বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর জীবনেও দুঃখ-নিরাশার অন্ত ছিল না। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীচৈতন্যলীলাসহায়িকা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মাধুর্যময় জীবনের কিছু কিছু ঘটনার তুলনা করিলে মনে হয় অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মুসলমানশাসনের ফলশ্রুতিরূপে যখন নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুধর্ম বেশ বিপন্ন হইয়াছিল এবং দলে দলে হিন্দুরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছিল, তখনই যুগসংস্কারক শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) বাঙলাদেশে আবির্ভূত হইয়া যেমন অসাধারণ ত্যাগ-তপস্যা ও জীবে প্রেম ও করুণার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির সম্মুখে স্বধর্মনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনি ঊনবিংশ শতকে একদিকে ইংরাজীশিক্ষার প্রভাব ও অপরদিকে ক্রিশ্চান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণের অপপ্রচেষ্টা যখন সমগ্র বাঙলাদেশে হিন্দুধর্মের আদর্শকে বিপন্ন করিয়াছিল, তখনই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব এই বিশ্বে হইয়াছিল। পঞ্চদশ ও ঊনবিংশ এই পাঁচশত বৎসরকালের আদি ও অন্তভাগে দুইজন অবতারের আবির্ভাব বাঙলাদেশের ধর্মজীবনে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ শক্তিসাধনার দেশ। এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, সাধক রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ এবং আরও কত শত শক্তিসাধক। ভগবান শ্রীচৈতন্য ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সশক্তিক আগমন করিয়াছিলেন বাঙলাদেশে, যদিও শ্রীচৈতন্যদেব ত্যাগ করিয়াছিলেন সংসার ও সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁহার অপার্থিব লীলাকর্ম সাধনার জন্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বদা আপন পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবীকে তাঁহার লীলাসঙ্গিনীরূপে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁহার লীলার পূর্ণ-সহচারিণীরূপে গ্রহণ না করিলেও বিষ্ণুপ্রিয়ার ত্যাগ-তপস্যা ও তাঁহার জীবনের

আরাধ্য দেবতার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-ব্রতকে সার্থক করিয়াছিল। যাহাহউক শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই অবতারপুরুষের শুভাবির্ভাব হইয়াছিল পর পর এই বাঙলাদেশেরই বুকে, সেইজন্য তাঁহাদিগের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লীলাসহচারিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীসারদাদেবীর জীবনের দুই একটি ঘটনার তুলনামূলকভাবে এখানে আলোচনা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচরী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন লজ্জাপটাবৃতা, গোপনস্বভাবা অথচ সর্বসন্তানস্নেহপরায়ণা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সকল-কিছু অপার্থিব ভাব ও মাধুর্যই প্রতিফলিত হইয়াছিল শ্রীসারদাদেবীর পুণ্যজীবনে। তাই প্রতিটি চিন্তায়, আচরণে ও কর্মে আমরা বিশ্বরূপিণী মা সারদার জীবনে দেখি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলারই পূর্ণপ্রতিচ্ছবি। শ্রীসারদাদেবী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলামাধুর্যময় জীবনেরই পরিপূরক।

শ্রীচৈতন্যসহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবনেও দেখি ঐ একই ধরণের প্রকাশ। শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবত সংসারবন্ধনের দিক হইতে তাঁহারই সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সমগ্র জীবনই ছিল পতিগতপ্রাণ। যেইদিন হইতে গৃহত্যাগ করিলেন তাঁহার আরাধ্য-দেবতা, সেইদিন হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন কঠোর ব্রহ্মচারিণী, সংসার-আশ্রমে একাকিনী তপস্বিনী এবং তখন হইতে তাঁহার জীবনের ব্রতই হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণ, মনন ও লীলাকীর্তন করা ও তাঁহার আরাধ্য-দেবতার আদর্শকে অনুসরণ করা ও জীবনে তাহা প্রতিফলিত করা। শ্রীসারদাদেবীর জীবনেও দেখি ঠিক একই ব্রত ও আদর্শের পূর্ণপ্রতিচ্ছবি।

বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর জীবনস্মৃতির পুনরালোচনা করার পূর্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা এখানে সমীচীন মনে করি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বাড়ীর চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত ছিল। দুইজন অনুগত সেবক বংশীবদন ও দামোদর পণ্ডিতের

তিনি সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। কাঞ্চনা নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যাও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিকা ছিলেন। প্রাতঃস্নানের পর বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী স্বয়ং ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত ভজন করিতেন। অপরাহ্ণে দেবীর কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। মাতৃগতপ্রাণ গদাধর দাস মাতৃস্নেহ লাভ করিয়া মিশ্রভবনের সন্নিকটে কুঠিয়াতেই বাস করিতেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপাপ্রার্থী হইয়া গদাধর দাসের ন্যায় আরও অনেক ভক্ত মিশ্রভবনের সম্মুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইভাবে নবদ্বীপে মিশ্রভবনের সন্নিকটে কুঠিয়া বৃদ্ধি পাইয়া উহা একটি তপস্বী সাধুমণ্ডলীর ছাউনীতে পরিণত হইয়াছিল। দূর-দূরান্ত হইতে ভক্তগণ দিনান্তে আসিয়া একবার পরমারাধ্যা জননীর চরণযুগল বন্দনা করিতেন। এতদিন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অতি সঙ্গোপনে মহাদেবী যে আরাধ্য-দেবতার পূজা করিতেছিলেন এক্ষণে বাহিরে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্ত ও শরণাগত সকলের জন্য শান্তি ও সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল করিয়া দিলেন। দেবীর জীবনের ব্রত সমাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর একদিন তিনি গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করিয়া একা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। বহুক্ষণ পরে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখা গেল যে, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসমাধিমগ্না। ভক্তগণ বুঝিলেন পতিপরায়ণা তাঁহার পরম-প্রিয়তমের সহিত চিরমিলিত হইয়াছেন। তখন হইতে নবদ্বীপের নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ একাধারে বিষ্ণুপ্রিয়া ও বিশ্বম্ভরবিগ্রহে পরিণত হইয়াছিল।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার অসংখ্য জীবনঘটনার সহিত শ্রীসারদাদেবীর জীবনচরিত্রের বহু ঘটনারই সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শ্রীসারদাদেবীর সেই জীবনঘটনার কথাই পুনরায় আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীসারদাদেবী বেশীর ভাগ সময় আপনার ঘরে আপনার মতো থাকিতেন এবং ভক্ত-সন্তানগণ প্রথম প্রথম তাঁহার ঘরের চৌকাঠে

তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। পরে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইয়াছিল। ক্রমে ভক্ত-সন্তানরা শ্রীমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি লাভ করিলেন এবং তখন তাঁহারা শ্রীমার নিকটেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেন। শ্রীমা কিন্তু সর্বদাই অবগুণ্ঠিতা ও সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃতা হইয়া বসিয়া থাকিতেন। পরে কখনও কখনও শ্রীমা কাহারও কাহারও সম্মুখে বাহির হইতেন এবং তাঁহাদিগের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

শ্রীমার জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতেন। শ্রীমার দীক্ষিত-কোন কোন সন্তান তাহা দেখিয়া যদি শ্রীমাকে কখনও প্রশ্ন করিতেন: "মা, আমরা তোমাকেই জানি, আর তো কাকেও জানি না।" শ্রীমা তাহাদিগের অন্তরের ভাব বুঝিয়া বলিতেন: "সে কি, ঠাকুরই সব। ঠাকুর ছাড়া আমি কিছুই নই।" শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তাঁহার সঙ্গে সর্বদা কেন রাখিতেন তাহা অপরের পক্ষে সহজে বোঝা কঠিন ছিল। আসলে শ্রীমা ভাবিতেন গুরু ও ইষ্ট এক এবং মন্ত্র ও দেবতা এক ও অভিন্ন। শ্রীমা সকলকে পুনরায় ঐ একই তত্ত্ব ও আদর্শ শিক্ষা দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাকি শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন: "আমি আর কি করলুম, তোমাকেই সব করতে হবে; তোমার অনেক কাজ বাকী আছে।" সত্যই তাই, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদর্শিত সাধনা ও সিদ্ধির পথ অগণিত মানুষকে ও ভক্ত-সন্তানকে সন্তানবৎসলা শ্রীমা পরবর্তী-কালে আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মন রাখিয়া সংসারের সকল কর্ম করিতে হয়, শ্রীভগবানই ইহকাল ও পরকালের সহায় ও সর্বস্ব—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই শিক্ষাই শ্রীমা জীবন ভরিয়া তাঁহার ভক্ত ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

সকলে শ্রীমার চক্ষে ছিল চিরদিন সমান, কেহই কোনদিন তাঁহার কৃপা ও করুণা লাভ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও

কি জানি কেন, রাধুর জন্য শ্রীমার স্নেহ ও অন্তরের আকর্ষণ ছিল একটু বেশী। প্রথম প্রথম রাধুকে ছাড়িয়া শ্রীমা এক মুহূর্তও থাকিতে পারিতেন না। এক্ষণে হয়তো মনে হইতে পারে যে, সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া মহামায়ার প্রতিমূর্তি শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসার আকর্ষণ অত রাধুর প্রতি কেন? মনে হয়, খাঁটি সোনায় অলঙ্কার তৈয়ারী করাইতে হইলে যেমন একটু খাদের প্রয়োজন হয়, তেমনি ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে মায়ার সংসারে আসিতে হইলে মায়ার একটু স্পর্শ রাখিতেই হইবে, যদিও সেই মায়া তাঁহাদিগকে বন্ধন করিতে পারে না। ঈশ্বরজ্ঞানী জীবন্মুক্তের পক্ষেও তাই যে, তিনি জীবিতকালে ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও পার্থিব শরীর থাকা-পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে মায়ার লেশ একটু থাকিবেই থাকিবে। তাহা ছাড়া পার্থিব শরীর তো মায়ার পরিণাম বা কার্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও দেখি যে, নির্বিকল্পসমাধিতে আরূঢ় হইয়া ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ মায়ার জগতে পুনরায় নামিয়া আসিবার জন্য কোন-না-কোন অবলম্বন তাঁহার প্রয়োজন হইত এবং সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধি হইতে নামিবার (ব্যুত্থিত হইবার) সময় 'তামাক খাব' কিংবা আর কোনও ইচ্ছা বা সংকল্প তাঁহার মনের মধ্যে রাখিয়া দিতেন। শ্রীমার জীবনেও ঠিক তাই। তাঁহার ধ্যানগামী অন্তর্মুখী মনকে বহির্জগতে যুক্ত রাখিবার জন্য অন্যান্যের সহায়তা ছাড়াও রাধুকে তিনি প্রধান সহায় বা অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, রাধারাণী বা রাধুর (রাধুকে শ্রীমা 'রাধি' বলিয়াও ডাকিতেন) উপর শ্রীমার অন্তরের অত্যন্ত টান বা অকর্ষণ ছিল এবং সেইজন্য একজন স্ত্রীভক্ত শ্রীমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: "মা, আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধী রাধী' করছেন ঘোর সংসারীর মত **।" তাহার উত্তরে শ্রীমা তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'রাধুর উপর মায়া যদি না থাকিত, তাহা হইলে ঠাকুরের অদর্শনের পর শরীর আর থাকিত না।' শ্রীশ্রীঠাকুরের

কাজের জন্যই তাঁহার শরীর রাখিয়া দিয়াছেন। শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "রাধী রাধী করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে, তখন আর এ'দেহ থাকবে না।" তাই দেখি যে, শ্রীমা ছিলেন যেন খাঁটি সোনা ও রাধু বা রাধারাণী ছিল খাদ; শ্রীমাকে দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার লীলাকর্ম করাইয়া লইবার জন্য রাধুর স্নেহ-মায়া ও ভালবাসার আকর্ষণে শ্রীমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্রীমার মধ্যে সেই ভাবের ক্রমশ একটু পরিবর্তন হইয়াছিল। রাধুর উপর শ্রীমার যে স্নেহ-আকর্ষণের ভাব তাহা ক্রমশ যেন কমিয়া আসিতেছিল। শেষ অসুখের সময় শ্রীমা বিছানায় শুইয়া রাধুকে বলিতেছেনঃ "গ্যাখ, তুই জয়রামবাটী চলে যা, আর এখানে থাকিস নে।" এই কথা শুনিয়া একজন সেবক বিস্মিত হইয়া শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলঃ "রাধুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কি মা?" শ্রীমা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেনঃ "খুব পারব; মন তুলে নিয়েছি, আর চাই না।" ইহার পর একদিন রাধুর প্রসঙ্গ উঠিলে যোগীন-মাকে শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "যোগেন, মায়া কাটিয়ে দিয়েছি, আর নয়। যে মন তুলে নিয়েছি, তা আর নামবে না জেনো।" সত্যই রাধুর উপর হইতে শ্রীমার অন্তরের আকর্ষণ শিথিল কেন, একেবারে চলিয়া গিয়াছিল। একদিন রাধুকে শ্রীমা বলিয়াই দিয়াছিলেনঃ "কুটো-ছেড়া করে দিয়েছি। তুই আমাকে কি করবি, আমি কি মানুষ?" সাক্ষাৎ মহাশক্তির যথার্থ স্বরূপের প্রতি শ্রীমার যেন তখন হুস ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি যে সামান্য মানবী নন, দেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে তাহার দিব্যলীলাসঙ্গিনী এই রহস্য শ্রীমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাধুর সহিত ইহাই কিন্তু শ্রীমার শেষকথা এবং সেই শেষকথার পর হইতে শ্রীমাব মধ্যে সর্বদাই আত্মসমাহিত ভাবের প্রকাশ দেখা যাইত। তখন দেখা যাইত যে, শ্রীমার মন যেন সংসারের সকল মায়ার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া উর্ধ্বে উঠিতে চায়, শ্রীমা যেন কোন বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিতে

আর চান না। শ্রীমা নাকি তখন অনেককেই বলিতেন: "মনকে বলতে ইচ্ছা করে, 'মন চল নিজ নিকেতনে'। শ্রীমা পূর্বেই বলিয়াছেন যে, রাধুর উপর হইতে যেইদিন তাঁহার মন সরিয়া যাইবে সেইদিন আর তাঁহার শরীর থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে রাধুর উপর হইতে শ্রীমা সম্পূর্ণরূপে মনকে সরাইয়া লইয়াছিলেন এবং সেইজন্য 'নিজ নিকেতনে' বা আপনার স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। আদ্যাশক্তির লীলা মর্ত্যধামে সমাপ্ত হইয়াছে ইহার লক্ষণ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিয়া শ্রীমার অন্তরঙ্গসন্তান ও ভক্তেরা বিমর্ষে দিন কাটাইতেছিলেন। একদিন অন্নপূর্ণার মা শ্রীমাকে দেখিতে গিয়াছেন। তিনি নিকটে গিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন: "মা, আমাদের কি হবে?" শ্রীমা তাঁহাকে অভয় দিয়া একান্ত করুণার স্বরে বলিলেন: "ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ; তোমার আবার ভয় কি?" তাহার পর কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া শ্রীমা আবার বলিলেন: "তবে একটি কথা বলি, যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" অন্নপূর্ণার মা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিশ্বজননী মা সারদা আর পৃথিবীর মাটিতে থাকিবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইবেন। "All them also felt that, breaking through the spell of Yogamaya, the Holy Mother was getting ready for quitting the stage of temporal life।" ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় শ্রীমা মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মিলিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমা দিব্যশরীরে এখনও পৃথিবীতে সকল ভক্ত-হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন ও অনন্তকাল ধরিয়া বিরাজ করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণযুগের সবেমাত্র সূচনা, সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমালোক যতদিন পৃথিবীর বুকে প্রোজ্জ্বল থাকিবে ততদিন শ্রীসারদাদেবীর দিব্যপ্রকাশ বর্তমান থাকিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ ॥

॥ এক ॥

মহাসমাধির কিছুদিন পূর্বে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেনঃ "কি গো, তুমি কিছু করবে না, শুধু আমাকেই কি সব করতে হবে?" তাহার উত্তরে শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "আমি তো স্ত্রীলোক, সুতরাং কি আর করবো বল?" শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "না না, তোমাকেই অনেক-কিছু করতে হবে।" শ্রীমা নীরবে তাঁহার আরাধ্য-দেবতার কথা শুনিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শ্রীমা জীবনেও কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাকে যে ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সন্তানদিগের আধ্যাত্মজীবনের সকল ভার গ্রহণ করিতে হইবে তাহা কিছু কিছু তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজ শ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাঁহার '*The Holy Mother*' নিবন্ধে[১] যথার্থই লিখিয়াছেনঃ "Through such invigorating memories of the past, probably, she (Holy Mother) began to realize the truth of truth of the master's prediction that she was to be the spiritual guide of hundreds of spiritual children (disciples)।" অবশ্য শ্রীসারদাদেবী সেই সঙ্ঘজননীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন অনেক পরে। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ)-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বত্যাগী সন্তানগণ প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তম ও জীবনের একমাত্র

১। *Great Women Of India* (Advaita Ashrama, Calcutta, 1953), p.502

আশ্রয়স্থল প্রিয়তম আচার্যদেবকে হারাইয়া জীবনে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন। ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রথমে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে তাঁহাদিগের আপন আপন বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ বলিয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া হয়। যাঁহাকে দেখিয়া ও যাহার শ্রীচরণে মাথা বিকাইয়া তাঁহারা একবার সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, আচার্যদেবের অদর্শনে জীবনের আদর্শ ত্যাগ করিয়া কী করিয়া পুনরায় সেই সংসারে ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে। তাঁহারা সকলে শ্রীমা সারদাদেবীকে জীবনের আশ্রয়স্থল করিয়া একে একে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে সমবেত হইলেন এবং নিরাশার মাঝে আশায় বুক বাঁধিয়া একটি স্থায়ী আশ্রয়স্থল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর কল্যাণ ও আশীর্বাদ যাঁহাদিগের পরমসহায় তাঁহাদিগের জীবনের আশা ও আকাঙ্খা পূর্ণ হইতে বাকী থাকে না। কিছুদিনের মধ্যেই ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অর্থসাহায্যে কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরের মাঝামাঝিস্থলে বরানগরে একটি ভগ্ন বাটীতে তাঁহারা আশ্রয়স্থলের সন্ধান পাইলেন এবং পরমপূজ্য আচার্যদেবের নাম লইয়া সকলে সেইখানে সমবেত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সেইদিন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। পাশ্চাত্য মণীষী রোমঁ্যা রোলাঁ লিখিয়াছেন: "After Christmas night, 1886, the vigil of Baranagore, where the New Communion of Apostles was founded and tears of love in memory of the lost Master—many months and years elasped before the work was begun that translated Ramakrishna's thought into living action."[২]

২। *Prophets of the New India* by Romain Rolland (translated by E. F. Malcolm-Smith) 1930, p. 235

একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া বরানগরের ভাড়াটিয়া বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও অন্যদিকে শ্রীমার জীবনধারা প্রবাহিত হইল ভিন্নভাবে একটু ভিন্ন দিকে। শ্রীমা তাঁহার আরাধ্য-দেবতার অদর্শনে পাঁচদিন মাত্র কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ও পরে এক সপ্তাহকাল বাগবাজারে (কলিকাতায়) বলরাম বসুর বাটীতে অতিবাহিত করিয়া ৩০শে আগষ্ট (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) মাসে বেদনাহত দেহ-মন লইয়া যোগীন মা, গোলাপ মা প্রভৃতির সহিত উত্তর-ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিবার জন্য গমন করেন। বৈদ্যনাথধাম, বারাণসী ও অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া শ্রীমা বৃন্দাবনে উপনীত হন এবং সেইখানে প্রায় একবৎসর কাল বাস করেন। সুতরাং দেখা যায়, তখন একদিকে গৃহত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদিগের কেহ কেহ বরানগর মঠবাটীতে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতির পূজা ও ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কর্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ)-প্রমুখ সন্তান পরিব্রাজক-বেশে ভারতের তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং অন্যদিকে বৃন্দাবনে একমাস অতিবাহিত করিয়া যোগীন মা, গোলাপ মা প্রভৃতির সহিত শ্রীসারদাদেবী হরিদ্বারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি এবং এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র কেশ প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন।

হরিদ্বার হইতে এলাহাবাদ ও পরে এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া শ্রীমা একেবারে নির্জন পল্লী কামারপুকুরে রওনা হন। কামারপুকুরে রওনা হইবার একটি কারণ ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুর-উদ্যান-বাটীতে রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন তখন একদিন শ্রীমাকে তিনি বলিয়াছিলেনঃ "ত্যাখ গো, আমার অবিদ্যমানে তুমি কামারপুকুরে

স্বামী বিবেকানন্দ

Swami Abhedananda

স্বামী অভেদানন্দ

থেকো ; ভাত শাক যা জোটে তাই খেও, আর শ্রীহরির (ঈশ্বরের) নাম ক'রো।" শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই আদেশবাণী শ্রীমা জীবনে ভুলেন নাই। সেইজন্য বৃন্দাবন, হরিদ্বার, অযোধ্যা, ত্রিবেণীসঙ্গম প্রভৃতি পূণ্য-তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় উপনীত হন এবং বাগবাজারে দুই একদিন থাকিয়া কামারপুকুর অভিমুখে রওনা হন সম্ভবত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে।

কামারপুকুরে শ্রীমার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল একেবারে নির্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রায়. একবৎসরকাল। সত্যই কামারপুকুরে শ্রীমার জীবন কাটিয়াছিল যেন সীতার বনবাসের মতো অসহায়ভাবে। কামারপুকুরে শ্রীমাকে দেখাশোনা করিবার তখন কেহই ছিল না। সেই সময়ে তাঁহাকে ধান ভাঙিয়া চাউল সংগ্রহ করিতে হইত এবং কোন রকমে পুষ্করিণী হইতে শাক সংগ্রহ করিয়া খাইবার জন্য দুইটি চাউল সিদ্ধ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। এমন কি লবন ক্রয় করিবার তখন পয়সা-পর্যন্ত তাঁহার নিকট থাকিত না। সর্বংসহা বিশ্বরূপিণী শ্রীমা কিন্তু সেই সময় সকল দুঃখ-দারিদ্র্য ও ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া হাসিমুখে দিন কাটাইয়াছেন। শ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত স্বামী নির্বেদানন্দ কামারপুকুরে শ্রীমার সেই সময়কার দুঃখ-বেদনাপূর্ণ দিনের কথা স্মরণ করাইয়া লিখিয়াছেন : "Sarada Devi's life at Kamarpukur at this time reminds one of the tale of Sita's hard days in exile. She had to live alone in the house and feel acutely the pintch of poverty. She had to husk paddy and raise vegetables, and somehow boil these for her meals. She had not the wherewithhal to purchase even salt. But she silently accepted all this as a necessary course austerity remembering the Master's instruction during his last days, 'After my time, you go to

Kamarpukur, live upon whatever you get—be it mere boiled rice and green—and spend your time in repeating the name of Hari (God)."৩

সত্যই কামারপুকুরে অবস্থানকালে শ্রীমা যেভাবে দুঃখে-কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন তাহা নিদারুণ হইলেও তিনি তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই পরীক্ষা ও পবিত্র আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গসন্তান ও ভক্ত-শিষ্যগণ বলিতে গেলে শ্রীমার কথা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। সেইদিনের সেই নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের কথা শ্রীমা কিন্তু ঘুণাক্ষরে কাহাকেও এবং এমন কি জয়রামবাটীতে আপনার গর্ভধারিণীকে পর্যন্ত কোনদিন কিছু বলেন নাই। কিন্তু ক্রমে পল্লীর প্রসন্নময়ীর মাধ্যমে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান ও ভক্তগণের কর্ণে শ্রীমার সেই দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ছিলেন কামারপুকুরের স্বনামধন্য জমিদার ধর্মদাস লাহার কন্যা। তিনি কামারপুকুরে নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার সহোদর গয়াবিষ্ণু ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যকালের বন্ধু (স্যাঙাৎ)। শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রসন্নময়ী অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। প্রসন্নময়ীর নিকট হইতে শ্রীমার দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীমাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য সকলে একান্তভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশ্য শ্রীমার সেই দুঃখ-অমানিশার তীব্র তপস্যার ধীরে ধীরে অবসান হইল। সকলের অনুরোধে শ্রীমা সম্ভবত ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। ভক্তেরা শ্রীমার থাকিবার জন্য তখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটী ভাড়া করিয়াছিলেন এবং শ্রীমা

৩। *Great Women of India* (Advaita Ashrama, Calcutta, 1953), p. 504

যোগীন মা ও গোলাপ মা-র সহিত গঙ্গার তীরে বেলুড়ে ঐ বাগানবাটীতে কয়েক মাস বাস করেন। শোনা যায়, শ্রীমা সেই সময়ে তীব্র 'পঞ্চতপা'-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন তাঁহার অদ্ভুত এক দিব্যদর্শন হইয়াছিল। শ্রীমা দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন গঙ্গায় অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে গভীর জলের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার দিব্যজ্যোতির্ময় শরীর ধীরে ধীরে গঙ্গার জলের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পূর্ণ শরীর যখন গঙ্গার জলে মিলাইয়া গেল তখন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) সেই পবিত্র জল অঞ্জলি অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীমা সেই দিব্যদর্শন অনিমেশ নয়নে দর্শন করিয়া বুঝিলেন, নরেন্দ্রনাথকে (তথা স্বামী বিবেকানন্দকে) দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ধর্মসমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করিবেন। সত্যই শ্রীমার সেই দিব্যদর্শন পরবর্তীকালে সার্থক ও বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

ক্রমশ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদগণ ও ভক্ত-শিষ্যগণ ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবীই তাঁহাদিগের যথার্থ সঙ্ঘজননী এবং সকল কর্ম ও প্রেরণার উৎসরূপিণী। এইখানে পুনরায় স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজের রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলি ঃ

"However, by the degrees the entire group seemed to discover in her (Holy Mother) a refuge in the tearing storm raised by the passing away of their beloved Master. They came to see how she appeared, at the psychological moment of their terrible mental depression, as a godsend destined to fill up the place left vacant by their adored and bewailed spiritual

guide. Relieved by this inspiring thought, they rallied round Sarada Devi, the immaculate consort of Sri Ramakrishna and the immediate standard-bearer of his path, and hailed the 'firm and serene soul' as the 'Holy Mother'।"[৪] ক্রমে ক্রমে শ্রীমাকে সেবা করিবার জন্য শ্রীমার পার্শ্বে সমবেত হইলেন স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ এবং আসিলেন বলরাম বসু, মাষ্টার মহাশয় (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)-প্রমুখ আরও কত শত গৃহস্থ ভক্ত-সন্তান। শ্রীমা যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলিয়াছিলেন : "ও গো, পোকার মতো চারদিকে অন্ধকারে লোকে বাস করে, তাদের তুমি দেখো।" শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কথা শ্রীমার অন্তরে জাগরূক ছিল, তাই যে বা যাহারা যেমন অবস্থারই হউক, শ্রীমা তাহাকে বা তাহাদিগকে নির্বিচারে দেখিতেন ও সন্তানের ন্যায় স্নেহ-ভালবাসা দিয়া আদর-যত্ন করিতেন। সর্বত্যাগী ও শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ সন্ন্যাসী-সন্তানদিগের প্রতি শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না এবং সেই গভীর ভালবাসা পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ সন্তানগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনজনিত শোক-দুঃখ ভুলিয়া সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবীকেই কেন্দ্র করিয়া ও ত্যাগ-তপস্যার মধ্য দিয়া বরেণ্য আচার্যদেবের জীবনাদর্শে আপনাদিগের জীবন গড়িয়া তুলিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকল মানুষের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও আদর্শ পৌঁছাইয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। *Great Women of India* (Advaita Ashrama, Calcutta, 1953), p. 506

॥ দুই ॥

বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অবিচল ভক্তি ছিল। কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে মহাসমাধির কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে (তখন নরেন্দ্রনাথ) শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া বলিয়াছিলেনঃ "ছেলেদের তুই দেখবি ; এদের ভার তোর ওপর রইল।" শ্রীমা তাহা জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়া সকল সন্তানের জননী হইয়াও তিনি সকল কাজের সময়ে সকলকে বলিতেনঃ "আচ্ছা, নরেন্দ্রকে একবার এ'সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রো।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের ঘর এবং নরেন্দ্রের মধ্যে আঠারটা শক্তির বিকাশ। বেলুড়ে নীলাম্বর-বাবুর বাগানবাটীতে থাকার সময়ে শ্রীমা যে দিব্যদর্শন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীসারদাদেবী বুঝিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) আসিয়াছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ বিশ্বের দরবারে প্রচার করিবার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেনঃ "নরেন্দ্রের ভেতরটা এখন চাবি দেওয়া রইল ; নরেন্দ্র যখন বুঝতে পারবে ও কে, তখন আর ওর দেহ থাকবে না।" নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দকে সেইজন্য শ্রীমা অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো বিবেকানন্দকে শ্রীমা ছেলেদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথাও তাই। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীগত প্রাণ। সকল সময়ে সকল বিষয়ে শ্রীমার অনুজ্ঞা ও আশীর্বাদ না লইয়া কিংবা শ্রীমার সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কোন কার্যই করিতেন না। শ্রীমার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলিয়াছিলেনঃ "মাঠাকুরুণ কি বস্তু তা কেউ এখনও বুঝতে পারেনি ; তবে ক্রমেই পারবে। জেনো শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকল দেশের চেয়ে অধম কেন? কারণ শক্তিহীন এবং শক্তির অবমাননাও এখানে হয় বলে।

মাতাঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তিকে জাগ্রত করতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এজন্যে তাঁদের—মায়েদেরই মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, তাতে আমি ভীত নই, কিন্তু মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হলে কি ছাই হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি, তাই আগে মায়েদের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা, আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা, আর বাপের ছেলেরা—এই কথা বুঝতে পার কি? মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।”

আমেরিকায় শিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা, কেননা সেইদিন প্রাচ্যের পক্ষে এক সুবর্ণ-সুযোগ ও সুদিন আসিয়াছিল পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্ম, ভারতীয় দর্শন ও আদর্শের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন সেই মহাসভায় হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে এবং বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্বাদও লাভ করিয়াছিলেন সেই বিশ্বধর্মসম্মিলনের অধিবেশনে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর একান্ত স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র। তাই শিকাগোর বিশ্বধর্মসম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিবার পূর্বে তিনি শ্রীমার আশীর্বাদগ্রহণকে পরমপাথেয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু নানান কারণে শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎলাভের তাঁহার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। তাই পত্র লিখিয়া তিনি শ্রীমার আদেশ ও কল্যাণ-আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পত্র পাইয়া শ্রীমা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রবাৎসল্যময়ী শ্রীমার প্রাণ

নরেন্দ্রকে সুদূরে বিদেশে পাঠাইতে প্রথমে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে থাকাকালে গঙ্গাবক্ষে তাঁহার সেই দিব্যদর্শনের কথা মনে হইয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথ যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাকার্যসাধনের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা তিনি মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রসন্নচিত্তে ও সানন্দে বিদেশে যাইবার জন্য তাঁহার গৌরবের পুত্র বিবেকানন্দকে আশীর্বাদ-পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্বামীজী শ্রীমার আদেশ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া শিকাগো-ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে ফিরিয়া পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ সকল সময়ই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বলিতেন, শুধু শিকাগো-ধর্মমহাসভাতেই নয়, বিদেশে ধর্মপ্রচারে ও সকল কর্মে বিজয়মাল্য আনিয়া দিয়াছে শ্রীমার কল্যাণ-আশীর্বাদ ও করুণা।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সন্তান ও ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ। তাহাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সকল চিন্তা ও কর্মধারার অভিপ্রায় শ্রীমার নিকট নিবেদন করিতেন এবং শ্রীমাও তাঁহাকে সকল বিষয়ে গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় উপদেশ দান করিতেন। একবার কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমাকে বলিয়াছিলেনঃ "মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি যেন উড়ে যায়।" শ্রীমা শুনিয়া সহাস্যে বলিয়াছিলেনঃ "দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।" স্বামীজী তাঁহার উত্তরে অবনত মস্তকে বলিয়াছিলেনঃ "মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞান গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?" কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া স্বামীজী পুনরায় শ্রীমাকে বলিয়াছিলেনঃ "জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা, মা'—শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে। সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা

কথাটা।” স্বামীজীর কথা শুনিয়া সেইদিন শ্রীমা প্রথমে একটু গম্ভীর হইয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের জ্ঞানদৃষ্টি ও অনুভূতি কত গভীর। কিন্তু মানুষের সাধারণ সীমায়িত মন বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে অপার্থিব মধুর সম্পর্কের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হয় এবং ভাবে যে, সামান্য গ্রাম্য ঘরের একজন সাধারণ লজ্জাশীলা বধূ শ্রীমা কিরূপে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল মনকে জয় করিয়াছে! কিন্তু তাহারা জানে না যে, শ্রীমা মহাপ্রকৃতিরূপিণী ভগবতী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসহচারিণী হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন যুগকর্মসাধনের জন্য। মহামায়ার স্নেহবন্ধনে শুধু বিবেকানন্দ কেন, বিশ্বসংসারই চিরদিন আবদ্ধ। তবে আবার আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম প্রথম আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীভবতারিণীকেও স্বীকার করিতে চাহিতেন না, কিন্তু পরে জীবনের সকল চিন্তায় ও সকল কর্মে শ্রীশ্রীভবতারিণীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি শ্রীমা সারদার আদেশ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তবে অগ্রসর হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেনঃ “এখন তুই কিছু মানিস নি বটে, কিন্তু একদিন সব মান্‌বি।” স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন স্বামীজীর প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেনঃ “নরেন আগে কিছু মানত না, কিন্তু এখন ‘রাধে রাধে’ বলে কাঁদে ও কীর্তনে নৃত্য করে।” এই মানা বা স্বীকার করা ও মহাভাবে নৃত্য করার আকুলতা তো শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বিবেকানন্দকে দান করিয়াছিলেন। মনে পড়ে, মহাসমাধির পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দের মধ্যে মহাশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি আপনার আরাধ্যা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী শ্রীভবতারিণী-মহাকালীকে বিবেকানন্দের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং তেজঃ, বীর্য ও শক্তির জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি স্বামীজী মহাশক্তিকে না মানিয়া পারেন না। সেজন্যই মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীকে

স্বামীজী বিশ্বমাতা বলিয়া দর্শন ও পূজা করিতেন এবং এই দিব্যদৃষ্টির জাগরণ ও অনুভূতির উদ্বোধন স্বামীজীর মধ্যে করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং। অবশ্য শ্রীমা নিজে ছিলেন চিরদিনই লজ্জাপটাবৃতা অবগুণ্ঠিতা। তিনি সর্বদাই নিজের স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিয়া সাধারণ মানুষের মত থাকিতেন ও অজস্র স্নেহধারায় আপন সন্তানগণকে সিক্ত করিয়া শান্তি বিতরণ করিতেন। মহামায়ার মোহিনী মায়ায় বিশ্বচরাচর যেমন চিরদিন আবৃত ও আচ্ছন্ন, তেমনি শ্রীমার মাতৃত্বের অপার স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সকল ভক্ত-সন্তানরাও শ্রীমার দিব্যভাগবতী রূপ ধরিতে বুঝিতে পারিতেন না, ভাবিতেন, শ্রীমা তাঁহাদিগের পার্থিব স্নেহ-বাৎসল্যময়ী জননী।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বরানগরে একটি জীর্ণ বাটীতে। তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ স্থানান্তরিত হয় আলম-বাজারে একটি বাটীতে। তাহারও অনেক পরে স্থায়ীভাবে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম কূলে।[১] ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বার্ধে আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবীর চরণ বন্দনা করেন। তখনও মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল আলমবাজারে। স্বামীজী স্থায়ীভাবে মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল' ভাবিয়া কাশীপুরের অপর দিকে গঙ্গার পশ্চিম কূলে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাটীর নিকট একখণ্ড জমি নির্বাচন করিলেন। ঐ জমিটি শ্রীমাকে দেখাইবার জন্য স্বামীজী বিশেষভাবে একদিন শ্রীমাকে অনুরোধ

১। বরানগর মঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বরানগরেই সেই মঠ থাকে। তাহার পর মঠ স্থানান্তরিত হয় আলমবাজারে (কাশীপুর) এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ মঠ আলমবাজারেই থাকে; পরিশেষে স্থায়ীভাবে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীর নিকট বেলুড়ে গঙ্গার ধারে নূতন জমিতে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীমার পুণ্যপাদস্পর্শে মনোনীত জমির ধূলিকণা পবিত্র হউক ইহাই ছিল স্বামীজীর মনোগত ভাব।' স্বামীজীর একান্ত অনুরোধে শ্রীমা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া বেলুড়ে নূতন জমিটি দেখিবার জন্য গমন করিলেন। স্বামীজী শ্রীমাকে ঘুরাইয়া বেলুড়ের নূতন জমিটি দেখাইতে দেখাইতে বলিয়াছিলেনঃ "মা, তুমি নিজের জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।" শ্রীমার চরণস্পর্শে বেলুড় মঠের জন্য মনোনীত নূতন জমির মৃত্তিকা সেইদিন পবিত্র হইয়াছিল এবং আজিও অতীতের সেই পুণ্যস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বেলুড় মঠ মহাতীর্থে পরিণত হইয়া আছে। এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলে বোধহয় অসমীচীন হইবে না যে, স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার পর একটি বিল্বতরুমূলে দাঁড়াইয়া উদাত্তকণ্ঠে যে গানটি গাহিয়াছিলেন সেই গানের স্মৃতি আজিও বেলুড় মঠপ্রাঙ্গণে শ্রীদুর্গাপূজার পুণ্য-বোধনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামীজীর গীত গানটি হইল—

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥

স্বামীজীর সেই গানে বর্ণিত সকল কথাই আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বেলুড় মঠের পুণ্যতীর্থে আজ কত দণ্ডী, কত যোগী-জটাধারী ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইতেছে এবং তাঁহাদিগের পদস্পর্শে বেলুড় মঠের মৃত্তিকা ও পরিবেশ পবিত্র হইয়াছে।

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার কিছুদিন (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের) পরে স্বামী বিবেকানন্দ যখন নূতন মঠের জমিতে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন তখন বাগবাজার হইতে মঠে আসিবার জন্য তিনি শ্রীমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন

এবং শ্রীমাও সানন্দে স্বামীজী ও সকল সন্ন্যাসিবৃন্দের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমা কয়েকজন স্ত্রীভক্ত সমভিব্যাহারে বেলুড় মঠে উপনীত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া মহাসমারোহে মহামায়ার পূজা হইল। স্বামীজী পূজায় পশু বলি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং ছাগরক্তে গঙ্গার জল লাল হইয়া যাইবে অন্তরের এই সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু স্বামীজীর সেই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া শ্রীমা অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীকে পশু বলি দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত সন্তান শ্রীমার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় পশুবলি বন্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীমা যে পূজায় পশু বলি দিতে নিষেধ করিবেন, ইহা তো স্বাভাবিক কথা, কেননা প্রাণীমাত্রেই শ্রীমার স্নেহের সন্তান। সুতরাং সন্তানের রুধিরে মাতৃপূজা হইবে ইহা করুণাময়ী মা কিরূপে সহ্য করিবেন? যাহা হউক মহানবমীর পূজা সমাপ্ত হইলে স্বামীজী শ্রীমার হাত দিয়া পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলেন। বিজয়াদশমীর দিন শ্রীমা স্বামীজীপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। শ্রীমার পুণ্য-আশীর্বাদ লাভ করিয়া সন্তান ও ভক্তগণের আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁহার পরমারাধ্য আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত প্রচারের জন্য সুদূর ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় ছিলেন তখন তাঁহার বহু পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীমার নামে স্ত্রীভক্তদের জন্য তিনি পৃথক একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর একটি পত্রে এই সঙ্কল্প স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। স্বামীজী তাহাতে লিখিয়াছেন: "বাবুরামের মার বুড়া বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জেন্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন দাদা, জেন্ত দুর্গার পূজা দেখাব তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জেন্ত দুর্গা মাকে—শ্রীসারদাদেবীকে যেদিন

বসিয়ে দেবে, সেইদিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে; ধন্য সে, তার কুল ধন্য। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন—কি মানুষ ছিলেন—যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও। যার তাঁতে বিশ্বাস নেই আর মাঠাকুরাণীতে ভক্তি নেই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, মনে রেখ।" এই পত্রে শ্রীমার স্বর্গীয় মাতৃত্ব ও দেবীত্বের উপর স্বামী বিবেকানন্দের অগাধ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার নিদর্শনের তুলনা নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার ও সংগঠনকার্য শেষ করিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য একবার তিনি কাশ্মীরভ্রমণে গিয়াছিলেন। ঐ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তিনি কাশ্মীরের মহারাজার সহায়তায় অমরনাথ-শিব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তুষার-শিব দর্শন করিয়া দিবারাত্র শিবভাবে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। ৮ই আগষ্ট (১৮৯৭) অমরনাথ তীর্থ হইতে তিনি শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীর-মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীনগরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ ৩০শে সেপ্টেম্বরই স্বামীজী পুনরায় দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দির দর্শনের জন্য গমন করেন। একাকী নির্জনে ক্ষীরভবানীর মন্দিরের নিকট থাকিয়া প্রায় এক সপ্তাহকাল তিনি দেবীর যথাবিহিতভাবে পূজা-প্রার্থনায় ও ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন। একদিন দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে অবিস্মরণীয় এক ঘটনায় স্বামীজী বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবস্থা দর্শন করিয়া স্বামীজী একদিন বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি শুনিলেন যে, যবনেরা আসিয়া দেবীর পবিত্র মন্দির কলুষিত ও ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল এবং কেহই তাহাদের অভিযান প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী গভীর দুঃখে ও ক্রোধে স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন ও পরে বলিয়াছিলেনঃ "আমি যদি

তখন থাকতাম তাহলে তোমাকে রক্ষা করিতাম, কেউ তোমাকে ধ্বংস করতে পারত না।” স্বামীজীর সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই এক অপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বামীজী এক দৈববাণী শুনিতে পাইয়াছিলেনঃ “তুই আমাকে রক্ষা করবি,—না আমি তোকে রক্ষা করবো? আমি ইচ্ছা করলে কি না হতে পারে? আমি ইচ্ছা করলে কি এখনই সোনার মন্দির তৈরী করতে পারি না?” প্রত্যক্ষ দৈববাণী শুনিয়া স্বামীজীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেনঃ “সত্যিই তো আমি কে? মা-ই সব।” বিস্মিত স্বামীজী ভাবিয়াছিলেন, মহামায়ার ইচ্ছাই সব, মানুষ যন্ত্র মাত্র। তখন স্বামীজীর অবস্থা হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণের দিব্যবিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জুনের যেইরূপ আত্মসমাহিত ভাব হইয়াছিল—‘যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি’। সেইদিন হইতে স্বামীজীর জীবনে নূতন এক ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ধূলিমলিন পৃথিবী হইতে তাঁহার মন তখন ঊর্দ্ধলোকে পরম শান্তিময় সমাধিলোকে যেন মগ্ন হইয়াছিল। তখন আর ‘হরি ওঁ’ নয়, মুখে কেবল ‘মা মা’ নাম এবং ‘মা যা করেন’ এই কথা। বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াও স্বামীজীর সেই ভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বরং তাহা ক্রমশ যেন তাঁহার আপন স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

কাশ্মীরে থাকাকালে অদ্ভুত রকমের একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। কোন এক কারণে এক মুসলমান ফকির একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীজীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তিনদিনের মধ্যে তাঁহাকে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ঘটনাচক্রে ঘটিয়াছিল ঠিক তাই। স্বামীজী অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অগত্যা কলিকাতায় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লাহোর, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইয়া তিনি ১৮ই অক্টোবর (১৮৬৭) বেলুড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ

কাশ্মীরের অভূতপূর্ব ঘটনায় বেশ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর এবং নিজের উপরও তাঁহার কিছুটা অভিমান হইয়াছিল! তিনি কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া বেলুড় মঠে বিশ্রাম গ্রহণের পর বাগবাজারে একদিন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ঘটনায় স্বামীজীর মনের অভিমান ও দুঃখ তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। তিনি শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিমানভরেই শ্রীমাকে বলিয়াছিলেনঃ "মা, এই তো ঠাকুর! এক সামান্য ফকিরের কথায় অসুস্থ হয়ে আমাকে ফিরে আসতে হল। সামান্য ফকিরের শক্তিও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না।" স্বামীজীর অভিমান ও দুঃখের কথা শুনিয়া শ্রীমা একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেনঃ "বাবা, স্বয়ং শঙ্করাচার্যকেও রোগ নিতে হয়েছিল। তোমার শরীরে রোগ আসতে দেওয়া আর ঠাকুরের শরীরে আসতে দেওয়া একই কথা। ঠাকুর তো ভাঙ্গতে আসেন নি, গড়তে এসেছিলেন। সবই বিদ্যা; বিদ্যাকে তো মানতেই হবে। ঠাকুর তো সবই মানতেন।" শ্রীমার স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেনঃ "মা, তুমি যাই বল না কেন, আমি কিন্তু সেকথা মানি না।" তাহার উত্তরে শ্রীমা পুনরায় হাসিয়া বলিয়াছিলেনঃ "না মেনে থাকবার কি যো আছে বাবা! তোমার টিকি যে ঠাকুরের কাছে বাঁধা আছে।" সত্যই বালক যেমন কাহারও নিকট মনে দুঃখ পাইয়া ব্যথিত হয় ও স্বীয় গর্ভধারিণীর নিকট গিয়া অভিমানভরে সকল কথা বলে, তেমনি ক্ষণিকের জন্য ক্ষুব্ধ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমার নিকট কাশ্মীরের সেই ঘটনার কথা অভিমানভরে বলিলে জ্ঞানদায়িনী শক্তিস্বরূপিণী শ্রীমা স্বামীজীকে নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইয়া শান্ত করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীমা এই প্রসঙ্গে একদিন একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেনঃ "ঠাকুর বলতেন, নরেন সপ্ত ঋষির এক ঋষি। নরেনের মুক্তির চাবি ঠাকুরের হাতে ছিল। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব

সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বর ছাড়া কিছুই হবার সাধ্য নেই, তৃণটিও নড়ে না। যখন জীবের সুসময় আসে, তখন ধ্যানচিন্তা আসে, কুসময়ে কুপ্রবৃত্তি, কুযোগাযোগ হয়। তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি কালে সব আসে, তিনি তাঁর ভিতর দিয়ে কার্য করেন। নরেনের কি সাধ্য? তিনি তাঁর ভেতর দিয়ে সব করালেন বলে তো নরেন সব করতে পেরেছিল? ঠাকুর যেটি করবেন তাঁর ঠিক করা আছে। তবে ঠিক ঠিক যদি কেউ ওঁর উপর ভার দেয়, উনি তা ঠিক করে দেবেন!" আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল শ্রীমা তাহা ভালভাবে জানিতেন। সেইজন্য শ্রীমা একবার বলিয়াছিলেন: "নরেন দেহের রক্ত দিয়েছিল পরের জন্য। নরেনই তো বিলাত থেকে ফিরে এসে এই সব মঠ প্রভৃতি করলে। তাই ছেলেদের দাঁড়াবার একটু জায়গা হয়েছে।" এই প্রকার কত কথাই না মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর উক্তি।

একবার চুরি করার অপরাধে স্বামীজী এক উড়িয়া ভৃত্যকে মঠ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ভৃত্য নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে বাগবাজারে গিয়া শ্রীমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কেননা সে জানিত, করুণাময়ী মা ছাড়া তাহাকে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। ভৃত্য অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্নান-আহার করিতে বলিলেন। ঘটনাচক্রে সেইদিনই বৈকালে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে প্রণাম করিবার জন্য বাগবাজারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বসিলে শ্রীমা ভৃত্যকে দেখাইয়া বলিলেন: "ছ্যাখো বাবুরাম, এই লোকটি বড় গরীব; সংসারে অভাবের তাড়নায় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে। তাই নরেন ওকে গালমন্দ ক'রে তাড়িয়ে দিলে। সংসারে বড় জ্বালা। তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না। একে

মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।” শ্রীমার আদেশ শিরোধার্য করিয়া প্রেমানন্দ মহারাজ ভৃত্যটিকে সঙ্গে লইয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলেন। স্বামীজী দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া সকল ঘটনাই বুঝিতে পারিলেন এবং হাসিতে হাসিতে প্রেমানন্দ মহারাজকে বলিলেনঃ “বাবুরামের কাণ্ড ছ্যাখো, ওটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে!” প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমার আদেশ বিনীতভাবে স্বামীজীকে নিবেদন করিলেন এবং স্বামীজী শুনিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি ভৃত্যকে মঠে স্থান দিলেন এবং শ্রীমার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

শ্রীমার অসাধারণ স্নেহ ও ভালবাসা স্বামীজীর প্রতি সর্বদাই ছিল। স্বামীজী যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন, তখন শ্রীমা ‘নরেন আসিয়াছে’ জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ ছোলার ডাল ও রুটি রান্না করিয়া স্বামীজীকে খাইতে দিতেন। স্বামীজী ডাল ও রুটি খাইতে যে ভালবাসিতেন তাহা শ্রীমা জানিতেন এবং সেইজন্য স্নেহের পুত্র নরেন্দ্রনাথকে আহার করাইয়া শ্রীমা পরমতৃপ্তি লাভ করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দির দর্শন করিয়া কাশ্মীর হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিবার পর স্বামী বিবেকানন্দ যেন জগজ্জননী মহামায়ার হস্তের যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। অমরনাথ-শিব দর্শনের পর তিনি যেমন শিবভাব ও শিবসমাধির অনির্বচনীয় আনন্দে ডুবিয়া থাকিতেন, দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণী শ্রবণের পর হইতে তিনি সর্বদা মাতৃধ্যানে সমাহিত হইয়া থাকিতেন। জ্ঞানবিচারনিষ্ঠ পরমবেদান্তী স্বামী বিবেকানন্দ তখন হইতে যেন আত্মসমর্পিত অসহায় শিশু ও মাতৃসন্তানে পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। তখন মুখে সর্বদাই ধ্বনিত হইত ‘মা, মা’ রব। মহাকালের চিন্তা তখন মহাকালীর ধ্যানে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মিষ্টার জোকে (Joe) লিখিত স্বামীজীর

একটি মূল্যবান পত্রের কথা। স্বামীজী সেই পত্রে তাহার জীবন-সায়াহ্নের একান্ত নিরাসক্ততা ও উদাসীনতার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তখন সমগ্র বিশ্বসংসার যেন স্বামীজীর নিকট তুচ্ছ ও অসার বলিয়া প্রতীত। স্বামীজী সেই পত্রে লিখিয়াছেন ঃ "আমার ভালবাসার ভিতর তখন ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে তখন ফলভোগের আকাঙ্খা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর তখন প্রভুত্ব-স্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে, আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই! মা যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে,—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া কেবল মাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই।" সম্পূর্ণ নিরাসক্তি ও আত্মসর্পণের ভাব! এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বিশ্বপ্রকৃতি মহামায়ার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ ও আত্মনিবেদন করিয়া সর্বদাই শান্ত ও সমাহিত থাকিতেন, তেমনি আবার মহামায়ারই সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি জ্ঞানে বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদা দেবীর চরণেও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন। মহাসমাধির অব্যবহিত পূর্বে কয়েকদিন তাঁহার জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, তখন স্বামীজী সর্বদাই শ্রীসারদাদেবীগত প্রাণ ছিলেন এবং শ্রীমার আদেশ, উপদেশ ও স্নেহ-করুণাই তাঁহার জীবনের একমাত্র সহায় সম্বল ছিল। তখনকার স্বামীজীর অনেক উক্তিতেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, একদিন স্বামীজী বলিতেছেন ঃ "মা-ঠাকুরুণ কি বস্তু বুঝতে পার নি, এখনও কেউই পার না, ক্রমে পারবে। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।" কিন্তু বিশ্বরূপিণী মা সারদা যতদিন অবগুণ্ঠিতা হইয়া সকলের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন, ততদিন শুধু স্বামীজী কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-

সন্তানদিগের ও ভক্তগণের অনেকেই শ্রীমার স্বরূপ ও মহিমা সম্যক-রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই যোগমায়া যেদিন কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে 'অহং'-মায়ার আবরণ চির-উন্মুক্ত করিয়া আপন শক্তি ও মহিমা স্বামীজীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন ও শুনাইয়াছিলেন: "তোকে আমি রক্ষা করব, না তুই আমাকে রক্ষা করবি,"—সেদিন স্বামীজীর প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছিল এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিশাল বিস্তৃত সাগরের নিকট মানুষ যেমন একান্ত অসহায়, তেমনি মহাশক্তি মহামায়ার নিকট মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি সর্বদাই লাঞ্ছিত ও পরাজিত, অপরাজেয় মাতৃ-শক্তিরই জয় সর্বত্র।

কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশ্বব্যাপিনী মাতৃশক্তির স্পর্শ ও পরিচয় লাভ করিয়া আত্মসমাহিত হইয়াছিলেন, সেই শক্তিকে তিনি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন তাঁহার 'Kali the Mother' ইংরাজী কবিতায়। 'Kali the Mother' কবিতায় তিনি মৃত্যুরূপা কালীর ভীষণা ও ভয়ঙ্করী মূর্তির মধ্যে আনন্দ-কল্যাণময়ী অপার্থিব দ্বন্দ্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্করী ও কল্যাণী—অশান্ত ও শান্ত এই উভয় রূপের সমন্বয়সাধনও করিয়াছেন। অশান্ত প্রলয়ের বুকে সৃষ্টির লীলা সত্যই অপূর্ব!

'Kali the Mother' ইংরাজী কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দ মহাকালীর একাধারে ভীষণা ও প্রসন্না মূর্তির বর্ণনায় লিখিয়া-ছিলেন—

The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant.
In the roaring, whirling wind
Are the souls of a million lunatics,
Just loose from prison-house,

Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves ;
To reach the pitchy sky.
The fash of lurid light
Reveals on every side
A thousand thousand shades
Of Death, begrimed and black
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy.
Come, Mother, come !

For Terror is Thy name,
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er.
Thou 'Time', the All-Destroyer !
Come, O Mother, come !

Who dares misery love,
And hug the from of death,
Enjoy destruction's dance—
To him the Mother comes.

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন,

॥ মৃত্যুরূপা কালী ॥

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ !

লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে !
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায় ।
লক্ষ লক্ষ ছায়ায় শরীর ! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !

করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে ।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ॥

মহাপ্রকৃতি কালীর মূর্তি একদিকে ভয়ঙ্করা করালিনী, গলায় মুণ্ডমালা, করে রক্তাক্ত অসি বা খড়্গ ও দুষ্টজনদলনী এবং অপরদিকে বরাভয়করা, প্রসন্নময়ী ও ভক্তজনপ্রতিপালিনী । শ্রদ্ধেয় স্বামী নিখিলানন্দ VIVEKANANDA গ্রন্থে এই মহাকালীর পরিচয়ে লিখিয়াছেন : "In one aspect She appears terrible, with a garland of human skulls, a girdle of human fingers, her tongue dripping blood, a decapitated human head in one hand and a shining sword in the other, surrounded by jackals that haunt the cremation ground—a veritable picture of terror. The other side is benign and gracious, ready to confer upon Her devotees the boon of immortality."[১]

---

১ । *Vivekananda* (A Biography), New York 1953, pp. 141-142

মৃত্যুরূপা কালীর এই অভয়া ও সভয়া মূর্তির কল্পনা অধ্যাত্ম-সাধকের কল্যাণসিদ্ধির জন্য, কেননা হৃদয়কে সর্ববৃত্তিহীন নির্মল না করিলে মুক্তিময়ী কালীর শান্ত সমাহিত রূপের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। মহাশক্তির প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীমার করুণাপ্রাপ্ত স্বামী বিবেকানন্দ শবরূপী শিবারূঢ়া কালীর বিশ্বগ্রাসিনী ও বিশ্ব-পালিনী এই উভয় মূর্তির ধ্যানেই আত্মসমাহিত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আনন্দমঠের অমর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালরূপিণী বা ত্রিকালব্যাপিণী মহাশক্তির রূপের বর্ণনার কথা। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্মচারীর মাধ্যমে মহেন্দ্রকে জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গার রূপের পরিচয় দিয়াছেন 'মা যা ছিলেন', 'মা যা হইয়াছেন' ও 'মা যা হইবেন' এই সৃষ্টিকারিণী, সৃষ্টি-সংহারিণী ও সৃষ্টিপ্রতিপালিনী তিন রূপের ভিতর দিয়া। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের আরাধ্যা-দেবী যেমন ছিলেন ত্রিকালব্যাপিণী মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দেরও তাই। 'Kali the Mother' ইংরাজী কবিতায় মহাকালীর ধ্যানচিন্তা ও মূর্তিকল্পনা স্বামী বিবেকানন্দের স্বীয় দিব্যানুভূতিরই ফলস্বরূপ। স্বামীজীর জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে তখন হইতে রূপান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ তাহার লুকানো চাবির এইবার সন্ধান পাইয়াছে, সুতরাং 'সংসার বিদেশ' হইতে তাহার মন 'নিজ-নিকেতনে' চলিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই সমাগত। স্বামীজী মহাকালীর ধ্যানে সর্বদাই বিভোর। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুর-ঘরে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা করিলেন। সেইদিন স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে কালীপূজারও আয়োজন হইয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লিখিত স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের পত্র হইতে জানিতে পারি, আন্দাজ বেলা ১১টার সময় ধ্যান হইতে উঠিয়া স্বামীজী গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া-ছিলেন—

মা কি আমার কাল,

কালরূপা এলোকেশী,

হৃদিপদ্ম করে আলো ॥ প্রভৃতি[১]

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এই প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে আমেরিকায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন যে, স্বামীজী ৪ঠা জুলাই ৯টা ১০ মিনিটের সময় মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির সংবাদ শ্রীমার নিকট পৌঁছিল। শ্রীমা কাতর হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হন।

১। স্বামী নিখিলানন্দজী *Vivekananda* (New york, 1953) গ্রন্থে (পৃ ১৭৭) লিখিয়াছেন যে স্বামীজী সাধক কমলাকান্ত-রচিত নিম্নলিখিত গানটি গাহিয়াছিলেন,

শ্যামা মা কি আমার কালো রে।

লোকে বলে কালী কালো, আমার মন তো

বলে না কালো রে।

কখনও শ্বেত কখনও পীত

কখনও নীল লোহিত রে,

(আমি) আগে নাহি জানি কেমন জননী

ভাবিয়ে জনম গেল রে। প্রভৃতি

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লিখিত প্রেমানন্দ মহারাজের পত্রে যে গানটির উল্লেখ আছে, ঐ গানটিই স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

স্বামী যোগানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "মা, বিষয়ী সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার জিভ জ্বলে গেল।" শ্রীশ্রীভবতারিণী তাঁহাকে অভয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরা আসছে।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সত্য সত্যই ত্যাগ-বৈরাগ্যবান সন্তানরা ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। সন্তানগণ সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ও লীলাসহচর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আকুল আহ্বানে যে সন্তানগণ আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে মহাশক্তিরূপিণী জগৎজননীরূপে দর্শন ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং শ্রীমার প্রতি এই দিব্যধারণার জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা অনেক সময়ই অনেক ভাবে তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই। শ্রীমা যখন লক্ষ্মী-নিবাসে থাকিতেন তখন প্রতিদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে গিয়া শ্রীমার কুশল-সংবাদ লইতেন এবং শ্রীমা যে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী ও মহাসরস্বতী ইহা মনে প্রাণে জানিয়া শ্রীমার চরণ বন্দনা করিতেন। একদিনের একটি ঘটনা। লক্ষ্মী-নিবাসের নীচের বারান্দায় শ্রীমা বা মাস্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া এবং উপরের বারান্দায় গোলাপ

মা দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" তাহার উত্তরে রাখাল মহারাজ বলিয়াছিলেন: "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর (দ্বার) খুলে না দিলে যে আর উপায় নেই।" এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বাউল-সুরে গান ধরিলেন,

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে॥
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াও রে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে॥
কমলাকান্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাও রে।
এতো সুখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে বাও রে॥

গান গাহিতে গাহিতে ভাবে উন্মত্ত হইয়া রাখাল মহারাজ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া আনন্দময়ী শ্রীমা ও সকলে আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। সত্যই মা যাহার আনন্দময়ী সে কি কখনও নিরানন্দে থাকিতে পারে!

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমা কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "আগে শক্তিপূজা করিতে হয় কেন?" অবশ্য তাহার উত্তর সহজ না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, শক্তিপূজার কথা তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শক্তি বা কালীই তন্ত্রে মহামায়া জগৎপ্রসবিনী। বেদান্তে এই শক্তিকে 'মায়া' ও মিথ্যা বলা হইয়াছে। মিথ্যা অর্থে অনিত্য—যাহা আজ আছে, কাল নাই, সর্বদাই পরিবর্তনশীল। বিশ্বসংসার চিরপরিবর্তনশীল বলিয়া অদ্বৈতাচার্যেরা জগৎকে মায়া বা অনিত্য বলিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, মায়া বা মহামায়া নিত্যা, বিশ্বকারণ ও চৈতন্যরূপিণী। অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গে তন্ত্রসিদ্ধান্তের এখানেই পার্থক্য। অদ্বৈতবেদান্তের মতে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি করিতে হইলে যেমন

মায়ার মিথ্যা আবরণকে প্রতিবন্ধক ও অন্ধকার জানিয়া সরাইয়া দিতে হয়, তন্ত্রোক্ত সাধনায় পরমশিবকে লাভ অথবা পরমশিব ও শক্তির সামরস্য উপলব্ধি করিতে হইলে চিতিশক্তি মায়াকে না সরাইয়া বরং তাঁহাকে উপাসনা করিয়া ও প্রসন্ন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করিতে হয়। মোটকথা চিতিশক্তি মায়া বা মহামায়াই চৈতন্যঘন পবমশিবকে দেখাইয়া দেন। তন্ত্রদৃষ্টি লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলিয়াছিলেনঃ "মহামায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয় না।" ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় তাঁহার মানস-পুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজও সেইজন্য বলিয়াছেনঃ "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে দোর (দ্বার) না খুললে যে উপায় নেই।" স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও বলিয়াছেন, শ্রীমা করুণারূপিণী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ধ্যান করিবার পূর্বে তাই মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীকে ধ্যান করিতে হয় এবং শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া দেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের কল্যাণ-নির্দেশ হইতে আমরা বুঝিতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবী মহাশক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরমশিব ও ব্রহ্মচৈতন্য। এখানে শক্তি ও শিব—শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। তাঁহারা এক ও অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যেরই দুই রূপ—শক্তি ও শিব, লীলা ও নিত্য, বিকাশ ও স্বরূপ, জীব-জগৎ ও ব্রহ্ম। স্বামী অভেদানন্দ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, তবে ভিন্ন ভাবে। তিনি বলিয়াছেন, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি যেমন এক ও অভিন্ন, সাগর ও তাহার তরঙ্গমালা যেমন অভিন্ন, অচল সর্প ও সচল সর্প যেমন একই সর্প, নামে ও রূপে মাত্র ভেদ, ব্রহ্ম এবং শক্তি তেমনি এক ও অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্তের কথা বা সিদ্ধান্ত অবশ্য পৃথক।

একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। একবার শ্রীমাকে

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে বেলুড় মঠে আনয়ন করা হইয়াছিল। মহাপূজার কয়দিন সন্ন্যাসী-সন্তান ও ভক্তগণ প্রতিমাপূজার ন্যায় জীবন্ত দেবীপ্রতিমা শ্রীমার চরণেও পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন: "মা জীবন্ত দুর্গা।" সেই সময় শ্রীমা বেলুড় মঠের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন ও অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন: "আহা, বেলুড়ে কেমন ছিলুম! কি শান্ত জায়গাটি, ধ্যান লেগেই থাকত। তাই এখানে একটা স্থান করতে নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) ইচ্ছা করেছিল।" শ্রীমার কল্যাণ-ইচ্ছা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন পরে সত্য হইয়াছিল। একান্ত চেষ্টায় ও শ্রীমার আশীর্বাদে বেলুড়ে মঠের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হইয়াছিল। সেই বেলুড় মঠেই শ্রীশ্রীআনন্দময়ী দেবী দুর্গার মহাসমারোহে পূজা। শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ ও সমাগত ভক্তগণের তাই আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

ঠিক এইভাবে বেলুড় মঠে অন্য সময়ে একবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদিগের অনুরোধে শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন। সেইবারে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অষ্টমীপূজার দিন সাক্ষাৎ জগদম্বা-জ্ঞানে একশত আটটি পদ্মফুল চরণে অঞ্জলি দান করিয়া শ্রীমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়া শ্রীমা প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

আর একবারের কথা। শ্রীমা যখন শিবপুরী কাশীতে ছিলেন তখন তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন অনেক ভক্ত-সন্তান। ব্রহ্মানন্দ মহারাজও শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীমা কাশীর রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম দেখিতে গিয়া সেবাশ্রমের বাটী, বাগান ও সেবাকার্যের সুব্যবস্থা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন: "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" তাহার পর সেবাশ্রমের সুব্যবস্থা ও বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন: "স্থানটি এত সুন্দর যে, আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতেই থেকে যাই।" শ্রীমা সেইদিন

সেবাশ্রমে দুর্গত দরিদ্রদিগের সেবার জন্য দশটাকা দান করিয়াছিলেন। শ্রীমার সেই মহামূল্য দান আজিও কাশী সেবাশ্রমে মহারত্নরূপে রক্ষিত আছে।

শ্রীমা যখন সেবাশ্রম পরিদর্শন করিতেছিলেন সেই সময়ে একজন ভক্ত-সন্তান শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখ্‌লেন?" শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন: "দেখ্‌লুম ঠাকুর এখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন, আর তাই এ'সব কাজ হচ্ছে। এ'সব তাঁরই কাজ।"

ইহার পর একদিন শ্রীমা কাশী হইতে বৌদ্ধতীর্থ সারনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিদেশিনী মিস্ ম্যাকলাউড তখন কাশীতে ছিলেন। শ্রীমাকে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপে দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। সারনাথতীর্থ দর্শন করিতে যাইবেন বলিয়া মিস্ ম্যাকলাউড শ্রীমার জন্য একটি ফিটন্ গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অগত্যা অন্য একটি সাধারণ গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্রীমা, রাধু ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে লইয়া মিস্ ম্যাকলাউড সারনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পরে শ্রীমা প্রভৃতি চলিয়া যাইবার পর ফিটন্ গাড়ী আসিলে তাহাতে করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য কয়েকজন সন্ন্যাসী সারনাথে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সারনাথতীর্থে শ্রীমা বৌদ্ধযুগের অতীতকালের স্মৃতিচিহ্নগুলি অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত দর্শন করিয়াছিলেন। তখন সেখানে কয়েকজন ইংরাজ পরিদর্শকও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধযুগের প্রাচীন নিদর্শনগুলি দেখিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "যারা করেছিল, তারাই আবার এসেছে, আর দেখে অবাক হয়ে বলছে, কি আশ্চর্য সব করে গেছে।" মনে হয়, শ্রীমা যেন দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া সেই কথাগুলি তখন বলিতেছিলেন। যাহাহউক সারনাথ দর্শন করিয়া গাড়ীতে ফিরিবার সময়ে শ্রীমাকে ফিটন্ গাড়ীতে

উঠিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ "না, না, ও গাড়ীতে রাখাল ওরা এসেছে, ওরাই যাবে, আমার এ' গাড়ীতে (ভাড়া করা গাড়ীতে) কষ্ট হবে না।" কিন্তু ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি শ্রীমাকে একান্তভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন ফিটন্ গাড়ীতেই ফিরিবার জন্য। অগত্যা শ্রীমা সম্মত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুরোধে শ্রীমা ফিটন্ গাড়ীতে এবং পরের গাড়ীতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য সকলে গমন করিয়াছিলেন। কিছুদূরে অগ্রসর হইবার পর একটি বাঁকের মুখে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রভৃতির গাড়িটি হঠাৎ উল্টাইয়া যায়। অবশ্য কাহারও বিশেষ আঘাত লাগে নাই। তাঁহারা উঠিয়া পুনরায় গাড়ীতে বসিয়াছিলেন ও ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন ঃ "ভাগ্যিস মা এ' গাড়ীতে যান নি, তা না হলে কি বিপদই না হত!" শ্রীমা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "এ বিপদ আমারই অদৃষ্টে ছিল, তবে রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে। না হলে ছেলে-পিলের গাড়ীতে কি যে হত।" ঘটনাটি অবশ্য সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীমার প্রতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কত গভীর ছিল। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নিজে গাড়ী হইতে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভূমি হইতে উঠিয়াই দেখিয়াছিলেন শ্রীমা নিরাপদে আছেন কিনা। শ্রীমা যে বিপদের সম্মুখীন হন নি, তাহাতেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আনন্দিত। শ্রীমা সেই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন 'রাখালের কি টান তাঁহার প্রতি'।

অন্য এক সময়ে জনৈক ভক্ত ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন ঃ "মহারাজ, আপনার কথা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি কেন মার কাছে যান না।" এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন বেলুড় মঠে থাকিতেন এবং সেইজন্য নৌকা করিয়া প্রায়ই শ্রীমাকে দর্শন করিতে বাগবাজারের উদ্বোধনের

বাটীতে যাইতে পারিতেন না। ভক্তের কথা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উত্তর দিয়াছিলেন: "তাই নাকি? তা আপনার কথা শুনে শ্রীমা কি বল্লেন?" ভক্ত বলিয়াছিলেন: "শ্রীমা আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বল্লেন, তাতে কি, রাখাল তো নারায়ণ, সে আমার কাছেই আছে।" ভক্তের কথাগুলি শুনিবামাত্র ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এমনি স্থির ও গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন এবং বহুক্ষণ পরে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। শ্রীমার কথা শুনিলে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এইরূপ অবস্থা প্রায়ই হইত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যখন ভুবনেশ্বর মঠে ছিলেন (ভুবনেশ্বর মঠ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত), তখন একদিন গভীর রাত্রে তিনি উঠিয়া অন্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "দেখ তো কটা বেজেছে, আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। মা ঠাকুরুণ কেমন আছেন কে জানে।" পরের দিন সকালবেলায় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বেড়াইতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে শরৎ মহারাজের নিকট হইতে শ্রীমার মহাপ্রয়াণের টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গভীর মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়া মাতৃহারা সন্তান ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি শোকভার সহ্য করিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ একান্তে জ্ঞানহীনপ্রায় শুইয়া থাকিবার পর বলিয়াছিলেন: "এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম, আজ যেন নিঃসহায় মনে করছি।" প্রিয়তম আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনবেদনা সঙ্ঘজননী শ্রীমাকে দেখিয়া এবং তাঁহার অপার করুণা লাভ করিয়া কোনরূপে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু আজ শ্রীমাকে হারাইয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও সকলে যেন অকুল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

স্বামী অভেদানন্দ বা 'কালী-বেদান্তী' ('কালী তপস্বী')-র ত্যাগ, তপস্যা ও অদ্বৈতবেদান্তনিষ্ঠা সর্বজনপরিচিত। অদ্বৈতবেদান্তের ও বিচারসিদ্ধান্তের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল। পরিব্রাজকজীবনে যখন পোরবন্দরে পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙের বাটীতে শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নাম বিবিদিষানন্দ) সহিত তাঁহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙের সহিত যেদিন অদ্বৈতবেদান্তের পক্ষ লইয়া স্বামী অভেদানন্দ অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বিচার করেন, সেই দিনটি সত্যই স্মরণীয়। সেই বিচারনিষ্ঠা ও অদ্বৈতবেদান্তের প্রতি অসামান্য অধিকার দেখিলে কেহই চিন্তা করিতে পারিত না যে, স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার পরমাচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবপূজিত শ্রীশ্রীভবতারিণী মহাশক্তির নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবীও ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের চক্ষে সাক্ষৎ মহাশক্তিরূপিণী মহাকালী। সেইজন্য স্বদেশে ও বিদেশে যেখানেই তিনি থাকিতেন, শ্রীমার আদেশ না লইয়া কোন কার্য করিতেন না। এখানে অদ্বৈতবেদান্তের মায়া বা শক্তি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের হৃদয়াসন অধিকার করিতে পারে নাই, তিনি তাঁহার আচার্যদেবের লীলাকেন্দ্ররূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী নিত্যা মহাশক্তিকেই অন্তরের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য বিশ্বরূপিণী মা সারদা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দের চির-আরাধ্যা দেবীপ্রতিমা।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন : "শ্রীমার অজস্র আশীর্বাদ ও করুণা আমার উপর ছিল। শ্রীমা ছিলেন সকলেরই করুণাময়ী মা।

তিনি ছিলেন সরলা বালিকার মতো। বাইরের লোকের কাছে নিতান্ত লজ্জাশীলা, কিন্তু ভক্ত-সন্তানদের নিকট সর্বদাই হাস্যময়ী। শ্রীমা থাকতেন স্বভাবত অতি সাধারণভাবে, মনে হ'ত দুনিয়ার কোন-কিছুই তিনি জানেন না। কিন্তু আসলে তাঁর ছিল ত্রিকালদর্শী চক্ষু; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্তই তিনি দেখতে পেতেন। তাই অসামান্যা বুদ্ধিমতী ও মহীয়সী নারী ছিলেন শ্রীমা, অথচ ছিলেন তিনি সকল ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরবিহীনা। এতটুকু অলৌকিক শক্তির বিকাশ তাঁর মধ্যে কখনো কেউ দেখেনি। শ্রীশ্রীঠাকুরেরও জীবনে কিছু-কিছু ঐশ্বর্যের প্রকাশ ছিল বটে, কিন্তু শ্রীমা ছিলেন সর্বৈশ্বর্যবিহীনা। সকল ঐশ্বর্য ও শক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলেন। কি মহিয়সী নারী না ছিলেন শ্রীমা! 'তং দুর্দর্শং গূঢ়ম্'—দুর্বিজ্ঞেয় ও অতীব নিগূঢ় ছিল শ্রীমার ভাব ও প্রকৃতি।"

আলমবাজার মঠে থাকিতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সুললিত ছন্দে সংস্কৃতে 'শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্' নামে একটি স্তোত্র রচনা করিয়া শ্রীমাকেই প্রথম পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। স্তোত্রটি হইল,

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং, নবরূপধরাং জনতাপহরাং।
শরণাগতসেবকতোষকরীং, প্রণামামি পরাং জননীং জগতাম্॥
গুণহীনসুতানপরাধযুতান, কৃপায়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং, প্রণামামি পরাং জননীং জগতাম্॥
বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা, চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাং।
পিব ভৃঙ্গমনো ভবরোগহরাং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥
কৃপাং করু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে॥

*　　*　　*　　*

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদগুরুং।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥[১]

সংস্কৃত স্তোত্রটি যখন অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে শুনাইয়াছিলেন তখন শ্রীমা আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "তোমার মুখে সরস্বতী বসুক"। তখন অমূল্য সম্পদ-স্বরূপ একটি রুদ্রাক্ষের মালাও জপের জন্য স্বামী অভেনানন্দ মহারাজকে শ্রীমা দান করিয়াছিলেন, যেই মালা ছিল চিরকালের জন্য অভেদানন্দ মহারাজের সুখে-দুঃখে ও বিপদে-সম্পদে রক্ষাকবচের ন্যায়। সত্যই সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে শ্রীসারদাদেবী রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহার উল্লেখ করিয়া তিনি আনন্দে প্রায়ই বলিতেনঃ "মূকং করোতি বাচালং—আমার মতো মূককেও শ্রীমা বাচাল করিয়াছিলেন। নইলে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি শিক্ষা-সংস্কৃতিবান দেশগুলিতে বিদগ্ধ পণ্ডিত-সমাজ ও খ্রীষ্টান-পাদরীদের নিকট হইতে আমার মতো নগণ্য একজন ভারতবাসী কি কখনও সাফল্যের জয়টীকা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সমস্তই করুণাময়ী শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেনঃ "ও সারদা, ও রূপ ঢেকে এসেছে,—জ্ঞানদায়িনী, সাক্ষাৎ সরস্বতী।" স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীসারদাদেবীকে ঠিক ঐভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াই অন্তরের নিবিড় শ্রদ্ধা দিয়া ভক্তি করিতেন এবং সেজন্যই তিনি শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রে শ্রীমা সারদার অপার্থিব ভাব ও মাধুর্য অত সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহের আহ্বানে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রথমে লণ্ডনে ও পরে আমেরিকায় (১৮৯৭

১। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত 'স্তোত্ররত্নাকর' দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টাব্দে) ভারতের বেদান্ত ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিক বাণী ও আদর্শ-প্রচারের জন্য গমন করেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে একবার তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি নিরামিষ আহার করিতেন, অথচ তাঁহাকে দিবারাত্র অত্যধিক কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহার চিকিৎসক ডাঃ জেন্স স্বামীজী মহারাজের আহারের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন: "স্বামীজী, এদেশে ওসব করা চল্‌বে না। আপনি যখন রোমে যাবেন তখন আপনার রোমবাসীদের মতোই থাকা-খাওয়া উচিত। আপনার জীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কাজেই পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া আপনার পক্ষে দরকার, তা না হ'লে আপনি কঠিন অসুখে পড়ে যাবেন।" ডাঃ জেন্সের যুক্তিপূর্ণ উপদেশ অভেদানন্দ মহারাজ স্বীকার করিলেও নানা কারণে ঠিক পালন করিতে পারেন নাই। তিনি যথার্থ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য শ্রীমার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীমাকে তিনি চিরদিনই তাঁহার জীবনের কর্ণধার শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় দর্শন করিতেন এবং বলিতেন শিব ও শক্তি যেমন অভেদ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা তেমনি এক ও অভিন্ন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা নামে ও রূপে ভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও স্বরূপে অভিন্ন। তিনি আপনার স্বাস্থ্যের কথা লিখিয়া আমিষ আহার করিবেন কিনা তাহার জন্য অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া শ্রীমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রীমা তখন বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়ীতে থাকিতেন। আমেরিকা হইতে অভেদানন্দ মহারাজের পত্র পাইয়া শ্রীমা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন ও স্নেহের সন্তানের অসুস্থতার সংবাদে তাঁহার দেহ ও মন বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অভেদানন্দ মহারাজকে আমিষ আহার করিবার জন্য অনুমতি দিয়া আশীর্বাদ-পত্র লিখিয়াছিলেন:

"৮।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
মার্চ, ১৮৯৯

"কল্যাণবরেষু,

গতকাল তোমার এক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার কার্য ভালরূপ হইতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখোজ্জ্বল করিতেছ। শ্রীঠাকুরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি এবং আশীর্বাদ করিতেছি যাহাতে তোমার কার্য সফল হয়। তিনি তোমার এই মহৎ কার্যে সহায় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আহারাদি সম্বন্ধে তাদৃশ কঠোরাদি করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ ভোজন না করিয়া উত্তম মৎসাদি আহার করিবে। তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে।

—ইতি তোমাদের মা।"

অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমার আশীর্বাদসিক্ত আদেশপত্র পাইয়া আমিষ আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কিন্তু বলিতেন, আহারে আচার-বিচার ও বিধি-নিষেধ যে অপরিহার্য তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবও স্বীকার করিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: "শূকরমাংস খেয়েও যদি ভগবানে নিষ্ঠা হয়, তবে তাই শুদ্ধ আহার, আর নিরামিষ আহার করে যদি ঈশ্বরে মতি না আসে, তবে তাকে অশুদ্ধ আহার বলতে হবে।" শ্রীমার অভিমতও ঠিক অনুরূপ ছিল। তিনি বলিতেন, আহারে-বিহারে বিচার অপেক্ষা অন্তরের শুচিতা, ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠাই জীবনে প্রয়োজনীয়। সেইজন্য শ্রীমা তাঁহার সন্তান ও ভক্ত-শিষ্যগণকে আমিষ আহার করিতে ঢালা হুকুম দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন: "বাঙলাদেশে মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে সাধন-ভজন করবি,

তাতে যদি কোন পাপ হয় তো আমার।” শ্রীমা অধ্যাত্মসাধনার প্রয়োজনই বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন, সামাজিক আচার-বিচার সমাজশৃঙ্খলার জন্য, আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য তা অপরিহার্য নয়। ভক্ত ও সন্তানগণের সকল-কিছু অক্ষমতা ও জ্বালা-যন্ত্রনার ভার সেইজন্য শ্রীমা স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য ধর্মসাধনায় অনুদার ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব শ্রীমা কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, সকলের মধ্যে নারায়ণ রহিয়াছেন, সুতরাং নারায়ণের অধিষ্ঠানে দেহ-মন্দির কখনও অশুদ্ধ হইতে পারে না। দেহী বা শরীরীর জন্যই তো দেহ বা শরীরের সার্থকতা, সুতরাং দেহী বা শরীরী আত্মার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি ও নিষ্ঠা রাখিবে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকা হইতে শ্রীমাকে প্রায়ই পত্র লিখতেন এবং শ্রীমাও উত্তরে আশীর্বাদ-বাণী পাঠাইতেন। প্রাগের প্রখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও পরে শ্রীসারদাদেবীর এক একখানি তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্র তিনি দুইখানি অঙ্কন করিয়াছিলেন, একটি বাষ্ট অর্থাৎ বুক-পর্যন্ত এবং অন্যটি দাঁড়ানো। প্রথমোক্ত বাষ্ট তৈলচিত্রটি তিনি উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নামে পাঠাইয়া দেন এবং শেষোক্ত দাঁড়ানো তৈলচিত্রটি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে উপহার প্রদান করেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঐ তৈলচিত্রটি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন, কেননা বলিতে গেলে শিল্পী ঐ দাঁড়ানো ধ্যানস্থ তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন স্বামী অভেদানন্দেরই একান্ত সহায়তায়। অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ দাঁড়ানো তৈলচিত্র হইতে একটি প্রতিচিত্র বা ফটো তৈয়ারী করাইয়া শ্রীমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। সেই প্রতিচিত্রের সহিত তিনি শ্রীমাকে একটি পত্রও লিখিয়াছিলেন (ইংরাজী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল)। মর্মন্তুদ বিষয় যে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেন এবং এই কথাও অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। পত্রে অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে লিখিয়াছিলেন,

বেদান্ত আশ্রম
১৮ই এপ্রিল

পরম শ্রদ্ধনীয়া শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ-কমলেষু

মা, বহুকাল হইল আপনার শারীরিক কুশল সংবাদ পাই নাই। আশাকরি আপনি ভাল আছেন। শ্রীশ্রী গুরুদেব তাঁহার প্রিয় সন্তান গুলিকে একে একে টানিয়া লইতেছেন কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাপেক্ষা দুঃখ আর কি হইতে পারে?

শ্রীশ্রী গুরুদেবের এক পরম ভক্ত তাঁহার প্রতিমূর্তি আঁকিয়া আমাকে পাঠাইয়া দেন। এই ছবির ফটো প্রায় আপনার জন্য পাঠাইতেছি

আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র
উপহার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ
করিবেন ইহাই আমার প্রার্থনা,
আপনার আশীর্বাদে আমি
ভাল আছি। আমার সাষ্টাঙ্গ ও
সভক্তি প্রণাম জানিবেন এবং
আশীর্বাদ করিবেন। আপনার
কুশল সংবাদ লিখিয়া খুসী
করিবেন। অধিক আর কি লিখিব

— ইতি আপনার
দাসানুদাস
কালী
অভেদানন্দ

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী
সারদা দেবী

For Sârada Devi.
C/o Swami Saradananda
Udbodhan Office
Baghbazar P.O.
Calcutta India

সুদূর আমেরিকা হইতে পত্রসহ একজন বিদেশী ভক্তের অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৈলচিত্রের প্রতিকৃতি পাইয়া শ্রীমা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে আশীর্বাদ দিয়া একটি উত্তরও দিয়াছিলেন।

ফ্রাঙ্ক ডোরাক্-অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৈলচিত্রটি সৃষ্টিশীল শিল্পীমনের এক বিস্ময়কর রচনা। ধ্যানদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং জানিতে পারেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট ঐ পুরুষ ভারতের একজন মহামানব। পরে পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার-লিখিত 'লাইফ য়্যাণ্ড সেইংস্ অব রামকৃষ্ণ' (ইংরাজী) গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রতিকৃতি দেখিতে পাইয়া তিনি বিস্মিত হন এবং জানিতে পারেন যে, ইনিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাহারপর তিনি স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে পত্র লিখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন ধরণের ফটো চাহিয়া পাঠান। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিন রকমের তিনটি ফটো পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে দাঁড়ানো সমাধিস্থ ছবিটী চিত্রে রূপদানের জন্য মনোনয়ন করেন। শিল্পীকে প্রেরিত দাঁড়ানো ঐ ছবিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চক্ষু মুদ্রিত ছিল বলিয়া শিল্পী কয়েকদিন একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, চক্ষু-দুইটি উন্মুক্ত থাকিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের ভাব ও মাধুর্য কিরূপ হইবে, কেননা শিল্পীর ইচ্ছাই ছিল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উন্মুক্ত চক্ষুর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিবেন। শিল্পী সেইভাবে ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ ধ্যানদৃষ্টিতে (vision) দর্শন করিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উন্মুক্ত চক্ষু ও প্রশান্ত মুখচ্ছবি। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অভিমত যে, সাধক-শিল্পী ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে উন্মুক্ত চক্ষুযুক্ত জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন তাহা শিল্পীর বিষয়ী-

মনের (subjective mind) বহিঃপ্রতিফলন বিষয়-মনের (objective mind) আকারে আকারিত হইয়াছিল। শিল্পী ভাবচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসন্নোজ্জ্বল মুখ হইতে প্রখর অথচ প্রশান্ত কিরণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহার চক্ষু-দুইটি উন্মুক্ত ছিল এবং অফুরন্ত প্রেম ও করুণার ভাব চক্ষে মাখানো ছিল। তাহাছাড়া একান্ত উদাসীন ও ব্রহ্মনিবদ্ধ ছিল দুইটি চক্ষু। সুতরাং সার্থক হইয়াছিল শিল্পীর ধ্যানচিন্তা। তিনি তুলিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসন্ন-দীপ্ত মূর্তির রূপদান করেন। শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন, শিল্পী ভারতীয় আদর্শে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মতো জীবন-যাপন করিতেন। ত্যাগ ও ধ্যানমুখী ছিল তাঁহার মন, সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ প্রসন্নোজ্জ্বল কল্যাণ-মূর্তি অঙ্কন করা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৈলচিত্র অঙ্কন করিবার পর শিল্পী শ্রীসারদাদেবীরও একটি ভাবস্নিগ্ধ তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। অঙ্কন করিবার পূর্বে শ্রীমার যে আলোকচিত্রটি শিল্পী পছন্দ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীমার মুখ ও চোখের দৃষ্টি ছিল দক্ষিণদিকে নিবদ্ধ। শিল্পী তৈলচিত্র অঙ্কন করিবার সময় শ্রীমার মুখটিকে সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বর্ণমাধুর্যের দিক দিয়া শ্রীমার তৈলচিত্রের শান্ত-স্নিগ্ধ মধুরভাবের তুলনা নাই। অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন, শ্রীমার তৈলচিত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্র অপেক্ষাও কতকগুলি অংশে শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কমনীয়তা ও স্নিগ্ধ-লালিত্যের (softness) সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও স্বর্গীয় ভাবের অভিব্যক্তি শ্রীমার চিত্রটিতে যেন আরো সুস্পষ্ট। সত্যই শ্রীমার চিত্রে অফুরন্ত করুণা, প্রেম ও মাতৃভাবের বিকাশ লক্ষ্য করার বিষয়। শ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না, সুতরাং নারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্বের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য একই সঙ্গে চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমার স্তোত্রে (শ্রীশ্রীসারদাদেবী-

স্তোত্র) অভেদানন্দ মহারাজ তাই চক্ষুষ্মান কাব্যশিল্পীর ন্যায় লিখিয়াছেন—

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥
স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণী করোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥

রসরাজ অমৃতলাল বসু শ্রীমার স্তোত্রে 'দোষান্ অশেষান্ সগুণী করোষি' শব্দগুলি পড়িয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে একদিন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন: 'স্বামীজী, শ্রীমার উদ্দেশ্যে আপনার রচিত অন্ততঃ এই অংশটি চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। সত্যই করুণাময়ী শ্রীমা আমাদিগের সকল দোষকে সকল সময় ক্ষমা করিয়া গুণ বলিয়া দর্শন করিতেন। যথার্থ ক্ষমাসুন্দরমূর্তি ছিলেন শ্রীসারদাদেবী। অহেতুক ছিল তাঁর করুণা ও ভালবাসা এবং তাহারই জন্য পাপী-তাপী জ্ঞানদৈন্য আমরা শ্রীমার শ্রীচরণে স্থান-লাভের অধিকার পাইয়াছিলাম। রসরাজের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত এই উক্তিকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি।

শুধুই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর চিত্র বা প্রতিকৃতি নয়, সকল দেবদেবীর বিগ্রহ বা চিত্র সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দৃষ্টি ও অভিমত ছিল। তিনি বলিতেন, দেবদেবীদিগের মূর্তি হওয়া উচিত যৌবনমাধুর্যপূর্ণ, কমনীয় এবং করুণা ও শান্তির ভাবপ্রকাশক। বৃদ্ধ বয়সের শিথিল মাংসযুক্ত বা রোগ-জর্জরিত দুঃখভাবযুক্ত কোন মূর্তি বা চিত্রের রূপদান করা শিল্পীর কর্তব্য নয়। দক্ষিণাকালিকা ভয়ঙ্করী হইলেও কল্যাণী ও বরাভয়করা।

শ্রীসারদাদেবীর মূর্তির রূপ ও প্রকৃতি তদনুরূপ হওয়া উচিত। শ্রীমা সারদার চিত্র বা প্রতিকৃতি হইবে নবযৌবনসম্পন্না, কল্যাণী ও শান্তিময়ী। প্রাচীন তৈলচিত্রে (ফ্রেস্কো) ও ভাস্কর্যে দেবীমূর্তির প্রতিফলন সত্যই অনিন্দ্যসুন্দর। প্রস্তরে খোদিত প্রাচীন দেবদেবীদের মূর্তির অঙ্গসৌষ্ঠব অপরূপ লালিত্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত। শিল্পী ডোরাকের অঙ্কিত শ্রীসারদাদেবীর তৈলচিত্রে একাধারে দেবীভাব ও মাতৃভাবের প্রকাশ সুস্পষ্ট। অপূর্ব লাবণ্য ও স্নিগ্ধতা যেন শ্রীমার সমগ্র চিত্রে প্রস্ফুটিত। শিল্পী ডোরাক্ ভারতবাসী না হইলেও ভারতের অন্তর ও প্রাণপুরুষের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা-শুশ্রূষাও অভেদানন্দ মহারাজ কম করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কাশীপুরে ও শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাটীতে অসুস্থ, তখন তিনি দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পরিচর্যাদি করিতেন। তাহাছাড়া শ্রীমার কাছে কাছে থাকিয়া অভেদানন্দ মহারাজ যতটুকু সম্ভব তাঁহার (শ্রীমার) কার্যে সাহায্য করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণও শ্যামপুকুরের বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য সর্বদা নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর সন্তানদিগের প্রতি স্নেহ-আকর্ষণের প্রসঙ্গে 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেনঃ "শ্রীমার দয়ার কথা ভোলা যায় না, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার ভালবাসার কথা তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তারি জন্য আমরা সকলে মাতাপিতার স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে ব্রহ্মবিদ্‌বরণ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসার কথা কি আর বলবো। সেই ভালবাসার সত্যই তুলনা হয় না। সেই ভালবাসার টানে পড়েই আমরা সংসারের সব-কিছু ছাড়তে পেরেছিলাম। তাঁর ভালবাসার সান্নিধ্য ছেড়ে এক মুহূর্তও দূরে সরে থাকতে কোনদিনই ইচ্ছা করতো না। এমনি

ছিল তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) ভালবাসার আকর্ষণী শক্তি। মৌমাছি যেমন ফুলের মধু ছেড়ে দূরে থাকতে পারে না, কেবলি মধুপান করিতে চায়, সে রকম হয়েছিল আমাদের সকলেরই। আর কেন জানো? শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের ভালবাসার মধ্যে এতটুকু স্বার্থমিশ্রিত ছিল না, বরং ছিল এক নিঃস্বার্থ ও স্বর্গীয় আনন্দের স্পর্শ এবং তারি জন্য আমরা সকলে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।”

স্থান-পরিবর্তনের জন্য শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া যাওয়া হইল, তখন শ্রীমাও সঙ্গে গিয়াছিলেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা ও পথ্য প্রভৃতি বিষয়ের ভার পূর্ববৎ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিবার জন্য ডাক্তাররা তাঁহাকে কচি-পাঁঠার মাংসের ক্বাথের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডাক্তারদিগের খাদ্যের ব্যবস্থা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ত্যাগী সন্তানদিগকে একদিন ডাকিয়া বলিয়াছিলেন: “দ্যাখ্, তোরা যে দোকানে কষাই-কালীর প্রতিমা দেখ্‌বি, সেই দোকান থেকে মাংস কিনে আন্‌বি।” সুতরাং কোনদিন স্বামী অভেদানন্দ ও কোনদিন বা স্বামী অদ্ভুতানন্দ পরমহংসদেবের জন্য দেবী-নিবেদিত মাংস আনিয়া শ্রীমার নিকট দিতেন এবং শ্রীমা তাহার ঝোল তৈয়ারী করিয়া ও ছাঁকিয়া ক্বাথটুকু শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন। গুগ্‌লির ঝোল খাইবার জন্যও চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমা গুগ্‌লির ঝোল তৈয়ারী করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন: “আমি খাব, আমার জন্য রাধবে, তাতে কোন দোষ হবে না। ছেলেরা পুকুর থেকে গুগ্‌লি এনে তৈরী করে দেবে, আর তুমি রান্না করবে।” সুতরাং সেইদিন হইতে অভেদানন্দ মহারাজ নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে গুগ্‌লি সংগ্রহ করিয়া, খোলা ভাঙ্গিয়া ও রন্ধনের উপযুক্ত করিয়া শ্রীমার নিকট দিতেন এবং

শ্রীমা গুগ্‌লির ঝোল তৈয়ারী করিয়া ভাতের মণ্ডের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব লোকশিক্ষার জন্য নিজের শরীরে কঠিন রোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া রোগকে উপলক্ষ্য ও সন্তানদের সেবা-পরিচর্যাকে কেন্দ্র করিয়া লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন শ্যামপুকুরবাটীতে ও কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে। তাই সর্বত্যাগী সন্তান ও ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর নিকট সমবেত হইয়াছিলেন ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘশরীরে জীবন সঞ্চার করিবার জন্য।

একদিন কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে থাকাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্তানদিগকে ভিক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন: "ভিক্ষান্ন পবিত্র। তোরা আমার জন্য ভিক্ষা করিতে পারিস?" স্বামী বিবেকানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, হুটকো গোপাল ও স্বামী অভেদানন্দ-প্রমুখ সন্তানরা আনন্দ-সহকারে বলিলেন: "হ্যাঁ, আপনার জন্য নিশ্চয়ই পারবো।" শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বদনমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশ ও সন্তানগণের এই ভিক্ষাপ্রচেষ্টাকে ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজীবন-গঠনের পূর্বসূচনা বলিতে হইবে। ত্যাগী সন্তানরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ লইয়া অন্যত্র ভিক্ষা করিতে যাইবার পূর্বে প্রথমেই নীচে শ্রীমার নিকট ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমা সারদা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, বিশ্ববাসীকে তিনি অন্নদান করেন। শ্রীসারদাদেবী বিশ্বপালিনী এবং বিশ্বের কারণ ও আধাররূপিণী। তিনি দেখিলেন, তাঁহার বৈরাগ্যদীপ্ত সন্তানগণ ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে ও তাঁহারা প্রথমেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সন্তানরা শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি॥

রাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী শ্রীমা প্রসন্ন হইয়া হাসিমুখে তাঁহাদিগকে

মুষ্টিভিক্ষা দিলেন। সন্তানগণ অবনত শিরে শ্রীমার পদধূলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হইলেন। বিশ্বরূপিণী শ্রীমা দিব্যদৃষ্টিতে সেইদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘসৌধের আকাশচুমী চূড়া, সেইজন্য সমবেত ত্যাগব্রতী সন্তানদিগের সকল ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলে নানান্ বিদ্রূপের বাণী সহ্য করিয়াও সংযতচিত্তে সকল-কিছু অভিমান ত্যাগ করিয়া 'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ কবিলেন এবং ভিক্ষাদ্রব্য আনয়ন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে সমর্পণ করিলেন। সেইদিন ভিক্ষাদ্রব্য দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের আর সীমা ছিল না। তিনি ঐ ভিক্ষার চাউল শ্রীমাকে রন্ধন করিতে বলিলেন এবং অন্নপূর্ণারূপিণী শ্রীমা চাউল রন্ধন করিয়া প্রথমে গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রদান করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভিক্ষান্ন মুখে দিয়া বলিলেন: "ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র। এতে কারু কোন কামনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরমানন্দ লাভ করলাম।" শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রহণের পর সন্তানগণ তাঁহার প্রসাদ পরমপরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিলেন।[১] ত্যাগব্রতীদের সন্ন্যাসজীবনের কৃচ্ছ্র সাধন, সংযম, তিতিক্ষা, অভিমানরাহিত্য, আত্মনির্ভরতা ও সর্বোপরি ঈশ্বরবিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা সেইদিন সমাপ্ত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং পরীক্ষক ও করুণাময়ী শ্রীমা সেই অগ্নিপরীক্ষার জ্বলন্ত সাক্ষী ও দ্রষ্টা। সেইদিনের স্মরণীয় ভিক্ষাব্রত শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদিগের পরবর্তী অধ্যাত্মসাধনার জীবনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর একমাত্র মুষ্টিভিক্ষালব্ধ অন্নই মহাত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদিগের অবলম্বন হইয়াছিল এবং ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহারা আনন্দে তাঁহাদিগের পরমারাধ্য আচার্যদেবের নির্দেশিত ধারায় ও আদর্শে সাধন-ভজন করিয়া জীবনসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির

১। স্বামী অভেদানন্দ: 'আমার জীবনকথা' (১ম সংস্করণ), পৃঃ ১০২-১০৩ দ্রষ্টব্য।

পর শ্রীমা তিনদিনমাত্র কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ও সপ্তাহকাল বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে শোকভারাক্রান্ত শরীর ও মন লইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীমা তীর্থভ্রমণে বর্হিগত হইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন, আর সঙ্গে ছিলেন যোগানন্দ মহারাজ, লাটু মহারাজ, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি ও মাষ্টার মহাশয়ের পত্নী। প্রথমে তাঁহারা দেওঘর ও দেওঘর হইতে কাশী গমন করেন। কাশীতে বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়া শ্রীমা যখন বাসায় ফিরিতেছিলেন তখন দিব্যভাবের অবস্থায় তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন। সত্যই কাশীধামে বিশ্বনাথ-শিব ও দেবী অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিবার সময় শ্রীমা মহাভাবে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং কাশী-বিশ্বনাথ ও দেবী অন্নপূর্ণার প্রসন্ন-গম্ভীর মূর্তি দিব্যদৃষ্টিতে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থভ্রমণের সময় একদিন ট্রেনে যখন শ্রীমা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেনঃ "ওগো, হাতে (শ্রীশ্রীঠাকুরের) ইষ্টকবচ অমন করে রেখেছ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলতে পারে।" তন্দ্রাচ্ছন্নতা বিদূরীত হইলে শ্রীমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কবচটি হাত হইতে খুলিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিলেন।

অভেদানন্দ মহারাজ প্রভৃতি সকলে শ্রীমাকে লইয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অতিবাহিত করিবার সময় একদিন শ্রীমা রাধার বিরহভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং শ্রীরাধা যেমন তাঁহার প্রাণ-প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুল হইতেন, তেমনি শ্রীমাও তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-লীলাস্থল নিধুবন, রাধারমণের মন্দির, যমুনাপুলিন প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে প্রেমাশ্রুধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও

শ্রীরাধার অতীত লীলাস্মৃতি যেন সেইদিন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগের মানসচিত্র দেখি পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ-রচিত এই গানটির প্রতিটি ছত্রে—

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা-প্রবাহিণী।
(ও যার) বিমলতটে, রূপের হাটে,
বিকাত নীলকান্তমণি ॥

* * *

কোথা চারু-চন্দ্রাবলি, কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ;
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী বামেতে রাই
বিনোদিনী। প্রভৃতি

সত্যই বৃন্দাবনের পবিত্র ধূলিকণায় আজিও জড়িত রহিয়াছে দ্বাপরের সেই অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণলীলার পুণ্যস্মৃতি। শ্রীমা সারদাদেবী বৃন্দাবনে অতীতের সেই লীলামাধুর্য ভাবচক্ষে দর্শন করিয়াই আত্মসমাহিত হইয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন, বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিবার সময় আর একটি স্মৃতিজড়িত ঘটনার কথা বলি। শ্রীমাকে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেনঃ “যোগীনকে (যোগানন্দ মহারাজ) তুমি ইষ্টমন্ত্র দান করবে।” শ্রীমা প্রথমে ঐ স্বপ্নাদেশের মর্ম ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নাই এবং সেজন্য যোগীন স্বামীকে মন্ত্রদান-সম্বন্ধে তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে পুনরায় একদিন স্বপ্নে স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষা দান করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন শ্রীমা একটু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সেইবারেও সন্দেহযুক্ত হইয়া তিনি প্রিয় সন্তান যোগানন্দকে দীক্ষা দিবেন—কি দিবেন না তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পরে পুনরায় একদিন যখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে স্বপ্নে ঐ দীক্ষাদানের জন্য আদেশ করিলেন

তখন শ্রীমা অবনতমস্তকে তাঁহার আরাধ্যদেবতার আদেশ পালন করিলেন ও একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া পূজা করিতে করিতে তিনি যোগানন্দ স্বামীকে মন্ত্রদান করিলেন। ইহাই শ্রীমায়ের প্রথম মন্ত্র দীক্ষাদান।

'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে অভেদানন্দ মহারাজ পুনরায় লিখিয়াছেন, শ্রীমা যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির শোকে মুহ্যমান তখন শ্রীমা নিজের হাতের বালা খুলিয়া ফেলিবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি হাতের বালা খুলিতে যাইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে শ্রীমা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলশরীরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে হাতের বালা খুলিতে নিষেধ করিতেছেন ও বলিতেছেন : "আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর।" শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়-বাণী পাইয়া হাতের বালা আর খুলিতে পারেন নাই, কেননা শ্রীমা ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব শরীরের অদর্শন হইলেও দিব্যশরীরে তিনি সর্বদাই সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। সেই সময় হইতে শ্রীমা লাল নরুণপেড়ে কাপড় পরিতেন এবং হস্তে বালা পরিধান করিতেন।

স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, শ্রীমার অমৃত চরিত্রের কথা ভাবিবার ও বলিবার সময়ে চক্ষের সম্মুখে মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিত অপরূপ একটি দৃশ্যের স্মৃতি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পরদিন শ্রীসারদাদেবী যখন শোকে একান্ত কাতর হইয়া 'মা কোথায় গেলি গো' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন তখন সেই নিদারুণ দৃশ্য দেখিলে পাষাণ গলিয়া যায়। সর্বত্যাগী সন্তানগণ এবং ভক্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীরা কাশীপুর-উদ্যানবাটীর গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া চক্ষের জল মুছিতেছিলেন এবং পরমাশ্চর্যময় পতির উদ্দেশ্যে আশ্চর্যময়ী পত্নীর মুখে 'মা কোথায় গেলি গো' বাণী শুনিয়া সেইদিন বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করিতেন ও

শ্রদ্ধা করিতেন এবং শ্রীমা সারদাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'মা কালী' বা মহাশক্তির অবতার বলিয়া মাঝে মাঝে সম্বোধন করিতেন। অলৌকিক পতি-পত্নীর অনন্যদৃষ্ট মধুর সম্পর্ক সাধারণ মানুষের নিকট চিরকালই অজ্ঞেয় ও বিস্ময়ের বস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরা প্রত্যক্ষ করিলেন, শ্রীমা যখন অশ্রুসিক্ত নয়নে হস্তের বালা খুলিতে গিয়াছিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অশরীরী বাণীতে শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন: "এ' তোমার ক্যামন বুদ্ধি গো? আমি কি গেছি? যেমন এ'ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া। আমি তো সদাসর্বদা তোমার সঙ্গে আছি।" এই সকল ঘটনা হইতে মনে হয়, শ্রীভগবানের পৃথিবীলোকে লীলা সার্থক হয় না তাঁহার চিরসঙ্গিনী শক্তিকে না লইয়া, কেননা লীলাচঞ্চলা শক্তিকে বাদ দিয়া নিত্যস্বরূপ শিবের সৃষ্টিবিলাস অসম্ভব। তাহা ছাড়া শক্তিরই তো অবতার; নির্গুণ অচঞ্চল ব্রহ্ম-চৈতন্যের লীলা ও বিকাশ অসম্ভব। মায়া বা মহামায়াই মহাশক্তি এবং এই মায়া বা মহামায়াই তন্ত্রের সচ্চিদানন্দময়ী কালী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর দিব্যপ্রকাশেই শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা প্রকাশমান ছিলেন। ইহা যেন শক্তির মধ্যেই শিবের জ্যোতির্ময় প্রকাশ। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকাশ সার্থক বা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল আদ্যাশক্তিরূপিণী শ্রীমা সারদার মধ্যে। কিন্তু মায়ার সংসারে মিলন-বিচ্ছেদের লুকোচুরি-খেলা না থাকিলে লীলার মাধুর্য তো প্রকাশ পায় না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ-আশ্বাস ও অশরীরী বাণী লাভ করিয়াও শ্রীমা মাঝে মাঝে হতাশ ও অধীর হইয়া পড়িতেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিবার সময়ে শ্রীমা দ্বিধা মন লইয়া পুনরায় হাতের বালা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইবারেও তিনি বাধা পাইয়াছিলেন, কারণ অকস্মাৎ করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলশরীরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন: "তুমি হাতের বালা খুলো

না। শ্রীকৃষ্ণ যার পতি, তার বিধবা হওয়া ভাগ্যে নাই। সে চিরসধবা।" শ্রীমা পরিশেষে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাছাড়া প্রতিপদে শ্রীমা অনুভব করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় সর্বদা বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীমার সহিত বৃন্দাবনে বাস করিবার সময় অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমার পদধুলি লইয়া একাকী বৃন্দাবনের সকল স্থান দর্শন ও চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন ও পরিক্রমার পর শ্রীমাকে সকল কথা তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া অভেদানন্দ মহারাজ বরানগরের (কলিকাতা) নূতন মঠে ফিরিবেন সংকল্প করিয়া শ্রীমার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমাও সানন্দে তাঁহাকে বরানগর মঠে ফিরিবার জন্য অনুমতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বহির্গত হইবেন এমন সময়ে যোগানন্দ মহারাজ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, শ্রীমার আদেশ— মাষ্টার মহাশয়ের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় পৌছিয়া দিতে হইবে। একদিকে যোগানন্দ স্বামীর কথা ও অপর দিকে শ্রীমার আদেশ শুনিয়া অভেদানন্দ মহারাজ বিশেষ চিন্তিত হইলেন, কারণ মাষ্টার মহাশয়ের পত্নীর মস্তিষ্ক তখন কিছুটা বিকৃত ছিল।

সুতরাং বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষকে লইয়া পথে ভ্রমণ করায় বিপদ ঘটিতে পারে। কিন্তু শ্রীমার আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য অভেদানন্দ মহারাজের ছিল না। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে ভাবিয়া তিনি শ্রীমার পদধুলি গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে চলিলেন মাষ্টার মহাশয়ের পত্নী। শ্রীমার কৃপায় পাগলিনী পথে কোন-কিছু উপদ্রব করেন নাই। হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীম-র পত্নীকে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে পৌছাইয়া দিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, বিপদতারিণী বিশ্বরূপিণী শ্রীমা যাহার সহায় তাহার আবার বিপদ কী হইতে পারে!

একবার একজন ভক্ত অভেদানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "শ্রীসারদাদেবী কে ?" তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীমার নিকট প্রার্থণা করিলে ধ্যানের সময় তিনি তাহা বুঝাইয়া দিবেন। তাহার পর তিনি সাধক রামপ্রসাদের নিদর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন,

কে জানেরে কালী কেমন,
ষড়্দর্শনে না পায় দরশন।

অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী কালীকে বুঝিতে গিয়া শিব পাগল হইয়াছেন। শ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধেও ঠিক ঐ এককথা। পুনরায় ঐ গানটির অপরাংশের তুলনা দিয়া বলেন,

সাকার সাধকে তুমি সাকারা,
নিরাকার-উপাসকে নিরাকারা।
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়,
সেও তুমি তারা ত্রিকালবর্তিনী।
যে-অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে-অবধি সে পরব্রহ্ম কয় ;
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়
সেও তুমি তারা ত্রিলোকব্যাপিণী।'

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন, গানটির যথার্থ মর্ম বুঝিতে পারিলে আদ্যাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। "কেবল intellect বা বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে (ব্রহ্মময়ী শ্রীমাকে) বোঝা যায় না। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি অভিন্ন, তেমনি ব্রহ্ম ও মায়া এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীসারদাদেবী এক ও অভিন্ন। মায়া আসলে পরমেশশক্তি। তিনি আবার বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী। শুদ্ধ মন ও অশুদ্ধ মন-রূপেও তিনি সকলের মধ্যে প্রকাশমান। অবিদ্যার দুই শক্তি, আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি দিয়ে তিনি সত্য বা যথার্থ বস্তুকে আবৃত করেন ও বস্তুর যথার্থ রূপকে

জানতে দেন না, আবার বিক্ষেপশক্তি দিয়ে সত্যের সপ্রকাশ রূপকে তিনি পুনরায় প্রকাশ করেন।"

ত্বমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম-আচ্ছাদিনী,
মহামায়ারূপে ত্রিজগৎমনমোহিনী।"

অভেদানন্দ মহারাজ পুনরায় বলিয়াছেন: "শ্রীমা সারদা সাক্ষাৎ মহামায়া। সুতরাং তাঁর কৃপা না হলে সংসারের মায়া-মোহ কাটে না, বিবেক-বৈরাগ্য আসে না ও জ্ঞানচক্ষু খোলে না। তাই তাঁর উপাসনা করতে হয়, তাঁকে প্রসন্ন করতে হয় এবং তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কৃপা হলে তিনি সচ্চিদানন্দরূপী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে দেন। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা কর তাঁর কৃপা পাবার জন্য।" শ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের দিব্যদৃষ্টি ও ধারণা এই সকল কথা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

।। শ্রীমা সারদা ও স্বামী যোগানন্দ ।।

শ্রীমা সারদার আর একজন পরমস্নেহের সন্তান স্বামী যোগানন্দ মহারাজ। বলিতে গেলে তিনিই সন্তানদিগের মধ্যে প্রথমে শ্রীমার দেখাশুনার ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যতদিন-পর্যন্ত শ্রীমা লীলাধামে বর্তমান ছিলেন ততদিন আজ্ঞাবহ সন্তানের ন্যায় শ্রীমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেবা-পরিতৃপ্তা স্নেহময়ী শ্রীমাও যোগানন্দ মহারাজের কথা বলিতে গিয়া প্রায় বলিতেন : "যোগেন আমার ভারী"—অর্থাৎ ভারগ্রহণকারী। শ্রীমা যখন কলিকাতা বোসপাড়া লেনে থাকিতেন তখনও তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন যোগানন্দ মহারাজ। পরমনিষ্ঠার সহিত যেভাবে তিনি শ্রীমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহাতে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীমা যে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পাইয়া যোগানন্দ মহারাজকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি : শ্রীমা প্রথমে মনের ভ্রম ভাবিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বপ্নাদেশকে কার্যে পরিণত করেন নাই। সুতরাং দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন এবং শ্রীমা পরিশেষে যোগানন্দ মহারাজকে মন্ত্র দান করিয়াছিলেন।

শ্রীমা ও যোগানন্দ মহারাজ পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক ছিল অপূর্ব রকমের। শ্রীমা নাকি যোগানন্দ মহারাজকে ঈশ্বরকোটি ও কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী অর্জুন বলিয়া জানিতেন, আর যোগানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে সাক্ষাৎ বিশ্বরূপিণী মহামায়া বলিয়া জ্ঞান করিতেন। যোগানন্দ মহারাজের অন্তর্ধানের পর শ্রীমা প্রায়

বলিতেন ঃ "আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না। তবে যোগেন ছিল। ছেলে যোগেন আমার যেমনটি সেবা করেছে, তেমনটি আর কেউ পারবে না।" আবার কখনও কখনও বা শ্রীমা বলিতেন ঃ "যোগেনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার যোগেনকে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত, সে আমার জন্য রেখে দিত, আর বলত মা তীর্থে-টীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন। আহা কী ভালবাসা।" সত্যই যোগানন্দ মহারাজ ছিলেন শ্রীসারদাদেবীর আদরের সন্তান।

একবার যোগানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে একটি লেপ উপহার দিয়াছিলেন। লেপটি ছিল জীর্ণ, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীমা লেপটিকে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি শ্রীমা লেপটির কাপড় পর্যন্ত পরিবর্তন করেন নাই পাছে তাহার রঙটির পরিবর্তন হয়। যোগানন্দ মহারাজের অন্তর্ধানের পরও শ্রীমা লেপটি অত্যন্ত যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। একবার কোন ভক্ত লেপটি ব্যবহার করিবার জন্য শ্রীমার নিকট হইতে চাহিলে শ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ "না, লেপটি নিয়ে কাজ নেই। এ'লেপ যোগেন দিয়েছিল, দেখলেই তাকে মনে পড়ে।" স্নেহময়ী মায়ের প্রাণ অত্যন্ত কোমল, তাই সন্তানের স্মৃতি শ্রীমার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রতি বৎসর শ্রীমা শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার সময় পিত্রালয়ে জয়রামবাটীর বাড়ীতে যাইয়া পূজার বাসনপত্র মাজিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিতেন। যোগানন্দ মহারাজ তাহা জানিতেন, সেইজন্য শ্রীমার কষ্ট লাঘব করিবার জন্য দোকান হইতে পছন্দমত কাঠের বারকোস প্রভৃতি বাসন কিনিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমা যোগেন মহারাজেব কাণ্ড দেখিয়া হাস্য করিলেও অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। শ্রীমার আনন্দ দেখিয়া যোগেন মহারাজ বলিয়াছিলেন ঃ "মা, তোমাকে আর জয়রামবাটীতে গিয়ে বাসন মাজতে হবে না।" পুত্রের সস্নেহ-ব্যবহারে প্রসন্নময়ীর প্রসন্নতার অন্ত ছিল না।

ক্রমে যোগানন্দ মহারাজ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য তুইজন চিকিৎসক আনয়ন করা হইয়াছিল। গুরুভ্রাতারা সকলে মিলিয়া প্রাণ দিয়া যোগানন্দ মহারাজের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিয়তির নির্দেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যোগানন্দ স্বামীজীর অসুখ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সন্তান-বৎসলা শ্রীমা যোগানন্দ মহারাজের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সন্তানের নিরাময়ের জন্য শ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যোগানন্দ মহারাজের জন্য চিন্তায় ও ভাবনায় এবং নানান পরিশ্রমে শ্রীমার শরীরও বেশ খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নিরুপায় হইয়া সেবা-শুশ্রূষার জন্য শ্রীমা যোগানন্দ মহারাজের সহধর্মিণীকে আনিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। মাতৃগতপ্রাণ যোগানন্দ মহারাজ শ্রীমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। শ্রীমা কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার সহধর্মিণীকে আনাইয়া বলিয়াছিলেনঃ "একে উপদেশ দাও।" কঠোর সন্ন্যাসী যোগানন্দ মহারাজ তাহাতে বলিয়াছিলেনঃ "মা, সে সব তুমি বুঝবে।" সদাহাস্যময়ী শ্রীমা সন্তানের কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিয়াছিলেন মাত্র, কেননা তিনি বুঝিয়াছিলেন, স্বামীর আপদকালে পত্নীর পক্ষেও কর্তব্য থাকে প্রচুর।

শ্রীমা কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাঁহার সন্তানের সুস্থতার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লীলাময়ীর লীলার রহস্য বোঝা কঠিন। শ্রীমা অধীরভাবে একজন সেবককে প্রশ্ন করিয়াছিলেনঃ "আমার ছেলে যোগেনের কি হবে—বাবা?" সেবক শ্রীমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, যোগীন মহারাজ নিরাময় হইবেন, উদ্বেগের কোন কারণ নাই। শ্রীমা যোগানন্দ মহারাজের অবস্থা কিন্তু মোটেই ভাল বলিয়া মনে করিতেছিলেন না। তিনি জনৈক ভক্তকে একদিন বলিয়াই ফেলিলেনঃ "বাবা, আমি যে দেখেছি, ভোরবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেনকে নিজে নিতে

এসেছেন।” এই কথা বলার পর শ্রীমা বুঝিয়াছিলেন, সেইকথা ভক্তকে বলিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। কিন্তু স্বপ্নের কথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যোগীন মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর আর পৃথিবীলোকে রাখিবেন না। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমা অকস্মাৎ কাঁদিয়া অধীর হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আত্মসংবরণ করিয়া ভক্তকে বলিয়াছিলেনঃ “কাউকে একথা বলো না বাবা, বলতে নেই।” ভক্ত কিন্তু শ্রীমার কথা ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

এইদিকে যোগানন্দ মহারাজের অবস্থাব উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হইতে লাগিল এবং মর্মন্তুদ মুহূর্ত ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল। সত্যই যোগানন্দ মহারাজের জীবনদীপ নির্বাপিত হইল। শোনা যায়, জীবনদীপ নির্বাপিত হইবার কিছু পূর্বে যোগানন্দ মহারাজ নাকি শ্রীমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেনঃ “মা, আমায় নিতে এসেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং”। শ্রীমাও প্রিয় সন্তানের অন্তিমকাল নিকটবর্তী হইয়াছে জানিতে পারিয়া দ্বিতলে আপনার ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন। যোগানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণে সমবেত গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। শ্রীমার নিকটও ঐ সংবাদ উপস্থিত হইল। পুত্রহারা গর্ভধারিণীর ন্যায় শ্রীমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। একজন সেবক দ্রুতপদে দ্বিতলে গিয়া শ্রীমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীমা কিন্তু বিরক্তি-সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেনঃ “তুমি যাও। আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল, আর কে আমায় দেখবে।” শ্রীমার অধীর ভাব ও চক্ষে অশ্রুজল দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত ও নির্বাক হইয়া রহিলেন। সন্তানহারা হইয়া শ্রীমা আকুলা ও অধীরা, সুতরাং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি কাহার আছে। তবে সর্বংসহা বিশ্বজননীর শোকেরও একটি সীমা আছে। সেইজন্য শ্রীমা আত্মসংবরণ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। আসলে সংসারের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ ও

আনন্দ-নিরানন্দকে লইয়াই মহামায়ার লীলা ও খেলা। কিন্তু সেই লীলার মধ্যেও এক অবর্ণনীয় মাধুর্য আছে, যদিও সে মাধুর্যের রসাস্বাদন করা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। শ্রীমার গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে শুধু মানুষ কেন, বিশ্বের সকল প্রাণী ও সকল বস্তু এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারকাও আবদ্ধ। অনাবিল স্নেহ-ভালবাসার জন্যই বিশ্বজননী শ্রীমা সকলের নিকট বাঁধা পড়িয়াছিলেন এবং সেজন্যই স্বামী যোগানন্দের মহাসমাধির পর শ্রীমা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার সেবককে একদিন বলিয়াছিলেনঃ "বাড়ীর একখানি ইট খসল। এবার সব যাবে।" নবনির্মীয়মান শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজীবনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও শ্রীমা একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন। যোগীন মহারাজ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রশিষ্যদিগের মধ্যে প্রথম ও প্রধান, তাই সৌরমণ্ডলের একটি জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হওয়ায় বিশ্বপ্রকৃতি শ্রীমার অন্তরেও বিষাদের ছায়াপাত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী সারদানন্দ ॥

শ্রীসারদাদেবীর আর একজন স্নেহের সন্তান ছিলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। সারদানন্দ মহারাজের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেনঃ "সে (শরৎ) আমার বাসুকি; সহস্র ফণা ধরে কত কাজ করেছে। যেখানে জল পড়ে, সেখানেই ছাতা ধরে।" সত্যই সারদানন্দ মহারাজ ছিলেন সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ধারক ও পালক। তিনি সকল সময়েই ছিলেন ধনী-নির্ধন ও সহায়-অসহায়ের পরম বন্ধু। স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ), স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ প্রভৃতির পর সারদানন্দ মহারাজ সেবকরূপে একাধিক্রমে একুশ বৎসরকাল শ্রীমার সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীমায় যখন যে প্রয়োজন হইয়াছে তখনই স্নেহের সেবক শরৎকে (সারদানন্দ মহারাজকে) ডাকিয়া তাহার হস্তে সকল সমস্যার সমাধানের ভার ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমা নিশ্চিন্ত হইতেন। মাতৃভক্ত সন্তান সারদানন্দ মহারাজও শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার নাম স্মরণ করিয়া নির্বিঘ্নে সকল সমস্যার সমাধান করিতেন।

জয়রামবাটি ও কামারপুকুর হইতে শ্রীমাকে কলিকাতায় আসিতে হইলে অমনি ডাক পড়িত শরৎ মহারাজের। তখন শ্রীমাকে আনিবার জন্য শরৎ মহারাজ নিজে যাইতেন, নতুবা অন্য কোন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দিতেন। যাহাতে শ্রীমার কোন অসুবিধা না হয় সেইদিকে শরৎ মহারাজের সর্বদা দৃষ্টি থাকিত। তাই শরৎ মহারাজ ছিলেন যেন শ্রীমার কুটিরের দ্বারী; তিনি সর্বদা দ্বার রক্ষা করিতেন যেন যখন-তখন কেহ অকস্মাৎ আসিয়া

শ্রীমাকে বিরক্ত না করে। মোটকথা শ্রীমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সারদানন্দ মহারাজের সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি থাকিত।

একবারের একটি ঘটনা। একজন ভক্ত শ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতা হ্যারিসন রোড হইতে উদ্বোধনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্তটি আসিয়াই একেবারে সোজা উপরে দ্বিতলে শ্রীমার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীমার দ্বারী সারদানন্দ মহারাজ দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ত্রাস্তব্যস্ত হইয়া ভক্তটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: "না, এখন মার কাছে যেতে দেবো না, তিনি এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।" ভক্তটি সারদানন্দ মহারাজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া উপরে চলিয়া গেলেন ও যাইবার সময় বলিলেন: "মা কি কেবল একা আপনার?" কিন্তু উপরে উঠিয়াই তাঁহার মধ্যে বেশ একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল, কেননা মনে হইল, কৃতকর্মের জন্য তিনি বেশ অনুতপ্ত হইয়াছেন। যাহাহউক তিনি শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন এবং সারদানন্দ মহাবাজের নিষেধ-বাক্য অমান্য করিয়াছেন তাহাও শ্রীমাকে নিবেদন করিলেন। শ্রীমা শুনিয়া বলিলেন: "শরতের তাহাতে কোন দোষ নাই। তাহার ছেলেরা কাহারও কোন অপরাধ গ্রহণ করে না।" ভক্ত শ্রীমার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু শরৎ মহারাজের প্রতি অন্যায় আচরণ করায় অন্তরে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি শরৎ মহারাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন স্থির করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়াই দেখিলেন সারদানন্দ মহারাজ ঠিক সেই একই স্থানে দ্বার-রক্ষকের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। শরৎ মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভক্ত আপনার কৃত-অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ক্ষমাসুন্দরমূর্তি সারদানন্দ মহারাজ কিন্তু পূর্ব হইতেই ভক্তকে ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন: "অপরাধ আবার কি? এমন

ব্যাকুল না হলে কি আর শ্রীমার দেখা পাওয়া যায়?" ক্রুদ্ধ ও অশান্ত ভাবের পরিবর্তে শরৎ মহারাজের শান্ত সমাহিত প্রসন্ন মূর্তি দেখিয়া ভক্ত বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এইরূপ না হইলে কি আর স্নেহের সন্তানরা শ্রীমার সেবক হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

সারদানন্দ মহারাজের জীবনের প্রধান কর্তব্যই ছিল শ্রীমার সকল সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা। একবার সারদানন্দ মহারাজ যখন কাশীতে ছিলেন তখন শ্রীমা কলিকাতায় যাইবার প্রসঙ্গ লইয়া বলিয়াছিলেন: "শরৎ কলিকাতায় না থাকলে আমার সেখানে যাবার কথা উঠতেই পারে না। কার কাছে যাব? আমি সেখানে আছি, আর শরৎ যদি বলে, মা, কয়েক দিন অন্যত্র যাচ্ছি, তাহলে আমি বলব—একটু থাম বাবা, আমি আগে এখান থেকে পা বাড়াই, তারপর তুমি যাবে। শরৎ ছাড়া আমার ঝক্কি কে পোয়াবে?" আর একবার শরৎ মহারাজ-প্রসঙ্গে শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "শরৎ যে ক'দিন আছে, সে ক'দিন আমার ওখানে থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না। শরৎই সর্বপ্রকারে পারে, শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।"

এমনি ছিল সারদানন্দ মহারাজের প্রতি শ্রীমার স্নেহের আকর্ষণ ও নির্ভরশীলতা। তাহা ছাড়া দেখা যাইত, লোকসমক্ষে শ্রীমা সকল সময়েই সকল সন্তানের আভিজাত্য ও সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে বলি। একবার একজন ভক্ত জয়রামবাটীতে গিয়া শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন: "আপনাকে কিছুদিনের জন্য নিয়ে যেতে এসেছি। বাড়ীভাড়া ইত্যাদি সব ঠিক করেছি।" শ্রীমা শুনিয়া বলিয়াছিলেন: "শরৎ কি এসব কথা জানে?" ভক্তটি বলিয়াছিলেন: "না।" শ্রীমা উত্তরে বলিয়াছিলেন: "তবে আমার যাওয়া হতে পারে না। শরৎ এসে ফিরে গেছে। আগে কলিকাতায় যাই। সে যদি বলে তখন দেখা যাবে।" ভক্ত তদুত্তরে বলিয়াছিলেন:

"মা, আমরা তো সব যোগাড় করেছি।" শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন: "তোমরা আগে না জানিয়ে যোগাড় করলে কেন বাবা?" ভক্ত অগত্যা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেলে শ্রীমা কয়েকজন শ্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন: "দেখ মা, ওরা মনে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া খুব সোজা। আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া আর যে কেউ ভার নিতে পারে—এমন দেখিনি।"

একবার দুইজন ভদ্রলোক শ্রীমার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইবার জন্য গিয়াছিলেন। শ্রীমা তখন অসুস্থ ছিলেন বলিয়া কয়েকদিন পরে তাঁহাদিগকে পুনরায় আসিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তখনই দীক্ষাগ্রহণের জিদ্ ধরিয়া বসেন। তাহাতে শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "শরতের কাছে যাও, সে যা ব্যবস্থা করবে তাই হবে।" তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন: "মা, আর কাউকে তো আমরা জানি না। আপনার কাছে এসেছি, আপনাকে দীক্ষা দিতেই হবে।" শ্রীমা তাহাতে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন: "বল কি? শরৎ আমার মাথার মণি। শরৎ যা করবে তাই হবে।" তাঁহারা সারদানন্দ মহারাজকে চিনেন না—ইহাতে শ্রীমার তো বিস্মিত হইবারই কথা। শরৎ মহারাজ না হইলে শ্রীমার যে কোন কর্মই হয় না সেই কথা তাঁহারা কেমন করিয়া জানিবেন। দীক্ষাবিষয়ে শ্রীমার একান্ত আপত্তি জানিয়া ও শ্রীমার মুখে শরৎ মহারাজের নাম শুনিয়া তাঁহারা বুঝিলেন স্বামী সারদানন্দ ব্যতীত তাঁহাদিগের কার্যসিদ্ধি হইবার কোন উপায় নাই। অগত্যা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহারা সোজাসুজি সারদানন্দ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বিনয়-সহকারে নিবেদন করিয়াছিলেন। আনুপূর্বিক ঘটনা শুনিয়া সারদানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন: "শ্রীমা এখন অসুস্থ, সুতরাং দীক্ষা নেওয়া তাঁহার নিকট অসম্ভব।" তখন ভক্ত-দুইজন জানাইলেন যে, তিনি (শরৎ মহারাজ) সম্মত হইলে দীক্ষাদান-সম্বন্ধে শ্রীমার কোন আপত্তি থাকিবে না। তাঁহাদিগের মুখে

শ্রীমার অভিপ্রায় শুনিয়া সারদানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন: "মা একথা বলেছেন? আচ্ছা তোমরা তাহলে অমুক দিন প্রস্তুত হয়ে এসো।" প্রজ্ঞারূপিণী শ্রীমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু করিবার শক্তি শরৎ মহারাজের ছিল না। শ্রীমার আজ্ঞাই বেদবাক্য ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশ এমনই ছিল শ্রীমা-সম্বন্ধে শরৎ মহারাজের বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা। করুণাময়ী শ্রীমার অজস্র স্নেহ-ভালবাসা লাভ করিয়াও সারদানন্দ মহারাজের মনে বিন্দুমাত্র অহংকারের লেশ কোনদিন কেহ দেখে নাই। একান্ত নিরভিমানী শান্তস্বভাব শরৎ মহারাজ ছিলেন শ্রীমার সরল ও যোগ্য সন্তান, তাই শ্রীমাও সুযোগ্য স্থানে তাঁহার সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

অনেক সময় শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় বাসের অত্যন্ত অসুবিধা অনুভব করিতেন। কেদারচন্দ্র দাস মহাশয় শ্রীমার নামে কলিকাতায় একখণ্ড জমি দান করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া শ্রীমার কলিকাতায় অবস্থানের অত্যন্ত অসুবিধার কথা সারদানন্দ মহারাজ বিশেষভাবে জানিতেন। সেইজন্য ঐ দানের জমিটীতে তিনি শ্রীমার জন্য একটি বাটী তৈয়ারী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার হস্তে উপযুক্ত অর্থ ছিল না। সেইজন্য অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের দায়িত্বে কিছু অর্থ ঋণ করিয়া বাগবাজারে শ্রীমার জন্য একটি নূতন বাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১] শরৎ মহারাজের অন্তরের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমা আনন্দে ও নির্ভাবনায় নবনির্মিত বাটীতে বাস করিবেন। শ্রীমাও সন্তানের সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

উদ্বোধনের বাটী নির্মিত হইবার পর মাতৃভক্ত শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী হইতে শ্রীমাকে আনাইয়া সর্বপ্রথম সেই নবনির্মিত

১। বর্তমান উদ্বোধনে শ্রীমার বাটী।

বাটীতে রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং শ্রীমা আপনার নূতন বাটীতে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বাস করিতে পারিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য শরৎ মহারাজকে শ্রীমাও প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

উদ্বোধনের নূতন বাটী নির্মিত হইবার পর শ্রীমার মনের মতো করিয়া তাহা সাজাইবার জন্যও শরৎ মহারাজের চিন্তার আর শেষ ছিল না। দ্বিতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং পার্শ্বের ঘরে শ্রীমা ও রাধুর থাকিবার জন্য শরৎ মহারাজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নূতন বাটীতে নূতনভাবে সাজানো-গুছানো ছাড়াও সকল রকম সুব্যবস্থা দেখিয়া শ্রীমার আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না। ঠাকুর ঘর দ্বিতলে হওয়ায় শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছেড়ে আমার থাকা চলে না, থাকা উচিত নয়; তা ভালই হয়েছে।" শ্রীমা ও রাধুর থাকার জন্য শরৎ মহারাজ পৃথক পৃথক খাট, বিছানা, বালিস ও অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সর্বৈশ্বর্যময়ী শ্রীমার বাসের জন্য যেন কোন ঐশ্বর্যেরই অভাব অসুবিধা না হয় সেই দিকে শরৎ মহারাজের বিন্দুমাত্র ক্রুটী ছিল না। কিন্তু দ্বিতলে নূতন ঘরে বাস করার পর শ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেন, তাঁহার খাটে শুইতে একটু অস্বস্তি বোধ হয়। তাহাছাড়া রাধুকে ছাড়িয়া তিনি থাকিবেনই বা কেমন করিয়া। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর শ্রীমা রাধুর উপর মন রাখিয়াই সংসারের সকল কর্ম করিতেন। রাধু ছিল যেন শ্রীমার মায়ার সংসারে অবলম্বন। সেইজন্য রাধুকে ছাড়িয়া শ্রীমা একমুহূর্তেও থাকিতে পারিতেন না। অন্যদিকে রাধুর অবস্থাও তদনুরূপ। রাধুও শ্রীমাকে ছাড়িয়া থাকিতে, খাইতে ও শুইতে পারিত না। সুতরাং এই সকল অসুবিধার কথা জানিতে পারিয়া সারদানন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীমার খাট ঠাকুর ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে শ্রীমা ও রাধু একই খাটে

পাশাপাশি শয়ন করিতেন। রাধুর খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও তিনি শ্রীমার সঙ্গেই করিয়াছিলেন। সুতরাং শরৎ মহারাজের দিক হইতে শ্রীমার সেবার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। তাহাছাড়া শ্রীমার জন্য তিনি আপন হস্তে সকল কিছুরই ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মোটকথা আনন্দময়ী আরাধ্যা শ্রীমার সেবা-যত্নই ছিল সারদানন্দ মহারাজের জীবনে ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা।

শ্রীমা আপনার গর্ভধারিণী জননীর প্রসঙ্গে একদিন কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন: "আমার মা ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমার ছেলে শরৎকে মা খুব ভালবাসতেন। আমার অনুমতি ছাড়া শরৎ কোন কাজই করত না। আহা এমনি ছিল তাঁর নিষ্ঠা! শরৎকে নরেন ডেকে পাঠালো ওদেশে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্যে। সুতরাং শরৎ আমেরিকা যাবে বলে আমার অনুমতি নিতে এলো। আমি তাকে আশীর্বাদ করে বল্লুম, কোন ভয় নেই, ঠাকুর তোমাদের সর্বদা রক্ষা করছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া লণ্ডনে উপস্থিত হন এবং মিষ্টার ই. টি. ষ্টার্ডির আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন আলমবাজার মঠে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ তীব্র ত্যাগ-তপস্যায় ও তাঁহাদিগের বরেণ্য আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের কথা এবং তাঁহার প্রিয় গুরু-ভ্রাতাগণের কুশল-সমাচার জানিবার জন্য বহুদিন হইতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সারদানন্দ মহারাজকে পাইয়া তিনি সকল-কিছু জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে সারদানন্দ মহারাজ ভারতের বেদান্তধর্ম ও আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রচার করিবার জন্য লণ্ডন হইতে আমেরিকায় গমন করেন। সুদূর পাশ্চাত্যে রওনা হইবার পূর্বমুহূর্তে তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপিণী শ্রীমার পদধূলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন

এবং শ্রীমা সেই প্রসঙ্গেরই এখানে উল্লেখ করিয়াছেন।, সারদানন্দ মহারাজ পাশ্চাত্য দেশে গমন করিলে শ্রীসারদাদেবীর গর্ভধারিণী মা শ্রীসারদাদেবীকে বলিয়াছেনঃ "হ্যাঁ মা সারু, তুই মা হয়ে কোন্ প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী দূরে পাঠালি? তোর প্রাণ কি কঠিন মা।" এই কথাগুলি হইতে বোঝা যায় যে, সারদানন্দ মহারাজ কেবলি যে শ্রীমার অসামান্য স্নেহ-ভালবাসা পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন তাহা নহে, শ্রীমার সহজ-সরলস্বভাবা গর্ভধারিণীরও অন্তরের স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন।

উদ্বোধনের বাটী নির্মিত হওয়ার পর হইতে শ্রীসারদাদেবী যখন সেইখানে বাস করিতেন তখন শ্রীমার সুখ-সুবিধার জন্য সারদানন্দ মহারাজকে যে সকল সময়ে সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইত তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নূতন বাটী নির্মাণ করাইবার জন্য শরৎ মহারাজ কিছু অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত সেই ঋণ পরিশোধ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার পরমপূজ্য আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কেননা ঐ পুস্তক-বিক্রয়ের অর্থ হইতে পরে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইবে মনে করিয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার সেন ও অন্যান্য ভক্তগণ-লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ, অবতারকল্প-মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ, শ্রীমা, গুরুভ্রাতাগণ ও ভক্তগণের নিকট এবং সঙ্গে সঙ্গে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী অঞ্চলের তদানীন্তনকালে জীবিত স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত এবং প্রবীণদের নিকট হইতেও তিনি বিচিত্র তত্ত্ব, তথ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অসংখ্য অপরিহার্য কর্মের মধ্যে জড়িত থাকিয়াও সারদানন্দ মহারাজ কর্তব্য ও সাধনা ভাবিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের
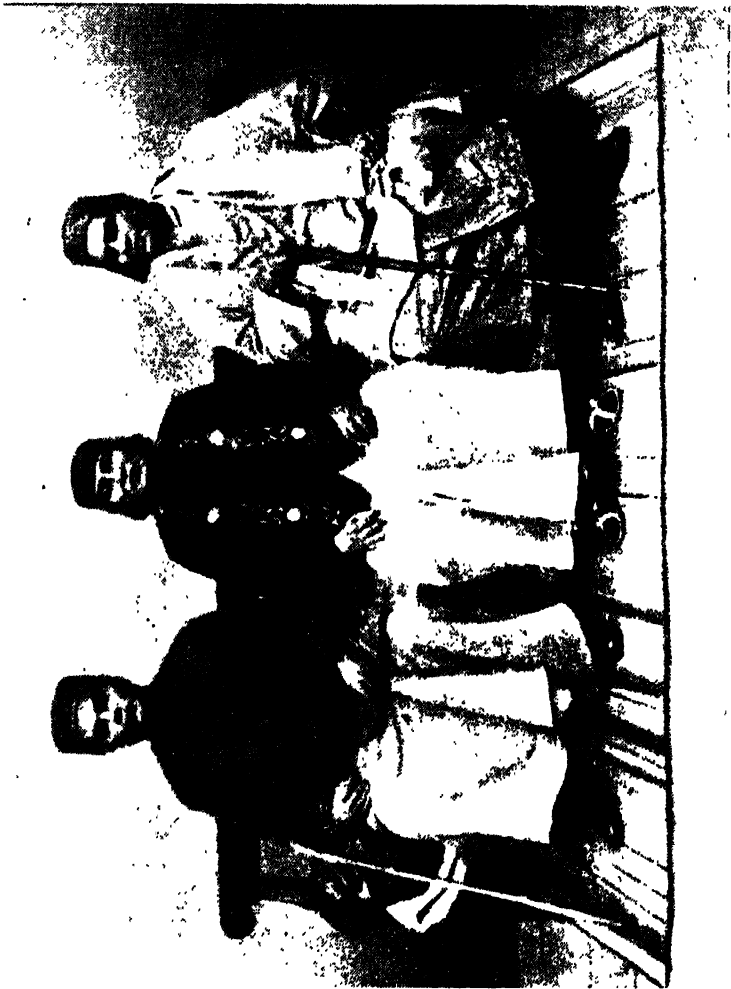
স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ
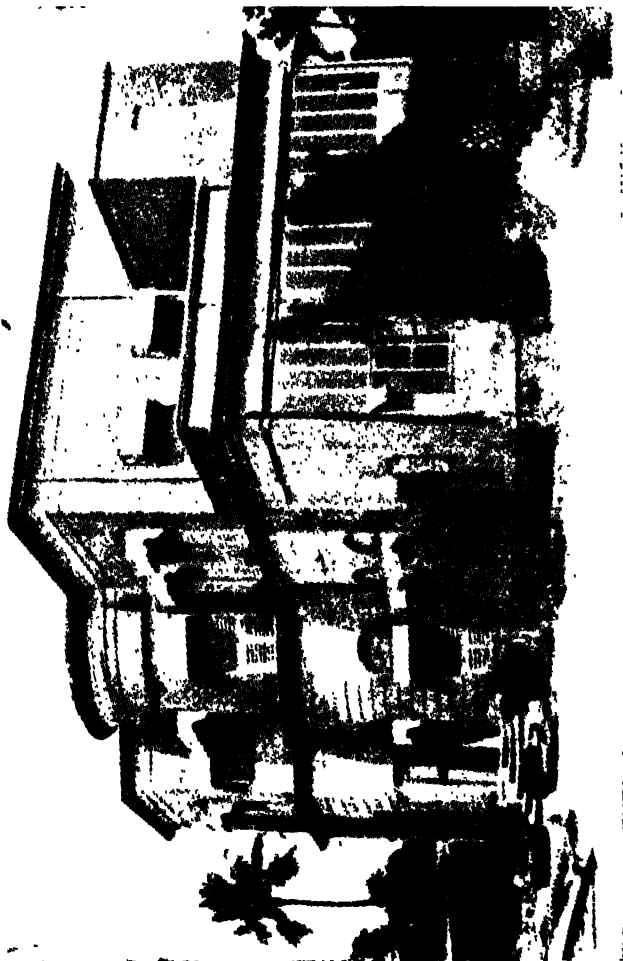
কাশীপুর-উদ্যানবাটি

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

জীবনী-গ্রন্থ লিখিতেন এবং সেই জীবনচরিতের নাম দিয়াছিলেন '‌শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতেন বলিয়া শ্রীমার সেবাকার্যের কখনও কোনদিন ত্রুটি হইত না। তিনি 'উদ্বোধন'-পত্রিকা, উদ্বোধন-অফিস ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ও সকল কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যবস্থা করিয়া তাহারই মধ্যে যতদূর সম্ভব আপনার হস্তে সদানন্দময়ী শ্রীমার সেবাকার্য করিতেন ও করাইতেন।

সেই সকল কর্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াই পুনরায় শ্রীমার আদেশে তিনি শ্রীমাকে বাঙলাদেশের ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও অন্যান্য ভজনগান গাহিয়া শুনাইতেন। সারদানন্দ মহারাজের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুমধুর। পরবর্তীকালে কখনও কখনও তিনি গান গাহিতেন ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গানের সহিত পাখোয়াজ ও তবলা সঙ্গত করিতেন। শরৎ মহারাজের গানে জাগ্রত প্রেরণার প্রকাশ ছিল, সেইজন্য শ্রীমা শরৎ মহারাজের গান শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার পুত্র শরৎকে মঠ ও মিশনের অসংখ্য কর্ম ব্যতীত সমগ্র দেশের ও জাতির সেবার কর্মে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও শরৎ মহারাজ যখন উদ্বোধনের বাটীতে থাকিতেন তখন তাঁহার গান শ্রীমা প্রতিদিনই প্রায় শুনিতেন। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমা কাহারও দ্বারা বলিয়া পাঠাইতেনঃ "শরৎকে দুটো গান শোনাতে বলো।" শ্রীমার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভক্ত শরৎ মহারাজ অমনি তানপুরা হস্তে লইয়া সুকণ্ঠে হয়তো গান ধরিতেন, 'একবার এস মা, এস মা, কিংবা 'শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে', অথবা 'নিবিড় আঁধারে মা তোর,' অথবা 'নাচে বাহু তুলে ভোলা ভাবে ভুলে,' কিংবা 'দনুজদলনী নিজজনপ্রতিপালিনী শ্রীকালী' প্রভৃতি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সারদানন্দ মহারাজের কণ্ঠ সতেজ না হইলেও অত্যন্ত সুমিষ্ট ছিল এবং সেই মধুস্রাবী কণ্ঠ হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া শান্তি ও আনন্দরস সৃষ্টি করিত। সুতরাং দেখা যায় যে, বিচিত্রভাবে

একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সারদানন্দ মহারাজ বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সেই আত্ম-সমর্পণের দৃষ্টান্ত জগতে সত্যই বিরল।

একবার শ্রীমার পিতৃসম্পত্তি লইয়া তাঁহার ভ্রাতাগণের মধ্যে মত-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমা আপনি চিন্তা করিয়া কোন কুল-কিনারা না পাইয়া অগত্যা শরৎ মহরাজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র শরৎ মহারাজ শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা শুনিলেন এবং শ্রীমাকে তাহার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন। জয়রামবাটীর দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসা সম্পূর্ণভাবে তখন না হইলেও শরৎ মহারাজ যখন ভার লইয়াছেন তখন শ্রীমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি শরৎ মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন : "শরৎ, তুমি যা হয় ক'রো।" শরৎ মহারাজ অবনত মস্তকে উত্তর দিলেন : "হ্যাঁ মা, এর জন্য আপনি আর কোন চিন্তা করবেন না।" শ্রীমার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া শরৎ মহারাজ পায়ে হাঁটিয়া জয়রামবাটী রওনা হইলেন এবং জয়রামবাটীতে নিরাপদে উপস্থিত হইয়া সকল দ্বন্দ্ব-সমস্যার মীমাংসা করিলেন। শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী হইতে উদ্বোধনের বাটীতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীমা তাঁহার মুখে সকল ঘটনা শুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

লীলাবসানের কিছুদিন পূর্ব হইতে শ্রীসারদাদেবীর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন তাঁহার অবস্থা যেন ছোট একটি বালিকার ন্যায় হইয়াছিল। সেবকগণ সর্বদাই তাঁহার পার্শ্বে থাকিতেন। যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহাকে কোন-কিছু খাওয়াইতে যাইলে তিনি বিভিন্ন বায়না ও আবদার ধরিতেন ও বলিতেন : "আমি খাব না। তোদের একই কথা, মা, খাও, আর বগলে কাঠি (থার্মোমিটার) লাগাও।" অসুস্থ অবস্থায় শ্রীমা একমাত্র সারদানন্দ মহারাজের কথাই শুনিতেন, সুতরাং কোন-কিছু খাইতে বা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিলেই

সেবিকারা তৎক্ষণাৎ সারদানন্দ মহারাজকে ডাকিবেন বলিলেই শ্রীমা সেই মুহূর্তে গ্রহণ করিতেন। একবার শ্রীমা খাইতে রাজী না হওয়ায় সেবিকারা শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া আনিলেন। শরৎ মহারাজ নিকটে আসিলে শ্রীমা শিশুর ন্যায় বলিতে লাগিলেন: "দেখনা বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে, খালি 'খাও খাও' এদের রব। এরা জানে খালি বগলে কাঠি দিতে। তুমি ওদের বলে দাও যেন বিরক্ত না করে।" সারদানন্দ মহারাজ তখন শ্রীমার দিক লইয়াই কোমল কণ্ঠে বলিলেন: "না মা, ওরা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।" শ্রীমাকে সান্ত্বনা দিয়া সারদানন্দ মহারাজ একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন: "মা, এখন কি একটু খাবেন?" শ্রীমা বলিলেন: "দাও।" সারদানন্দ মহারাজ একজন স্ত্রীভক্তকে খাবার আনিতে বলিলেন। খাবার আনা হইল। শ্রীমা তখন সারদানন্দ মহারাজকে বলিলেন: "না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে খাব না।" সারদানন্দ মহারাজ তখন ফিডিং কাপে দুধ লইয়া শ্রীমাকে ধীরে ধীরে খাওয়াইতে লাগিলেন ও বলিলেন: "মা, একটু জিরিয়ে খান।" সারদানন্দ মহারাজের মুখে শান্ত ও সুমিষ্ট কথা শুনিয়া শ্রীমা আনন্দে বলিলেন: "দেখ তো, কি সুন্দর কথা,—মা একটু জিরিয়ে খান। এ' কথাটা আর ওরা বলতে জানে না। দেখ তো বাছাকে এই রাতে কষ্ট দিলে। যাও বাবা, শোও গিয়ে।" শ্রীমা বারে বারে যেন অনুতাপের সুরে বলিতে লাগিলেন: "এস বাবা। বাছার কত কষ্ট হলো।" সারদানন্দ মহারাজ শ্রীমার পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলেন। জীবন্ত দেবীপ্রতিমার সামান্যও সেবার অধিকার লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া সারদানন্দ মহারাজ নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

আর একদিন শ্রীমা সারদানন্দ মহারাজকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন: "শরৎ, এরা রইল।" শ্রীমার সেই উদাসপূর্ণ কথা শুনিয়া সারদানন্দ মহারাজ একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি

ভাবিলেন, কই, মা তো কখনো এমন করিয়া কোনদিন কথা বলেন নাই। তবে কি শ্রীমা তাঁহার সকল সন্তানকে ফেলিয়া আপন স্বরূপে ফিরিয়া যাইবেন সেই ইঙ্গিতই দিতেছেন? তাঁহার দুইচক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি শ্রীমাকে আর কোন কথা না বলিয়া প্রণাম করিয়া ধীরপদক্ষেপে নীচে নামিয়া গেলেন। চিন্তাভারাক্রান্ত তাঁহার মন, তবে বিন্দুমাত্রও সেই ভাব অপর কাহাকে জানিতে দিলেন না।

সত্যই শ্রীমার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীমা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলিত হইবেন মাঝে মাঝে কথায় ও ভাব-ভঙ্গীতে তাহারই ইঙ্গিত দিতেছেন। রাধুর উপর হইতে তাহার মন পূর্ব হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মহামিলনের তিন দিন পূর্বে শ্রীমা তাঁহার একজন সেবককে বলিয়াছিলেনঃ "শরৎ রইল, ভয় কি?" শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান ও ভক্তগণ কিছুদিন ধরিয়া শ্রীমার কথাবার্তা ও হাবভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এইবার শ্রীমা তাঁহার আপন স্বরূপে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শরৎ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তখন কর্ণধার, সুতরাং শ্রীমা বুঝিতেন যে, বিশাল বক্ষে তাঁহার আদরের শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) সমগ্র মঠ ও মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার অদর্শনে একমাত্র সেইই সকলের ও সকল-কিছুর দায়িত্ব বা ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে এবং সেজন্য অনেককেই তিনি তখন বলিতেনঃ "শরৎ রইল, ভয় কি?"

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার দিন শ্রীমা মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন। শ্রীমার লীলাসংবরণের কিছুদিন পরে সারদানন্দ মহারাজের একান্ত চেষ্টায় জয়রামবাটীতে শ্রীমার একটি মন্দির নির্মাণ ও একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙলাদেশে শ্রীমার জন্মস্থানে *একটি নূতন শক্তিপীঠের প্রতিষ্ঠা* করিয়া শক্তিসাধক সারদানন্দ মহারাজ নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। 'ভারতে শক্তিপূজা'

গ্রন্থ মহাশক্তির জীবন্ত প্রতিমা শ্রীসারদাদেবীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যেই সারদানন্দ মহারাজ রচনা করিয়াছিলেন এবং শুধুই বাঙলা-দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে যাহাতে মহাশক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই ছিল সারদানন্দ মহারাজের অন্তরের কামনা। শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশনের যে অসামান্য কর্মপ্রসারতা, সাফল্য ও সংগঠনশক্তি এই সকল-কিছুর পশ্চাতে ছিল স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও কল্যাণদৃষ্টি। তিনি বলিতেন মহাশক্তিরূপিণী শ্রীমার পূণ্য আশীর্বাদই তাঁহাকে সকল-কিছু সংগঠন ও কল্যাণ-কর্মে প্রেরণা ও সাফল্য দান করিয়াছে। সারদানন্দ মহারাজ যে শুধুই সঙ্ঘ-পরিচালনা ও ধর্মপ্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, দেশের ও দশের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্বদাই কাঁদিয়া উঠিত। তিনি আর্ত, পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত নরনারীর সেবায় নিজের জীবন সম্পূর্ণ-ভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা বলিতে গিয়া অনেক সময় শ্রীমা গদগদকণ্ঠে বলিতেন: "শরতের দিল্ দেখলে? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, কিন্তু শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নেই, পৃথিবীতে নেই।" সত্যই সেবাকর্ম ছিল সারদানন্দ মহারাজের জীবনে ব্রত ও মূলমন্ত্র এবং সেই সেবাকার্যের পশ্চাতে আদর্শ ও লক্ষ্য যে একমাত্র ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতা তাহার ইঙ্গিত দিয়া তিনি তাঁহার একটি পত্রে লিখিয়াছেন: "পরের টাকা পরকে দিবি? তুই আর কি দিবি? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণ-মন, ভালবাসা।" ত্যাগ-সর্বস্বজীবন ও বিশ্বজোড়াপ্রাণ মানুষের পক্ষেই এই কথা বলা সম্ভব!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী প্রেমানন্দ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দ) হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। সত্যই মহাসত্ত্বগুণসম্পন্ন সদাচারী প্রেমানন্দ মহারাজ যেমন সহজ সরল মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন অমায়িক, মিষ্টিভাষী, শান্ত ও ধ্যাননিষ্ঠ। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের স্পৃষ্ট সকল দ্রব্যকেই অতিপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর বাবুরাম মহারাজ শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া আপন আচার্যদেবের আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার পর শ্রীমা যখন কিছুদিন পরে মহাত্যাগী সন্তান ও ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে কামারপুকুর হইতে আসিয়া কলিকাতায় (বাগবাজারে) বাস করিতে লাগিলেন তখন প্রেমানন্দ মহারাজের সকল চিন্তা ও জীবন-কর্মই পরিচালিত হইত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী শ্রীমার সপ্রেম ও সকরুণ নির্দেশে ও সচঞ্চল প্রেরণায়।

সত্য বলিতে কি, বাবুরাম মহারাজ ছিলেন সম্পূর্ণভাবে শ্রীসারদাদেবী-অন্ত প্রাণ। একবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় প্রেমানন্দ মহারাজ একজন সন্ন্যাসী-সন্তানকে দিয়া শ্রীমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যাহাতে তিনি দেবীপূজার সময় বেলুড় মঠে পূর্ব-পূর্ববারের মতো সেইবারও উপস্থিত থাকেন। শ্রীমা বাবুরাম মহারাজের অনুরোধ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি দেবীর বোধনের দিন অপরাহ্নে বেলুড় মঠে আগমন করিবেন। বাবুরাম মহারাজ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপূজার বোধনের দিন সমাগত হইল। ক্রমশ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে তখনও শ্রীমা আসিতেছেন

না দেখিয়া প্রেমানন্দ মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে, মঠের প্রবেশদ্বারে তখনও পবিত্র কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় নাই। প্রেমানন্দ মহারাজ কিছুটা বিরক্ত হইয়া বলিলেন: "এসব এখনও হয় নি, তবে মা আসবেন কি!" যাহাহউক যথাসময়ে বোধনের পূজা আরম্ভ হইল এবং প্রেমানন্দ মহারাজ এক একবার বোধনস্থান হইতে মঠের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সর্বাসিদ্ধিদায়িণী শ্রীমা না আসা পর্যন্ত তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না। ক্রমশ বোধন প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিল। ঠিক সেই সময়ে মঠের দ্বারদেশে শ্রীমার গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেমানন্দ মহারাজ, অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ সসব্যস্তে দ্বারে উপস্থিত হইলেন ও গাড়ীর ঘোড়াকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেরাই আনন্দে 'জয় মা, জয় মা' ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ী টানিয়া একেবারে মঠের প্রাঙ্গণে আনিয়া হাজির করিলেন। গোলাপ মা শ্রীমার হাত ধরিয়া সন্তর্পণে গাড়ী হইতে শ্রীমাকে নামাইলেন। শ্রীমা গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে মঠের চারিদিকে সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন: "সব ফিট্‌ফাট্‌, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা ঠাকরুণ এলুম।" সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে বেলুড় মঠ সেইদিন ভরপূর। আনন্দকলরবে চতুর্দিক মুখরিত। সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ও শ্রীমা সকলকে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

পূজা-উপলক্ষ্যে শ্রীমা এক সপ্তাহকাল বেলুড় মঠে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহাষ্টমীপূজার দিন প্রায় তিন শতাধিক ভক্ত-সন্তান দেবী দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া শ্রীমার কল্যাণ-আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। কয়েকজন ভক্তকে শ্রীমা সেইদিন মন্ত্রদীক্ষাও দান করিয়াছিলেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র-রচিত 'জনা' নাটক সেইদিন রাত্রে অভিনীত হইয়াছিল। বিজয়ার দিন রাত্রে পুনরায় 'রামাশ্বমেধযজ্ঞ' যাত্রাভিনয় হইয়াছিল। বহুদিন

পরে যাত্রাভিনয় দেখিয়া শ্রীমা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

ক্রমে সন্ধিপূজার আয়োজন হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা নাই, কেননা স্বয়ং আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবী পূজামণ্ডপে উপস্থিত। মহাষ্টমী ও মহানবমীর পুণ্যসন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল। শ্রীমা পূজামণ্ডপে নির্দিষ্ট একটি আসনে উপবেশন করিলেন এবং ধীরে ধীরে জপ করিতে করিতে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। স্ত্রীভক্তগণ শ্রীমাকে বেষ্টন করিয়া মণ্ডলাকারে উপবেশন করিলেন। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ দেবীপ্রতিমার অন্যদিকে উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। অপূর্ব সেই দৃশ্য! দেবদুর্লভ সেই শোভা! সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইলে আরাত্রিক আরম্ভ হইল। আরাত্রিকের পর শ্রীমা, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পুরুষ ও স্ত্রীভক্তগণ সকলে শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে দেবী-প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেন। 'জয় মা, জয় মা' শব্দে মঠপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সেই সমবেত কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি গঙ্গাবক্ষে প্রসারিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল 'জয় মা, জয় মা'।

সন্ধিপূজার পর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন: "এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।" ব্রহ্মচারী শরৎ মহারাজের উক্তির ঠিক মর্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া মনে করিলেন যে, তাহা দুর্গাপ্রতিমার নিকট প্রণামীস্বরূপ দিতে হইবে। সুতরাং সন্দেহ দূর করিবার জন্য ব্রহ্মচারী পুনরায় শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ মহারাজ হাসিয়া বলিলেন: "ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তারই পূজা হল।" সারদানন্দ মহারাজের কথার মর্ম হইল, শ্রীমাই জীবন্ত দেবী দুর্গা, তাই সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে শ্রীমার পূজা করিলেই দেবী দুর্গার পূজা সম্পন্ন হইবে। কিন্তু এই রহস্য আর বুঝে কয়জন। যাহা হউক বিজয়ার দিন ক্রমশ দেবী প্রতিমার বিসর্জনের সময় উপস্থিত

হইল এবং প্রতিমাবিসর্জনও যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। প্রতিমা-বিসর্জনের পর শ্রীমা সকলের সহিত শান্তিজল গ্রহণ করিলেন। অন্তরের কামনা পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া প্রেমানন্দ মহারাজের আনন্দের আর তখন সীমা ছিল না। শান্তিজলগ্রহণের পর তিনি আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন,

মা যার আনন্দময়ী
সে কি নিরানন্দে থাকে,
তার ইহকালে পরকালে
মাঁ তারে আনন্দে রাখে।

শ্রীমা সরল ও প্রেমোন্মত্ত প্রেমানন্দ মহারাজের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি শ্রীমার আদেশ ব্যতীত কোন কর্মই কখনও করিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, আপনার নিজস্ব অভিমত থাকিলেও তিনি শ্রীমার কথায় তাহা ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। মোটকথা 'মা বলিয়াছেন' সুতরাং তাহা জীবন দিয়াও প্রতিপালন করিতে হইবে—ইহাই ছিল প্রেমানন্দ মহারাজের জীবনের ব্রত।

একবারের কথা। শ্রীমা উদ্বোধনের বাটীতে রহিয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ তখন বেলুড় মঠে। জনৈক ভক্ত প্রেমানন্দ মহারাজকে উৎসব-উপলক্ষ্যে মালদহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজের শরীর তখন বিশেষ সুস্থ ছিল না, অথচ ভক্তের একান্ত অনুরোধও তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। অগত্যা পরিশেষে তিনি মালদহ যাওয়াই স্থির করিলেন। মালদহে যাত্রার পূর্বে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি ও আশীর্বাদ লইবার জন্য ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তিনি উদ্বোধনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীমার চরণ বন্দনা করিয়া সকল ঘটনা শ্রীমাকে নিবেদন করিলেন।

স্নেহময়ী শ্রীমা সকল কথা শুনিয়া প্রেমানন্দ মহারাজকে বলিলেন : "তোমার শরীর ভাল নয়। উৎসবে অনিয়ম হবে। পথও দুর্গম। তাই গরমের মধ্যে এত দূর নাই বা গেলে।" বাবুরাম মহারাজ অবনতমস্তকে শ্রীমার নির্দেশ মানিয়া লইলেন এবং উৎসবে না যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু প্রেমানন্দ মহারাজ মালদহ যাইবেন না শুনিয়া ভক্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া ছলছল নেত্রে বলিলেন যে, প্রেমানন্দ মহারাজের কোন কিছু যাহাতে কষ্ট ও অসুবিধা না হয় তাহার সকল দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিবেন। করুণাময়ী শ্রীমা ভক্তের কাতর প্রার্থনায় পরিশেষে প্রেমানন্দ মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন: "হ্যাঁ বাবুরাম, এরা এত করে বলছে যখন, তখন তাহলে কি তুমি যাবে?" মাতৃভক্ত প্রেমানন্দ মহারাজ বলিলেন : "আমি কি জানি মা, আপনি যা আদেশ করবেন তাই করবো।" শ্রীমা বলিলেন : "তাহলে যাও, এসগে। তবে বেশীদিন থেকো না।" বাবুরাম মহারাজ মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া মালদহ যাত্রা করিয়াছিলেন।

এইভাবে বাবুরাম মহারাজের সকল ঘটনার মধ্যেই দেখা যায় শ্রীমার উপর পূর্ণ-নির্ভরতা ও শ্রীমার আজ্ঞাবহতা। কোথাও যাওয়া বা না-যাওয়া, কোন কিছু করা বা না-করা সকল-কিছুই নির্ভর করিত শ্রীমার নির্দেশ বা আদেশের উপর। প্রেমানন্দ মহারাজের একটি পত্রেও ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন : "শ্রীশ্রীমা মনুষ্যদেহধারিণী হলেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু; জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরুণকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও তাঁর আধার বড়। তিনি শক্তিস্বরূপিণী কিনা? তাঁর চাপ্‌বার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকুরুণের ভাবসমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাকেও তা তিনি জানতে দেন না।" শ্রীশ্রীঠাকুরও শ্রীমার দিব্যস্বরূপের কথা বহুবারই বহুভাবে তাঁহার

সন্তান ও ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এমনকি বলিতেন: "ও রাগলে আর রক্ষে নেই। ও সরস্বতী, রূপ ঢেকে এসেছে" প্রভৃতি। প্রেমানন্দ মহারাজও শ্রীমার অপ্রাকৃত স্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য কখনও কখনও তিনি শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর অপেক্ষাও উচ্চে স্থান দিতেন। তাই একটি পত্রেও লিখিয়াছেন, আত্মগোপন করিবার শক্তি শ্রীমার মধ্যে অধিক। বরং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভূতি বা শক্তির বিকাশ মাঝে মাঝে দেখা যাইত, কিন্তু শ্রীমা থাকিতেন সকল সময়ে সকল ঐশ্বর্য ও সকল বিভূতিকে ঢাকিয়া সহজ সাধারণ নারীর ন্যায়। কাহারও বুঝিবার সাধ্য থাকিত না যে, শ্রীমা সাক্ষাৎ বিশ্বরূপিণী মহাশক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তিনি কাহারও সেবা না লইয়া বরং নিজেই সকলকে সন্তানবৎ ও নারায়ণবৎ সেবা করিয়াছেন। কত জ্বালা-যন্ত্রণা ও সকলের আদর-আবদার সহ্য করিয়া তিনি সর্বদা নিশ্চিন্ত ও স্থির হইয়া থাকিতেন। যেন অতি-সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ ও অনন্যশক্তিরূপিণী ছিলেন শ্রীমা।

প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে যেরূপ সাক্ষাৎ মহাশক্তিরূপিণী বিশ্বজননী বলিয়া দর্শন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তেমনি ছিল শ্রীমারও অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা প্রেমানন্দ মহারাজের উপর। তবে কি বলিব যে, শ্রীমা প্রেমানন্দ মহারাজকেই বেশী ভালবাসিতেন, অপর কাহাকেও তেমনটি নয়? না, তাহা নহে, কেননা সহস্রকিরণমালী সূর্যদেব যেমন পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের ও সকল জিনিসের উপরই সমান তাপ প্রদান করেন, শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসার অবারিত ও অযাচিত বর্ষণও ছিল ঠিক সেইরূপ। কিন্তু শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসা-বিতরণের রীতি এমনই অদ্ভুত রকমের ছিল যে, সকল সন্তান ও ভক্তই মনে করিতেন যে, একমাত্র শ্রীমা তাঁহাকেই যেন বেশী ভালবাসেন। সত্যই বিচিত্র ও অনন্যসাধারণ ছিল করুণাময়ী শ্রীমার স্বরূপ ও প্রকৃতি।

শ্রীমার স্বরূপের পরিচয় দিয়া একদিন স্বামী কেশবানন্দকে প্রেমানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন: "তোমারা দেখেই তো এলে,

রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, আর ভক্তদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন। তিনি অত কষ্ট করছেন গৃহীদের গাহস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য। কি অসীম ধৈর্য, কি অপরিসীম করুণা ও সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!” অপর একটি পত্রে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমার পরিচয় দিয়া লিখিয়াছিলেন: “শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু মার? তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। এ'কি মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা! জয় শক্তিময়ী মা! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছিনে, সব মার নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি; অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস? স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। তিনিও কত ‘বাজিয়ে, বাছাই করে’ লোক নিতেন। আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের খাদ্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে! মা! মা! জয় মা! মনে রেখো, সুখে দৈন্যে, সম্পদে বিপদে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, যুদ্ধে বিগ্রহে—সব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা, সেই অপার করুণা! জয় মা! জয় মা!”

একদিন মহাশক্তিরূপিণী শ্রীমা ঠিক এইভাবেই কথা বলিয়াছিলেন। জনৈক ভক্তসন্তান শ্রীমাকে অনুযোগ করিয়াছিলেন: “ঠাকুরের কাছে যারা যেত, তাদের কত ভাবসমাধি এ'সব হত। আপনি তো আমাদের সে রকম কিছুই করছেন না।” শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন: “সে আর কটিকে করেছিলেন? তাও কত বেছে। তাতেই তাঁর শরীর এত শিগ্‌গির গেল। আমার কাছে পিঁপড়ের সার ঠেলে দিয়েছেন। আমি যদি অমনটি করি, তবে ক'দিন এ' শরীর থাকবে? আমার কত ছেলেকে দেখতে হচ্ছে।”

যাহা হউক জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানে মর্মন্তুদ বিরহ-যন্ত্রণার মতো আরও বহু যন্ত্রণা শ্রীমাকে সর্বংসহা ধরণীর ন্যায় সহ্য

করিতে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সকল সন্তানগণকে দেখিবার ও লালনপালন করিবার ভার শ্রীমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমাও বিশ্বমাতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্তরঙ্গসন্তান ও ভক্তবৃন্দকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণসৌরমণ্ডল রচিত। কিন্তু ধীরে ধীরে সৌরজগৎ হইতে এক একটি জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইতে লাগিল। তবে এই বিচ্যুতি বা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অপরূপ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সেই বৈশিষ্ট্য হইল জ্যোতিষ্কগুলি কেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন না হইয়া কেন্দ্ররূপী শ্রীরামকৃষ্ণস্বরূপেই বিলীন বা মিলিত হইতে লাগিল। ত্রিকালদর্শী মহাসরস্বতীরূপিণী শ্রীসারদাদেবী সেই রহস্য অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন এবং পারিয়াছিলেন বলিয়াই মায়ার সংসার ও মায়িক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের লীলাখেলাকে তিনি পরিত্যাগ না করিয়া বরং বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। নিত্য তাঁহার স্বরূপ হইলেও লীলায় অবতারণকে তিনি মাধুর্যময় করিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য দেখা যায়, স্নেহের সন্তান প্রেমানন্দ মহারাজের মহাসমাধির নিদারুণ সংবাদ যখন শ্রীমার নিকটে উপস্থিত হইল তখন শ্রীমা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন: "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।" তাঁহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরেরছবির পায়ে মাথা রাখিয়া কাতরকণ্ঠে পুনরায় বলিয়াছিলেন: "হায়, ঠাকুর তাকে (প্রেমানন্দকে) নিয়ে গেলেন।" বিশ্বজননীর অহেতুকী অফুরন্ত করুণা ও স্নেহ-ভালবাসা সকলের জন্য, অথচ একটি মাত্র সন্তানের জন্য তাঁহার এত কাতরতা ও অন্তরবেদনা কেন—এই কথাই হয়তো মনে করিব সীমায়িত দৃষ্টি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমরা। কিন্তু প্রেমানন্দ মহারাজ ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই অন্যতম অন্তরঙ্গপার্ষদ এবং এই মর্মকথা শ্রীসারদাদেবীর নিকট অবিদিত ছিল না। সেইজন্য প্রিয়তম লীলা-

পার্ষদের অন্তর্ধানে মহাশক্তিরূপিণী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনীর অন্তরে সামান্য অধৈর্য দেখা দেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং স্বাভাবিকই। বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার মায়ার আকর্ষণকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইলে সৃষ্টির বিলাস তো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেইজন্য পুরুষের সমবেদনা ও সহায়তা লইয়া ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অনন্ত সৃষ্টিখেলা এবং পরমশিবের ভিন্নরূপ লইয়া মহাশক্তি মহাকালীর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নৃত্যের খেলা ও অভিনয়। এবং সেইজন্যই বলি রহস্যময়ী শ্রীমা সারদার অপার্থিব ভাবপ্রকৃতি নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন: "নিরঞ্জনের শ্রীরামচন্দ্রের অংশে জন্ম।" নিরঞ্জন মহারাজ সেইজন্য ক্ষত্রিয়বীর্যসম্পন্ন একটু উগ্রপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁহার শীরর ছিল দীর্ঘ, সুঠাম ও সবল। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রাহ্মানন্দ মহারাজের মতো নিরঞ্জনানন্দ মহারাজও শরীরচর্চার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি সম্পূর্ণ অনমনীয় চরিত্রের উগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তাহা নহে। আচার্য শঙ্করের বেদান্তসূত্রের উপর ভাষ্য গম্ভীর হইলেও যেমন প্রসন্ন ছিল, তেমনি নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের শরীর ও প্রকৃতি বাহিরে সুদৃঢ় ও কিছুটা উগ্র-গম্ভীর দেখাইলেও অন্তরের ভাব ও প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ কোমল, পরদুঃখকাতর, সহনশীল ও ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিনম্র। তবে অনেক সময় হয়তো তাহা বাহির হইতে সহজে বোঝা যাইত না। একজন ভক্তকে লিখিত একটি পত্রে নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীসারদাদেবী লিখিয়াছেন: "নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে, কিন্তু তার মায়ের ওপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়।" মাতৃভক্তি এমনই পরশমণি যে তাহার স্পর্শে শত সহস্র দোষ গুণ হইয়া যায়—'দোষান্ অশেষান্ সগুণী করোষি'। নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ পূর্বাশ্রমেও (গৃহস্থ-জীবনে) অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, গর্ভধারিণী জননীর আদেশ ও উপদেশকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরীর আদেশ বলিয়া গণ্য কবিতেন। সন্ন্যাস-জীবনেও তাহার অনুবর্তন দেখি। গৃহত্যাগ করিয়া যেইদিন হইতে তিনি তাঁহার পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা হইয়াছিলেন তাঁহার জীবনের পরম-আশ্রয় এবং

শান্তি ও সান্ত্বনার আধার। তাহাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননীর আসনে যখন শ্রীমা অধিষ্ঠিতা, তখন নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের সকল প্রচেষ্টা, সকল কর্মের প্রেরণা ও প্রাণকেন্দ্র ছিলেন বিশ্বরূপিণী শ্রীমা সারদা।

নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ শিবশক্তিসমাসক্ত অর্ধনারীশ্বরের মতো শ্রীমার মধ্যেই একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদার দিব্য-আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেন। তাহারই জন্য তিনি শ্রীমার মহিমা ও আদর্শ প্রচার করাকেই একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন পুত্রশোকে বিহ্বল এবং সান্ত্বনা পাইবার আর কোন অবলম্বন তাঁহার ছিল না, তখন নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ গিরিশবাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রথম কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান দেখাইয়া পরে জয়রামবাটী-মহাতীর্থে শ্রীমার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সর্বকল্যাণী শ্রীমার চরণ দর্শন করিয়া গিরিশবাবু অন্তরে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। সর্বশান্তি-দায়িনী শ্রীমা গিরিশবাবুকে আশীর্বাদ করিয়া সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন।

শ্রীমার উপর গিরিশবাবুর অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। অবশ্য 'শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র'-প্রসঙ্গে শ্রীমার প্রতি গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস ও ও ভক্তি কিরূপ ছিল সেই কথা পরে আলোচনা করিব। নিরঞ্জানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন ও কী ভাবে শ্রীমার অপার্থিব মহিমা সকলের নিকট প্রচার করিতেন তাহার একটি প্রমাণ গিরিশচন্দ্রের কথার মধ্যে পাওয়া যায়। একদিন একজন ভক্ত দানাকালির (কালিপদ ঘোষ) বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি আছে, কিন্তু শ্রীমার কোন প্রতিকৃতি নাই। ভক্তটি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দানাকালি করজোড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখাইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিয়াছিলেন: "ইনিই আমাদের মা, ইনিই আমাদের বাবা।" উত্তর শুনিয়া ভক্ত বিস্মিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এবং পরে ঐ ঘটনার আনুপূর্বিক কথা গিরিশ বাবুকেও নিবেদন করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু শুনিয়া ভক্তকে বলিয়া

ছিলেনঃ "আমরাই কি আগে মাকে মানতুম? পরে নিরঞ্জন আমাদের চোখ খুলে দিলো।"

সত্যই নিরঞ্জানন্দ মহারাজ শ্রীমাকেই যে নিছক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতেন তাহা নহে। প্রয়োজন হইলে যুক্তি-তর্কের সাহয্যে তাঁহার বিশ্বাসের যথাযথ কারণ নির্ণয় করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীমার অপার মহিমার ভাব জাগ্রত করিয়া দিতেন। বলিতে কী, তখন ভক্তমহলে অনেকের নিকট শ্রীমা পরিচিত ছিলেন একমাত্র 'গুরুপত্নী' রূপে। কিন্তু তিনি যে সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তিরূপিণী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যলীলাসঙ্গিণী এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি ঈশ্বরীয় লীলাসাধনের জন্য এই রহস্য অধিকাংশ সন্তান ও ভক্ত-শিষ্য প্রথমে অনুধাবন করিতে পারিতেন না। তাহাছাড়া পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীমার জীবনযাপনপ্রণালী ও সকলের সহিত আচরণ ছিল অতি সহজ সাধারণ মানুষের মতো। কাজেই মানবীরূপিণী শ্রীমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী ও জগজ্জননীর জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া ধারণা ও গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ-সাধ্য ছিল না। একজন সিদ্ধসাধক বলিয়াছেনঃ 'কে তোমারে জান্‌তে পারে, তুমি না জানালে পরে।' সত্যই জ্ঞানদায়িনী শ্রীমা দিব্যচক্ষু দান করিয়া আপন অপার্থিব স্বরূপ জানাইয়া বা বুঝাইয়া না দিলে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি যে, তাহা নির্ণয় করিতে পারে। সেইজন্য প্রথম প্রথম এমনকি অন্তরঙ্গসন্তানদিগের পক্ষেও শ্রীমার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা কঠিন হইত। ক্রমে জ্ঞানদায়িনী শ্রীমার পদপ্রান্তে আসিয়া ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহারি কৃপায় সন্তান ও ভক্তদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং তখন মনুষ্যরূপিণী শ্রীমা সারদা যে সামান্যা রমনী নন, কিন্তু অসামান্যা দেবী এবং যুগপ্রয়োজনসাধনের জন্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত পৃথিবীতে তাঁহার আগমন এই রহস্য ধীরে ধীরে সকলে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ-প্রমুখ

শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ, ভক্ত ও কবি গিরিশচন্দ্র এবং আরও অনেকে সেই রহস্যবেত্তাদিগের অন্যতম।

মায়াপাশনির্মুক্ত নিরঞ্জানন্দ মহারাজ শরীরের অসুস্থতাবশতঃ একবার বায়ু-পরিবর্তনের জন্য হরিদ্বার যাইতে মনস্থ করিলেন। হরিদ্বার যাইবার পূর্বে তিনি শ্রীমার নিকট শিশুর ন্যায় আবদার করিয়াছিলেন যে, শ্রীমা যেন তাঁহার সকল-কিছু ভার গ্রহণ করেন। শুধুই তাহাই নহে, হরিদ্বার যাইবার পূর্বে কিছুদিন ধরিয়া তিনি শ্রীমার হস্তে খাইবেন, শ্রীমা তাঁহার জন্য সকল-কিছু করিবেন, শ্রীমা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন ইহাই ছিল অন্তরের আকাঙ্খা এবং সেইজন্য তিনি তখন প্রায় সকল সময় শ্রীমার মুখ চাহিয়াই অপেক্ষা করিতেন। এই ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যেন নিরঞ্জন মহারাজের জীবনে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছিল এবং তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সত্যই তিনি শ্রীমার একটি সহায়-সম্বলহীন অসহায় সন্তান। শ্রীমাই তাঁহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও সহায়-সম্বল এবং শ্রীমা ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও যেন সংসারে তখন জানিতেন না। শ্রীমাও নিরঞ্জন মহারাজের মধ্যে এই ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন।

ক্রমে নিরঞ্জন মহারাজের হরিদ্বার তীর্থে যাইবার দিন মোটামুটি-ভাবে স্থির হইল। একদিকে হরিদ্বারে গিয়া সেখানে থাকিয়া কয়েক-দিন তপস্যা বা ধ্যান-ধারণা করিবেন এবং অন্যদিকে তাঁহার অন্তরে চিন্তা হইল যে, শ্রীমাকে ছাড়িয়াই বা তিনি এক মুহূর্ত থাকিবেন কেমন করিয়া। তুমুল মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া নিরঞ্জন মহারাজ যেন অসহায় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীমারই শরণাপন্ন হওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। হরিদ্বার যাইবার সংকল্প লইয়াই তিনি শ্রীমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। কারণ তাঁহার চিন্তা ও প্রধান সমস্যা হইল শ্রীমাকে ছাড়িয়া তিনি একাকী

থাকিবেন কেমন করিয়া। পরিশেষে কিছু সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীমার পদপ্রান্তে পড়িয়া শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশ্য শ্রীমা পূর্ব হইতেই নিরঞ্জন মহারাজের মধ্যে কিছু পরিবর্তনের ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেজন্যই স্নেহের সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়া হরিদ্বারে কিছুদিন যাইয়া বায়ু-পরিবর্তন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীমার আজ্ঞাই পরিশেষে শিরোধার্য করিলেন। কিন্তু শ্রীমার নিকট নূতন একটি আবদার ধরিয়া বসিলেন যেন শ্রীমা সর্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। শ্রীমা নিরঞ্জন মহারাজের প্রকৃতি বুঝিতেন। সেইজন্য 'তথাস্তু' বলিয়া তিনি তাঁহার অন্তরের সম্মতি জানাইয়া সন্তানকে আশীর্বাদ করিলেন। শ্রীমা দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নিরঞ্জন মহারাজ সম্ভবত হরিদ্বারতীর্থ হইতে আর তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে না এবং ইহাই তাহার শেষযাত্রা। শ্রীমা ছল ছল নেত্রে তাই নিরঞ্জন মহারাজকে বিদায় দিবার সময় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বদা থাকিবেন।

নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীমার প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। কিন্তু হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াই অকস্মাৎ তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন ও জাগতিক সকল সম্পর্ক ও সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি মহাপ্রয়াণের পথে যাত্রা করিলেন। শ্রীমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিই কার্যে পরিণত হইল। মাতৃভক্ত সন্তান যোগানন্দ মহারাজ আর শ্রীমার নিকট স্থূলশরীরে ফিরিয়া আসিলেন না।

ক্রমে সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রীমা ও গুরুভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইল। শ্রীমা তাঁহার স্নেহের সন্তান যোগেন মহারাজের মহাপ্রয়াণে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আকুল প্রার্থনা করিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার পুত্র স্থান পায়। মায়ার সংসারে মহামায়ার রহস্যময়ী লীলা কত মধুর এবং কত প্রাণস্পর্শী তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়!

নবম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ॥

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ও সারদানন্দ মহারাজকে ভগবান যীশুখৃষ্টের লীলাপার্ষদ-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরে বলিয়াছিলেন: "শশি আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষিকৃষ্ণের (যীশুখৃষ্টের) দলে ছিল।" অর্থাৎ শশি মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) দুইজনেই যে তাহার লীলাসহচর, যুগে যুগে তাঁহারা আসিয়াছেন এবং এইবারেও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন এ' রহস্যেরই শ্রীশ্রীঠাকুর পরিচয় দিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম শশীভূষণ চক্রবর্তী এবং সারদানন্দ মহারাজের (পূর্বাশ্রমের নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী) পরম-আত্মীয়। শ্রীমাও সেইজন্য একই সংসারের দুইজন মহাত্যাগী সন্তানকে আপনার পুত্র বলিয়া অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কলিকাতায় শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার জন্য আগমন করেন তখন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য শশী মহারাজ শ্যামপুকুরের বাটীতে থাকিয়া যান। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালিপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ), যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) প্রভৃতি ত্যাগী সন্তানেরা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শ-অনুসারে কাশীপুর-উদ্যানবাটী হইতে শ্যামপুকুরে বাটী ভাড়া করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে আনয়ন করা হইয়াছিল। সেবা ও পথ্যাদি সুব্যবস্থার জন্য শ্রীমাও আসিয়াছিলেন শ্যামপুকুরের বাটীতে। সেই সময়

সহায়তা করিবার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদিগেরও অনেকে শ্রীমার নিকট থাকিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের শ্রীগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আত্মনিবেদনের আদর্শ সত্যই জগতে দুর্লভ। চিকিৎসায় একটু আরোগ্যলাভ করিলে যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুনরায় কাশীপুর উদ্যানবাটিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখনও রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ অন্যান্য সন্তানদিগের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া দিবারাত্র প্রাণ দিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দুরারোগ্য অসুখ-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন: "জগতের দুঃখ দেখে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগভোগ করছেন।" সত্যই তাই। ঈশ্বরের অবতার যাঁহারা, লীলার জন্যই তাঁহারা বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন। মায়ার অন্ধকারে ডুবিয়া মানুষ যখন আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায় ও অনিত্য বস্তুকে নিত্য জ্ঞান করিয়া 'আমার আমার' করে, তখনই তাহাদিগকে অজ্ঞান-অন্ধকার বা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান সাধারণ মানুষের বেশে পৃথিবীতে অবতরণ করেন ও সকলের দুঃখ-বেদনাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তিপথের সন্ধান দেন। ঈশ্বরের অবতরণ বা অবতারতত্ত্বের ইহাই মর্মকথা। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাও তাই।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধানের বেশ কিছুদিন পরে শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান ও ভক্তগণ নিরাশার অন্ধকারে আশায় বুক বাঁধিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ যখন স্থাপিত হয় তখন একদিকে শ্রীমা এক সপ্তাহকাল কলিকাতায় বলরাম বসুর বাটীতে থাকিয়া উত্তর-ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শনের জন্য কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গমন করিয়াছিলেন এবং অন্যদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি ও ব্যবহৃত সকল সামগ্রী বরানগর মঠবাটীতে স্থানান্তরিত করিয়া নিত্য-নিয়মিত-

ভাবে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ তাঁহাদিগের প্রিয়তম আচার্যের পূজা, আরাত্রিক ও সেবাদি কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ও সংসারের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদিগের জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সন্তানগণ তখন পরিব্রাজকবেশে ভারতের পুণ্য-তীর্থস্থানগুলি পদব্রজে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। একবাড়ী কিংবা তিনবাড়ী ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহার পর শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদিগের জীবনে বিরাট পটপরিবর্তন হইয়াছিল। বরানগর হইতে আলমবাজার ও আলমবাজার হইতে ক্রমে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটির নিকটে গঙ্গার পশ্চিম তীরে নূতন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার কিছু পূর্বেই কামারপুকুর হইতে শ্রীমা কলিকাতায় আগমন করিয়া বাগবাজারে বাস করিয়াছিলেন ও মঠের জন্য বেলুড়ে নবনির্বাচিত স্থান দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল বেলুড়ে। এইদিকে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণকর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ।

কিছুদিন শ্রীমা বাগবাজারে অবস্থান করিবার পর দক্ষিণ-ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এদিকে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজেরও অন্তরের একান্ত ইচ্ছা ছিল শ্রীমার পুণ্য-পাদস্পর্শে দক্ষিণ-ভারতের ধূলি-মৃত্তিকা চিরপবিত্র হউক। রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ এই মর্মে শ্রীমাকে একটি পত্র দিয়াও অনুরোধ জানাইয়া-ছিলেন যে, শ্রীমা যেন একবার দক্ষিণ-ভারতে উপনীত হইয়া সেখানকার ভক্ত-শিষ্যগণের আশা পূর্ণ করেন। শ্রীমা অবশেষে দক্ষিণ-ভারতে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন।

সুতরাং হাওড়া ষ্টেশন হইতে ট্রেনযোগে শ্রীমা ভক্তগণ সঙ্গে

মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীমার আগমন-সংবাদ মাদ্রাজের চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। সুতরাং শতসহস্র দর্শনার্থী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের সহিত মাদ্রাজ ষ্টেশনে শ্রীমার আগমন-প্রতীক্ষায় সমবেত হইয়াছিল। শ্রীমা যথাসময়ে মাদ্রাজে উপস্থিত হইলে 'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় মা' প্রভৃতি ধ্বনিতে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীমাকে একটি পত্র-পুষ্পেশোভিত গাড়ীতে করিয়া মাদ্রাজ মঠে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ক্রমে একটি একটি করিয়া দক্ষিণ-ভারতের সকল তীর্থস্থান রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে ঘুরাইয়া দেখাইয়াছিলেন। রামেশ্বরম্-মন্দিরে যখন শ্রীমা উপনীত হইয়াছিলেন তখন সেখানকার নরনারীগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ-প্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছিল। রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ শ্রীমার জন্য একশত আটটি স্বর্ণনির্মিত বিল্বপত্র স্বর্ণকারকে দিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কেননা শ্রীমা আনন্দের সহিত ঐ একশত আটটি স্বর্ণনির্মিত বিল্বপত্র দিয়া রামেশ্বরম্-শিবের পূজা করিবেন। সন্তানের ইচ্ছা শ্রীমা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীমা ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া একশত আটটি স্বর্ণনির্মিত বিল্বপত্র দিয়া রামেশ্বরম্-শিবের পূজা করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং জননীর প্রতি সন্তানের একান্ত নিষ্ঠা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখিয়া শ্রীমা রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকে প্রাণ ভরিয়া সেইদিন আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

রামেশ্বরম্‌তীর্থ দর্শনের পর শ্রীমাকে বাঙ্গালোর সহরে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন, শ্রীমার পুণ্য-পাদস্পর্শে বাঙ্গালোর মঠ চির-পবিত্র হইয়াছিল। দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণকালে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ সর্বদাই ছায়ার ন্যায় শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং প্রত্যহ নিজে সুগন্ধ পুষ্পদ্বারা মাতৃচরণে অঞ্জলি দান করিয়া ধন্য হইতেন। তাঁহার মুখে তখন সদা সর্বক্ষণই 'জয় মা, জয় মা' শব্দ। দক্ষিণ-ভারতে আনন্দময়ী শ্রীমাকে পাইয়া রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ আনন্দে

যেন আত্মভোলা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই মাতৃগতপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দাভিব্যক্তি দর্শন করিয়া সমবেত নরনারী ও ভক্তগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালোরে যখন শ্রীমা ছিলেন তখনকার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। ঠিক সন্ধ্যার পূর্বে আশ্রমের জমির উপর একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিয়া কয়েকজন ভক্তসঙ্গে আপন মনে শ্রীমা সূর্যাস্ত দর্শন করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ সেই কথা শুনিয়া ভক্তি-গদগদ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন: "অ্যাঁ, মা পর্বতবাসিনী" হয়েছেন? এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে তিনি সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীমার চরণযুগলে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন,

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমঽস্তেতে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের ঐরূপ ভাববিহ্বল অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দমুগ্ধ হইয়াছিল।

স্তবপাঠের পর রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ পুনরায় করজোড়ে বলিতে লাগিলেন: "কৃপা, কৃপা"। শ্রীমা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিলেন, রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ একেবারে উন্মত্তপ্রায় এবং বাহ্যজ্ঞান তাঁহার নাই বলিলেই হয়। তিনি সস্নেহে সন্তানের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নীরবে ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। তাহার পর শ্রীমা উপবেশন করিয়া কিছুক্ষণ জপ ও ধ্যান করিলেন। ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া শ্রীমার মনও যেন তখন আনন্দ-

লোকে বিচরণ করিতেছিল। ক্রমে শ্রীমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যই সেইদিন শ্রীমার মধ্যে দেবী মহিষমর্দিনীর পূর্ণ-আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া সকলে ধন্য হইয়াছিলেন এবং সেই দিব্য-আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা-জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীমাও সেইদিন মহাদেবীর ভাবে বহুক্ষণ আবিষ্ট ছিলেন।

ইহার পর বহুদিন গত হইয়াছিল। শ্রীমা দক্ষিণ-ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতায় উদ্বোধনের বাটীতেই বাস করিতে-ছিলেন।

শরীর ত্যাগের দুই-তিনদিন পূর্বে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ কি জানি কেন, শ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য একান্তভাবে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দক্ষিণদেশ হইতে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং শ্রীমাও তখন বাগবাজার হইতে কিছু দিনের জন্য জয়রামবাটী গিয়াছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের একান্ত অনুরোধে জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য জয়রামবাটী গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমা কিন্তু স্নেহের সন্তান রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের অন্তিম অবস্থা শ্রবণ করিয়া কীভাবে স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিবেন এই চিন্তা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হন নাই। তবে শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিলেন না বটে, কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে দর্শন দান করিয়া প্রিয় সন্তানের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া-ছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ মুমূর্ষু অবস্থায় শ্রীমাকে সূক্ষ্মশরীরে দর্শন করিবার পর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেনঃ "ঠাকুর, মা, স্বামীজী এসেছেন, আসন পেতে দে।" কিছুক্ষণ পরে উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় তিনি বলিয়া উঠিলেনঃ "দেখতে পাচ্ছিস না, ঠাকুর এসেছেন, মাদুর পেতে দে, আর তিনটে তাকিয়া দে।" মহারাজের সেবক স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ

হইয়া রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের দিব্যদর্শনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে-ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেনঃ "তাঁরা চলে গেছেন।" রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ধীরে ধীরে দুর্বল হস্ত-দুইটি উত্তোলন করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে তিনবার কাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং কি কথা কহিলেন। সেবক ও গুরুভ্রাতাগণ রহস্যময় দৃশ্যের শুধু দ্রষ্টা হইয়া বসিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীমার নাম ধীরকণ্ঠে বলিতে বলিতে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে তিনি যেন কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন এবং সেই অলৌকিক দিব্যদর্শনের কথা জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন। বলিবার সময় তিনি অতি ধীরে তাঁহাকে একটি গানের প্রথম চরণটি উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "পোহালো দুঃখ-রজনী।" তাহার পর তিনি মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে দিয়া ঐ গানের বাকী অংশ পূর্ণ করিয়া একটি গান রচনা করিয়া দিবার জন্য ভক্তকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভক্ত পরে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের সেই অন্তিম ইচ্ছার কথা একদিন গিরিশচন্দ্রকে জানাইলে গিরিশবাবু ঐ প্রথম লাইনটিকে অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ একটি গান রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই গানটি হইল,

পোহাল দুঃখ-রজনী,
গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন ;
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ ;
হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী।
বরাভয়করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান,
গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি, শমনবিজয় ; মার নামে পূর্ণ অবনী॥
কহিছে জননী, 'কেদো না, রামকৃষ্ণপদ দেখ না।

নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা’ ;
(হের) মম পাশে করুণার দুটি আঁখি ভাসে ;
ভুবন-তারণ গুণমণি ।[১]

ভাবে ও ভাষায় গানটি রসসমৃদ্ধ হইয়াছিল এবং গানটির মর্মকথা যেন জীবন্মুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জীবন-রহস্যের পরিচয়েই মুখর হইয়াছিল।

যাহাহউক আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে করিতে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জীবনদীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হইয়াছিল এবং সমবেত গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণকণ্ঠে ধ্বনিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর নাম গুরুগম্ভীর ওঙ্কারধ্বনির সঙ্গে ঊর্ধ্বলোকে মিলাইয়া যাইতেছিল।

ক্রমশ সেই নিদারুণ সংবাদ চতুর্দিকে ভক্তসমাজে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীমার নিকটও ঐ সন্তানবিয়োগের সংবাদ উপস্থিত হইল। শ্রীমা শুনিয়া একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন : “শশি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙে গেছে।” সত্যই শশি মহারাজ তথা রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের মহাসমাধির সংবাদে সন্তানবৎসলা শ্রীমার মন বিশেষভাবে ব্যথিত হইয়াছিল।

১। এই গানটির রচনা-সম্বন্ধে একটি ভিন্ন মতও আছে। শ্রীমাকে সূক্ষ্মশরীরে দর্শন করিবার পর রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ গিরিশচন্দ্র ঘোষকে ডাকাইয়া আনিয়া গানের প্রথম ছত্র ও গানের ভাবটি স্বয়ং বলিয়া দিয়া গানটি রচনা করিতে বলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে গিরিশচন্দ্র গানটি রচনা করেন। পরে গানটি শুনিতে শুনিতে বা শুনিবার পরেই রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ দেহরক্ষা করেন।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ ॥

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে দেখি, লাটু মহারাজ তথা স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ একজন ভক্তকে বলিতেছেন: "জানো! ঠাকুর হামাকে টেনে নিলেন। হামি একটা অনাথ, কুথাকা'র কে— হামায় তিনি ভালবাসা ঢেলে দিলেন। হামায় তিনি কৃপা না করলে হামাকে নকরী করতে করতে বকরী বনে যেতে হোত; হামার সারাজীবন বিলকুল লষ্টো হোয়ে যেতো।" পুনরায় বলিয়াছিলেন: "জানো, হামার যা-কুছু, সব তাঁর দৌলতে। হামার মত মুখ্যুর কি আর সাধন করবার দিল্ থাকতো? হামি সাধনার কি জানে? হামাকে তিনিই তো সব সাধন-ভজন দেন। হাম্‌নি তো কেবল তাঁর সেবক হোতে চেয়েছিলুম; বাকী তিনিই তো আমাকে সাধন-ভজন শিখালেন। হাম্‌নি তো জানে না তখন সাধন-ভজনে লাভ কি? উনিই তো হামাকে শুনালেন রামজীর ব্যাপার।" এই সহজ সরল কথাগুলি হইতে অদ্ভুতানন্দ মহারাজের জীবনকথা ও জীবনরহস্যের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

লাটু মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রাখতুরাম। তিনি ছাপরা জেলার অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতায় রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে তিনি গৃহকর্ম করিতেন। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব লৌহকে স্পর্শ করিয়া স্বর্ণে পরিণত করিয়াছিলেন। করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিরক্ষর নিরীহ লাটুকে কৃপা করিয়া চরণে স্থান দিয়াছিলেন এবং আপনার দিব্যলীলার সহচর করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন আপন জীবনাদর্শ দিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে দেখাইলেন যে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অবিদ্যারই

সমান, উহার সাহায্যে সংসারবন্ধনের পারে গিয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞানে জীবনকে ধন্য করা যায় না এবং একমাত্র অবিদ্যানাশী ব্রহ্মবিজ্ঞানই মানুষকে শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে, তেমনি নিরক্ষর অথচ সাধনসিদ্ধ লাটু মহারাজকে দিয়া বিশ্বে প্রমাণ করিলেন যে, গ্রন্থ গ্রন্থিবিশেষ, অবিদ্যার শৃঙ্খল গ্রন্থবিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা ছিন্ন করা যায় না, পাণ্ডিত্যের পারে ও মন-বুদ্ধির পারে অজ্ঞান-তিরস্করণী ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র মানুষকে চিরদিনের জন্য আলোকস্নাত করিতে পারে।

লাটু মহারাজের প্রতি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহেতুকী কৃপা ও করুণা ছিল এবং সেই অহেতুকী কৃপার কথায় এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে নিরক্ষর ও আচার্যসেবাপরায়ণ হস্তামলকের কথা। হস্তামলকও ভগবান শঙ্করাচার্যের অহেতুকী কৃপা ও করুণা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানবরিষ্ঠ তোটকাচার্যে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং অধ্যাত্মসাধনার জগতে এ'কথাই সত্য যে, মুক্তি ও জীবনসিদ্ধির জন্য গুরুকৃপার প্রয়োজন আছে। অদ্বৈতবেদান্তের আচার্যরাও বলেন: "অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ", অর্থাৎ সূক্ষ্মজ্ঞানবিচার বা নেতি নেতি-মার্গে বিচার করিতে করিতে জাগতিক সকল সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানদাতা গুরুকে কখনই অস্বীকার করিতে নাই, কারণ গুরু অভীষ্টদেবতা ইষ্টেরই প্রতিমূর্তি। গুরুই জ্ঞানমূর্তি ব্রহ্ম; সুতরাং অধ্যাত্মসাধনার জগতে জ্ঞানদাতা গুরুর কৃপা ও করুণা অস্বীকার করার বস্তু নয়। একটি ভক্তবাণীতেও দেখি,

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা ত্বমহং বন্দে
পরমানন্দমাধবম্॥

'গুরু ও ঈশ্বরের কৃপা হইলে মূক বা বোবাও বাচাল বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব হে পরমানন্দস্বরূপ মাধব-শ্রীকৃষ্ণ,

তোমায় প্রণাম করি, বন্দনা করি ও তোমার শরণাগত হই, আমায় কৃপা কর'! জীবনসিদ্ধির পথে ইহাও মূলমন্ত্র। সাধনজীবনে পুরুষকার প্রবল হইলেও কৃপার (grace) একটি উপযোগিতা বা সার্থকতা আছে। অদৃষ্টের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তবে ঈশ্বরানুগ্রহের আসনে যদি অদৃষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে তাহারও প্রয়োজনীয়তা আছে। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে দেখি যে, কৃপার জন্য শ্রীশঙ্কর-শিষ্য হস্তামলক পূর্ণজ্ঞানী তোটকাচার্যে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান লাটু মহারাজ বা রাখতুরাম অদ্ভুতানন্দে পরিণত হইয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবীও বলিতেন, অদ্ভুতানন্দের জীবনের সকল-কিছুই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর।

লাটু মহারাজ বা অদ্ভুতানন্দ মহারাজ স্নেহ-ক্ষমাময়ী শ্রীসারদা-দেবীর একান্ত অনুগত সন্তান ও সেবক ছিলেন। একবার কাশীতে যখন শ্রীমা অবস্থান করিতেছিলেন তখন শ্রীমার প্রতি অদ্ভুতানন্দ মহারাজের একটি 'গোপন ভক্তি'-র পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 'গোপন ভক্তি' বলিতেছি এইজন্য যে, সে ভক্তির কোন বাহ্যপ্রকাশ বা বাইরের অভিব্যক্তি ছিল না, ছিল একমাত্র অন্তরের মণিকোঠায় লুকানো গভীর শ্রদ্ধা ও মাতৃভক্তির অন্তঃসলিলধারা—যে ধারা বা প্রবাহকে ঠিক ভাষা দিয়া ব্যক্ত করা ও বুঝানো যায় না। অদ্ভুতানন্দ মহারাজ অনেক সময় লোকদেখানো কৌতুক ও কটাক্ষ করিয়া অনেককে বলিতেন: "তোদের মা-ঠাউনকে হামি মানে নে।" অকস্মাৎ শুনিয়া অনেকে হয়তো একটু ভিন্নভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন। একদিন লাটু মহারাজ কতকগুলি বিল্বপত্র লইয়া কাশী-বিশ্বনাথের পূজা করিতে যাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি মনে মনে বলিয়া উঠিলেন: "চল, আগে মার কাছে যাই।" তিনি শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে মাতৃচরণে বিল্বপত্রাঞ্জলি দিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ লাটু মহারাজের সেই অবস্থা ও কাণ্ড দেখিয়া শ্রীমা বিস্মিত হইলেন।

শ্রীমা তাঁহার অবোধ সন্তানকে প্রবোধ দান করিয়া মস্তকে হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেনঃ “কি বাবা লাটু, ব্যাপার কি?” লাটু মহারাজ বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেনঃ “জ্যান্ত শিবের পূজো হলো মা।” শ্রীমা হাসিয়া বলিলেনঃ “তাই নাকি?” তাহার পর লাটু মহারাজকে শ্রীমা প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

একবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-উপলক্ষ্যে জয়রামবাটী হইতে ফিরিয়া শ্রীমা বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। লাটু মহারাজও তখন শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সময়ে লাটু মহারাজ প্রায়ই বেদান্ত-বিষয়ে বিচার করিতেন। বেদান্তশাস্ত্র বিন্দুবিসর্গও তিনি পড়েন নাই, কিন্তু শুনিয়া ও অনুভূতির দৃষ্টিতে বেদান্তের সকল গভীর তত্ত্ব ও মীমাংসাই লাটু মহারাজের অধিগত হইয়াছিল। কাজেই লাটু মহারাজের নিকট বেদান্ত-বিচার সাধারণত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও স্বাভাবিক হইয়াছিল। বলরাম-মন্দিরে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শ্রীমা যখন পুনরায় জয়রামবাটীতে যাইবেন স্থির হইল তখন অগত্যা লাটু মহারাজ নিজের মনের অভিমান ঢাকিবার জন্য নিজের ঘরে উচ্চৈঃস্বরে বেদান্ত-বিচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমাকে শুনাইয়া বিচার করিতেছিলেনঃ “সন্ন্যাসীর কে পিতা, কে মাতা?—সন্ন্যাসী নির্মায়া।” শ্রীমা তখন উপরে নিজের ঘর হইতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিলেন। তিনি লাটু মহারাজের অদ্ভুত বেদান্ত-বিচার শুনিয়া একটু দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ “বাবা লাটু, তোমায় আমাকে মেনে কাজ নেই বাবা।” লাটু মহারাজ বুঝিলেন, ‘কে মাতা’ বিচার শুনিয়া করুণাময়ী শ্রীমা অন্তরে ব্যথা পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীমা ভালভাবেই জানেন যে, তাঁহার স্নেহের লাটু শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার মাতা ব্যতীত অন্য আর কাহাকেও জানে না। শ্রীমার স্নেহপূর্ণ কথায় লাটু মহারাজের চমক ভাঙ্গিল। তাঁহার বেদান্ত-বিচার তখন কোথায় ভাসিয়া গেল এবং শ্রীমার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া তিনি

কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমাও সরলা বালিকার ন্যায় লাটু মহারাজের সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন। মাতা ও পুত্রের সেই স্নেহ-ভালবাসার অভিনয় দেখিবার ও উপভোগ করিবার মতো দৃশ্য ছিল। কিন্তু লাটু মহারাজ শ্রীমার চক্ষে জল দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিজের চক্ষু মুছিয়া শ্রীমাকে প্রবোধ দিতে দিতে বলিলেন: "বাপের ঘরে যাচ্ছ মা, কাঁদতে আছে কি?" এই কথা বলিয়া নিজের উত্তরীয় দিয়া লাটু মহারাজ শ্রীমার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন। শ্রীমা তখন শান্ত, স্থির ও আনন্দময়ী। করুণায়, প্রসন্নতায় ও ভালবাসায় যেন তাঁহার মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্নেহের সন্তানগণের সহিত স্নেহময়ী সন্তানবৎসলা শ্রীমার এই ধরণের কত লীলাখেলাই না কতবার হইয়াছে। লীলা যে রহস্যময় তাহা শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনঘটনা লক্ষ্য করিলে বেশ বোঝা যায়।

লাটু মহারাজ বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রীমা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী ভগবতী, মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণলীলাকে পূর্ণ ও সার্থক করিবার জন্য। এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় পাই আমরা লাটু মহারাজের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কথায় ও আচরণে। একদিন এক ভক্তকে লাটু মহারাজ বলিতেছেন: "কেউ কুচ্ছু করবে না, কেবল মা-ঠাউন, মা-ঠাউন বলে হুজুগ করবে। হামনে মানে না তোদের এমন মা-ঠাউনকে। মাকে মানা কি সহজ কথা রে! তাঁর (ঠাকুরের) পূজা তিনি গ্রহণ করেছেন, বুঝো ব্যাপার! মা-ঠাউন যে কি তা একমাত্র তিনি (ঠাকুর) বুঝেছিলেন। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে বহুৎ তপস্যার দরকার।" কথাগুলির মধ্যে শ্রীমার প্রতি লাটু মহারাজের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব বুঝিতে পারা যায়।

আর একদিনের ঘটনা। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা যখন নহবৎঘরে থাকিতেন তখন শ্রীমাকে একান্তভাবে একাকী নির্জনে জীবনযাপন করিতে হইত। তখন তাঁহাকে ভক্ত-সন্তানদিগের আহারের জন্যও

ব্যবস্থা করিতে হইত। একদিন লাটু মহারাজ গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন, সেই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন: "ওরে লেটো, তুই এখানে বসে আছিস, আর উনি যে নহবতে রুটিবেলার লোক পাচ্ছেন না।" লাটু মহারাজ সসব্যস্তে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁহাকে শ্রীমার নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন: "এ' ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ত্ব। তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে, একে বলো, এ' করে দেবে।" এই ঘটনা বহু পূর্বেকার, তখন সবেমাত্র লাটু মহারাজ প্রথম শ্রীমার সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরই শ্রীমাকে সেবা করিবার অধিকার লাটু মহারাজকে দান করিয়াছিলেন। যাহাহউক সেইদিন হইতে লাটু মহারাজ আনন্দের সহিত শ্রীমার বিবিধ কর্মে ও সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, লাটু মহারাজ শ্রীমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী এবং নিজের গর্ভধারিণী মার মতো জ্ঞান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাই লাটু মহারাজের মনে যখন কোন দুঃখ বা অভিমান উপস্থিত হইত তখন তিনি শ্রীমার আশ্রয় লইয়া মনে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করিতেন। বলিতে গেলে লাটু মহারাজ তখন হইতে শ্রীমার সঙ্গে যেন ছায়ার মতো থাকিতেন। দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকিলে, কিংবা কোন দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলে, লাটু মহারাজ শ্রীমার সঙ্গে যাইতেন। মনে পড়ে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীমা যখন স্থান-পরিবর্তনের জন্য বৃন্দাবনধামে গিয়াছিলেন তখন মাতৃভক্ত লাটু মহারাজ শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন। অবশ্য তখন আরও অনেক ভক্ত-সন্তান শ্রীমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে থাকিবার সময় লাটু মহারাজের আহার-বিহারের দিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। অনেক সময়ে নিজের খাবার-দ্রব্য বানরদের খাওয়াইয়া দিতেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব কবিলে তবে শ্রীমার নিকট গিয়া কিছু খাবারের জন্য আবদার করিতেন, শ্রীমাও সসব্যস্ত হইয়া তাঁহার অবোধ

সন্তানের জন্য খাবারের ব্যবস্থা নিজের হাতে করিয়া দিতেন। একান্ত শিশুর ন্যায় সরল স্বভাব ছিল বলিয়া লাটু মহারাজ মধ্যে মধ্যে অভিমানও করিতেন এবং সেই অভিমান তিনি একমাত্র শ্রীমার উপরই করিতেন। অত্যন্ত অভিমান হইলে অনেক সময় শ্রীমা লাটু মহারাজকে নিজের কাছে বসাইয়া আদর-যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন এবং তাহা হইলেই লাটু মহারাজের সকল অভিমান দূর হইয়া যাইত।

একবার বৃন্দাবনে লাটু মহারাজ কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনদিন যমুনাপুলিনে একাকী তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীমা লাটু মহারাজের জন্য ভাবিয়াই অস্থির। শ্রীমা ক্রমশ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। লাটু মহারাজের কিন্তু কোনই খোঁজখবর ছিল না। তিনদিন অতীত হইলে লাটু মহারাজ শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাথার চুল উস্‌কো-খুসকো, মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ ও শুষ্ক। লাটু মহারাজকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া শ্রীমা সসব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন: "কোথা ছিলে লাটু?" লাটু মহারাজ বলিলেন: "মা, ঐ নদীর ধারে ছিলুম।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সরল বালকের ন্যায় আবার বলিলেন: "বড় খিদে পেয়েছে মা, কুছু খাবার দিন।" শ্রীমার নিকট তখন কিছুই ছিল না, সুতরাং কি দিবেন শ্রীমা ভাবিয়াই অস্থির। যাহাহউক তাড়াতাড়ি খুজিয়া-পাতিয়া ঘরে যাহা ছিল শ্রীমা তাহাই আনিয়া দিলেন। লাটু মহারাজ শান্ত শিষ্ট বালকের ন্যায় খাবার খাইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন। শ্রীমা নীরবে লাটু মহারাজের সকল-কিছু ভাব লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন: "লাটুর সবই অদ্ভুত।"

একবার কোন সময়ে জনৈক ভক্তকে শ্রীমার প্রসঙ্গে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন: "দেখ্‌তো, মায়ের কৃপায় হামাদের তীর্থে যাওয়া হলো। এমোন ভালবাসা দিয়ে শ্রীমা হামাদের সব বাঁধিয়ে রেখেছেন।" যথার্থই শ্রীমা তাঁহার সকল ভক্ত-সন্তানদিগকে অনন্ত স্নেহ-ভালবাসার ডোরে নিবিড়ভাবে চিরদিন বাঁধিয়া রাখিয়া-

ছিলেন। ভক্ত-সন্তানদিগের কথাও তাই, তাঁহারাও শ্রীমা ব্যতীত বিশ্বসংসারে আর আপনার বলিয়া কাহাকেও চিনিতেন না বা জানিতেন না। লাটু মহারাজের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কোন ভাল জিনিষ পাইলে লাটু মহারাজ সর্বাগ্রে শ্রীমার কথাই মনে করিতেন এবং তাহা শ্রীমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তবে মনে শান্তি পাইতেন।

লাটু মহারাজ যখন কাশীতে থাকিতেন তখন যে কোন ভক্ত কাশী হইতে কলিকাতায় আসিত তাহার সহিত সযত্নে শ্রীমার জন্য কয়েকটি কাশীর বেগুন ও পেয়ারা পাঠাইয়া দিতেন এবং শ্রীমাকে দিবার জন্য তাহাঁকে শ্রীমার পরিচয় দিয়া বলিতেন: "দেখো, হামার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা।" লাটু মহারাজ এমনই অন্তরের নিবিড় আকর্ষণে 'হামার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা' কথাগুলি বলিতেন, শুনিলে পুলকে সর্বশরীর আপ্লুত হইয়া যাইত এবং সেই ভক্তের নিকট হইতে শ্রীমা যখন লাটু মহারাজের ঐ কথা শুনিতেন তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন। জননী ও সন্তানের মধ্যে সেই নিবিড় মধুর সম্পর্ক সত্যই অতুলনীয় ও বর্ণনার অতীত। লাটু মহারাজের শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রসঙ্গে একবার শ্রীমা একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন: "লাটু কি কম গা? লাটুর সেবা কর। সে সময় (দক্ষিণেশ্বরে) লাটু আমার কত কাজ করত। লাটুর সেবা করলে তোমার কল্যাণ হবে।"

লাটু মহারাজের জীবনের কর্ম ও আচরণ সত্যই অদ্ভুত ছিল। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে 'স্ত্রীয়াঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎষু',—জগতে সকল স্ত্রীলোকই মাতৃজাতি ও জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি। লাটু মহারাজ সেই আদর্শ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন এবং সেই আদর্শ তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহার বিশ্ববরেণ্য আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও বিশ্বরূপিণী মা শ্রীসারদার নিকট। তাঁহারই জন্য লাটু মহারাজ বিশ্বের নারীজাতির আদর্শ-সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া প্রায়ই বলিতেন: "তোমরা সীতা, সাবিত্রী, গার্গীকে আদর্শ কর এবং

এ'যুগে শ্রীমাকে আদর্শ কর। মা আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন। দেখছ না, মাকে জানবার জন্য আমি কত তপস্যা করছি। মা কি আমার সোজা জিনিষ! তোমরা মাকে আদর্শ কর।" আবার কখনও কখনও স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন: "তোমরা মাকে জানো। মাকে আদর্শ করো। কেবল মুখে মা মা বললে হবে না।"

কাশীতে থাকিবার সময় একবার আলমোড়া হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ লাটু মহারাজকে আলমোড়া যাইতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। লাটু মহারাজ তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন: "জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা এখানে (কাশীতে) বিরাজ করেছেন। তাঁদের ছাড়িয়ে হামি কুথাও যাবে না।" আহা কি সরল বিশ্বাস ও কি নিবিড় শ্রদ্ধা! লাটু মহারাজ বিশ্বাস করিতেন, কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা সর্বদা বিরাজমান। তাহার উপর অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য পদধূলিস্পর্শে কাশী স্বর্গভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং পুণ্যক্ষেত্র কাশী-বারাণসী ছাড়িয়া লাটু মহারাজের কোথাও কোনদিন যাইবার ইচ্ছা ছিল না।

১৩১৯ সালে মহাসমাধিতে কাশীধামে লাটু মহারাজ দেহরক্ষা করেন। শ্রীমার আদরের সন্তান লাটু মহারাজের চিরপবিত্র শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মা তাঁহার আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে চিরদিনের জন্য মিলিত হইয়াছিল। শ্রীমার কর্ণে যখন লাটু মহারাজের মহাপ্রয়াণের সংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীমা তখন কেবল নীরবে কয়েক ফোঁটা তপ্ত চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী তুরীয়ানন্দ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ 'জীবন্ত বেদান্ত'। তাহারি জন্য মূর্তিমান বেদান্তকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জ্বলন্ত নিদর্শনরূপে পাশ্চাত্যবাসীর সমক্ষে উপস্থাপন করিবার জন্য স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাইবার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

তুরীয়ানন্দ মহারাজ প্রথমে অদ্বৈতবেদান্তের নেতি নেতি-মার্গের যুক্তি-বিচার লইয়াই থাকিতেন। দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য-সংস্পর্শ যখন তিনি লাভ করিলেন তখন তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়া হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় কথায় ও উপদেশে, উদার ভাবধারায় এবং বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরাধ্যা দক্ষিণেশ্বরী শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতি আকর্ষণ ও তাঁহার মুখে অহরহঃ মাতৃনাম শুনিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। একদিনের কথা, হরি মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর একজন বেদান্তের পণ্ডিতকে বলিতেছেন: "কিছু বেদান্ত শোনাও"। পণ্ডিত প্রাঞ্জল ও সুন্দর করিয়া বেদান্ততত্ত্ব সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও মনঃসংযোগ-সহকারে তাহা শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতের সুখ্যাতি করিয়া সমবেত ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: "আমার কিন্তু বাপু অত শত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আর আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-

ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে কিন্তু মা আর আমি, আর কিছুই নাই।" হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐকথা একমনে শুনিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই সরল বিশ্বাস দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 'তোমাদের ঐ বেদন্তের ত্রিপুটী অপেক্ষা আমার মার নাম ভাল লাগে', তুরীয়ানন্দ মহারাজের সূক্ষ্মবিচারশীল মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া বলিল 'মার নাম আমারও ভাল লাগে'।

তখন হইতে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বেদান্ত-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে জগজ্জননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিও আকৃষ্ট হইতেছিলেন। পূর্বে স্ত্রীজাতিকে দেখিলে যে হরি মহারাজ সসম্ভ্রমে একটু পাশ কাটাইয়া চলিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য-সংস্পর্শে আসিয়া এবং জগজ্জননী ও নারীজাতির উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া ধীরে ধীরে নারীজাতিকে তিনি মাতৃজাতি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও হরি মহারাজ কি চক্ষে দেখিতেন ও কিভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইতে কিছুটা অনুধাবন করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ একবার তুরীয়ানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বল।" তাহার উত্তরে তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন ঃ "কি আর বলব ?" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥

অসামান্য চরিত্র লীলামাধুর্যময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে কিছু বলা যে সাধারণ বুদ্ধির অতীত একথাই তুরীয়ানন্দ মহারাজ সংস্কৃত

শ্লোকের মধ্য দিয়া স্বামীজীকে বুঝাইয়াছিলেন। স্বামীজীও তাহা শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ পরবর্তী জীবনে মাতৃভাবে এতই মাতোয়ারা হইয়াছিলেন যে, তিনি সকল অবস্থায় সকল সময়ে শ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি বলিয়া দর্শন করিতেন। সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবী যে তাঁহার সন্তানদিগের পালয়িত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী, তুরীয়ানন্দ মহারাজ তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য শ্রীমার কথা স্মরণ করাইয়া প্রায়ই বলিতেন: "আশ্রমে কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চলতে থাকুক।" একজন ভক্তকে লিখিত একটি পত্র হইতে শ্রীমা সম্বন্ধে হরি মহারাজের অন্তরের কথা বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়। হরি মহারাজ সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন: "শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তাঁহার কৃপায় সকল বিষয়ই জানিতে পারিবে। গুরু, ইষ্ট অভেদ—এ' তত্ত্ব তিনিই কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন। গুরুই ইষ্টরূপে প্রতীত হন, অর্থাৎ গুরুর মধ্যেই ইষ্টদর্শন হয়। শক্তিহিসাবে উভয়েই এক, ক্রমে উপাসনা করিতে করিতে এই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইহা হইতেই মন বুঝিয়া লইবে। তাঁহার প্রতি শুদ্ধ-বুদ্ধি কর, সকল বন্ধন ছুটিয়া যাইবে।"

তুরীয়ানন্দ মহারাজ শ্রীমার প্রতি কতখানি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহা আর একটি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। সেই পত্রে এক ভক্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন: "শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন—ইহা মহা-আনন্দের সংবাদ। কত লোকই যে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া জুড়াইবে, তাহার সংখ্যা নাই। ধন্য

মার কৃপা! আর কি সহনশীলতা! ব্যাজার-ভাব আদৌ নাই। দিন রাত নিরন্তর লোক আসিতেছে, আর সকলেরই কল্যাণ করিতেছেন অকাতরে। মা আসিলে তুমি ছেলেকে লইয়া কলিকাতা যাইবে সঙ্কল্প করিয়াছ, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার চরণ-প্রান্তে তোমার পুত্রকে কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া তুমি বড়ই এক সুন্দর ভাব প্রকাশ করিয়াছ। এইরূপেই স্ত্রী, ধন, জন, এমন কি নিজেকেও তাঁহার পদে অর্পণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়। ভক্তের বাঞ্ছা ইঁহারা আপনারাই পূর্ণ করিয়া থাকেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ বহুদিন কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন এবং শিবপুরী কাশীধামেই মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে মিলিত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হইয়া বলিয়াছিলেন: "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সব সত্য—সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ! বল তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।" অপূর্ব এই কথা ও অপূর্ব এই অনুভূতি। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি করিয়া তুরীয়ানন্দ মহারাজ নিজে ব্রহ্মানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মময় হইয়াছিলেন। বেদান্তে আছে, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি', অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুকে জানা বা উপলব্ধি করার অর্থই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাওয়া। কিন্তু ব্রহ্মবস্তুকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া কে আর তাঁহাকে জানিতে পারে, কেননা যিনি জানিবেন তিনিও তো ব্রহ্মস্বরূপ—'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'। যেখানে অভেদ ও অদ্বৈত জ্ঞান, যেখানে জানাজানির ব্যাপার কোনদিনই থাকে না, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, সেখানে কে আর কাহাকে জানিবে? যেখানে একরসসত্তা, সেখানে একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যেরই সত্তা ও অনুভূতিমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) সত্যই ব্রহ্মোপলব্ধির আশীর্বাদ বরণ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে একথা

ভুলিলে চলিবে না যে, ব্রহ্মবিদ্ হরি মহারাজের চক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবী ছিলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মবিদ্‌বরণ্যে হইয়াও হরি মহারাজ শ্রীমাকে জগজ্জননী জ্ঞানে সর্বদা শ্রদ্ধা করিতেন। হরি মহারাজ জানিতেন 'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণাসহ,'—ত্রিভুবনে সকল-কিছু ব্রহ্মচৈতন্যে একরসস্বরূপে থাকিলেও এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্তু মিথ্যা অর্থাৎ চলমান ও অনিত্য হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা নিত্যকালেরই আরাধ্যদেবতা ও আরাধ্যাদেবী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

।। শ্রীমা সারদা ও স্বামী শিবানন্দ ।।

শ্রীমা সারদার অন্যতম সন্তান ছিলেন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল তারকচন্দ্র। সকলের নিকট তিনি 'মহাপুরুষ' নামেও পরিচিত ছিলেন। বয়সে সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে 'তারক-দা' বলিয়া ডাকিতেন।

স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছিলেনঃ "তারক-দা মাদ্রাজে অনেক কাজ করিয়াছেন, বড়ই আনন্দের কথা। মাদ্রাজের লোকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে লিখিয়াছে, 'তারক-দা চমৎকার কাজ করিতেছেন—সাবাস! এই তো চাই'।" স্বামী শিবানন্দ মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মাদ্রাজে ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সিংহলে একটি বেদান্তের কেন্দ্রও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। কাশীতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈতাশ্রম' তাঁহার অন্যতম অমর কীর্তি।

শিবানন্দ মহারাজ তাঁহার পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদাশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার নির্দেশে আপন জীবন গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইবার পর তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। একদিন শিবানন্দ মহারাজ তাঁহার সংসারের উপর বিতৃষ্ণার ভাব ও মনের অন্তঃস্থলের এক গভীর আলোড়নের কথা করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া বলিয়াছিলেনঃ "ভয় কিরে, আমি আছি। স্ত্রী যতদিন বেচে থাকবে ততদিন তাকে দেখা-শোনা

করতে হবে বৈকি। একটু ধৈর্য ধর,—মা সব ঠিক করে দেবেন। বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাবি, আর যেমন বলে দিচ্ছি তেমনটি করবি—তাঁর কৃপায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।”

শিবানন্দ মহারাজ পূর্বাশ্রমে বিবাহিত ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা জানিতেন। একদিন শিবানন্দ মহারাজের মনে মাতৃভাবের অনুরাগ দৃঢ় করিবার জন্য বলিয়াছিলেন: “ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা—অভেদ।” শ্রীমা সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে থাকিতেন। শিবানন্দ মহারাজের মনকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এইরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন। শিবানন্দ মহারাজের বহুদিনের মনের একটি দ্বন্দ্ব সেইদিন দূর হইয়াছিল। তখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীকে শুধু গুরুপত্নীরূপেই জ্ঞান করিতেন না, সাক্ষাৎ জগজ্জননীরূপে দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। একবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-উপলক্ষে শিবানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে লিখিত একটি পত্রে শ্রীমা যে সাক্ষাৎ জগন্মাতা তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছেন: “শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষ রূপে হইল। যদিও তিন দিন অনবরত বৃষ্টি ও ঝড়, তথাপি মার কৃপায় কোন কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমন কি, ভক্তেরা যে সময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্য ধরিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য। পরে যোগেন-মার কাছে শোনা গেল যে, যখনই ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল, অমনি শ্রীমা দুর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন, ‘তাইতো, এত লোক কি করে এই বৃষ্টিতে বসে খাবে? পাতা-টাতা সব যে ভেসে যাবে! মা, রক্ষা কর!’ মাও সত্য সত্য রক্ষা করিতেন; তিন দিনই ঐ রকম।”

বেলুড় মঠে শ্রদ্ধেয় শিবানন্দ মহারাজ যখন সকল কর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন তখন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন ব্রহ্মচারী ছোট-

নগেন কোন একটি অন্যায় কর্ম করায় তাহার সমবয়সীরা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, শিবানন্দ মহারাজ তাঁহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। ভীত ব্রহ্মচারী কাহাকেও কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে শ্রীমার নিকট জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীর রুক্ষ চেহারা ও জীর্ণ মলিন বস্ত্র দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন, সুতরাং কেহ কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে নাই। কিন্তু শ্রীমা ব্রহ্মচারীর সকল পরিচয় লইয়া ব্যথিত হৃদয়ে তাহাকে দুইখানি সাদা কাপড় ও একখানি চাঁদর ব্যবহারের জন্য দিলেন। তাহার পর ব্রহ্মচারী শ্রীমাকে সকল কথা খুলিয়া বলেন এবং তাহার উপায় করিবার জন্য শ্রীমাকে অনুরোধ করিতে থাকেন। অভয়দায়িনী শ্রীমা ব্রহ্মচারিজীকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দান করিয়া বেলুড় মঠে শিবানন্দ মহারাজকে একখানি পত্র লিখিলেনঃ "বাবাজীবন তারক, ছোট-নগেন তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে। তুমি তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে সে সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে আমার কাছে চলে এসেছে। তা বাবা, মায়ের কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে? তুমি বাবা, তাকে কিছু বলো না।" কিছুদিন পরে শ্রীমার পত্রের উত্তর আসিল। স্বামী শিবানন্দ মহারাজ শ্রীমার পত্র পাইয়া সসম্ভ্রমে লিখিয়াছিলেনঃ "মা, ছোট-নগেন আপনার নিকট গিয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমরাও খোঁজাখুঁজি করিতেছিলাম—কোথায় গেল। তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন। এখানে পূজার জন্য লোকের অভাব। আমি তাহাকে কিছুই বলিব না।"

পত্রের উত্তর পাইয়া শ্রীমা ব্রহ্মচারীকে আশীর্বাদ করিয়া বেলুড় মঠে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী মঠে উপস্থিত হইলে শিবানন্দ মহারাজ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেনঃ "ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি?" সত্যই শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসা ও আশীর্বাদ যিনি একবার পাইয়াছেন, তিনি

আর তাহা জীবনেও কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। তাহার পর সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মার কাছে ছেলের যত দোষই থাকুক না কেন, মা তাহা ভুলিয়া নিজগুণে ক্ষমা করিয়া মার্জনা করেন। সত্যই অসাধারণ ছিল শ্রীমা সারদাদেবীর অহেতুকী করুণা ও সন্তানের প্রতি মমতা ও ভালবাসা।

একবার চারিজন ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পনেরো দিন পূর্বে জয়রামবাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার পর শ্রীমা তাঁহাদের মঠের সকল কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আসিবার সময় সারদানন্দ মহারাজের সহিত তাহারা দেখা করিয়া আসিয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তরে বলিলেন: "না মা, পরশু বিকালে মঠ থেকে বেড়িয়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে চলতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে একজন বল্লে, এই রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে কাশী যাওয়া যায়। তাই আমরা মঠে আর না ফিরে, কাউকে কোন খবর না জানিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে কিছুদূর এসে স্থির করলাম, যখন হেঁটে কাশী যাচ্ছি, তখন জয়রামবাটীতে এসে আপনার নিকট গেরুয়া নিয়ে কাশী যাব ও কিছুদিন সেখানে মাধুকরী করে তপস্যা করব। তাই মা, আপনার কাছে এসেছি।" শ্রীমা স্থিরভাবে সকল কথা শুনিয়া ও তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিয়া একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন: "দেখ বাবা, আমার ইচ্ছা তোমরা এখন মঠে ফিরে যাও। সামনে আর ক'দিন পরে দুর্গাপূজা। মঠে কাজকর্মের খুব অসুবিধা হবে। তোমরা তারককে না বলে চলে এসে ভাল করনি। আর এ' (ম্যালিরিয়ার) সময় এলে। শরৎকে পর্যন্ত জানিয়ে এলে না। তাকে জানালে এ'সময় শরৎও আসতে দিত না। যাইহোক, আমি তারককে চিঠি লিখে দিচ্ছি, সে এর জন্যে তোমাদের কিছু বলবে না।" তাহার পর শ্রীমা আবার বলিলেন: "মঠে বাস করা কি কম তপস্যা? এই অল্পদিন সব মঠে এসেছ, কিছুদিন মঠে থেকে ওদের সব সঙ্গ কর,

তারপর ধীরে ধীরে সময়মত হবে।" শ্রীমার কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীরা লজ্জিত হইলেও আশ্বস্ত হইলেন। শ্রীমা সমস্ত ঘটনা স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে পত্রের দ্বারা লিখিয়া জানাইলেন এবং শ্রীমার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া শিবানন্দ মহারাজ তাহা অবণতমস্তকে পালন করিয়াছিলেন।

আর একবার শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে ছিলেন তখন তিনজন ভক্ত-সন্তান গৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল শ্রীমার আশীর্বাদ লইয়া কোন একটি নির্দিষ্ট মঠে বা আশ্রমে না থাকিয়া পরিব্রাজক-রূপেই তীর্থাদি দর্শন এবং ভিক্ষাদি ও তপস্যা করিয়া জীবন কাটাইবেন। শ্রীমা তাঁহাদের সকল কথা ধৈর্যের সহিত শুনিয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে আহার করাইলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে শ্রীমা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন: "আজ তোমরা তিনজন মস্তক মুণ্ডন কর ও কাপড় গেরুয়া রঙ্ কর। কাল তোমাদের সন্ন্যাস দেব।" এই ধরনের কর্ম ও করুণা করার শ্রীমার পক্ষে কোন নিয়ম ছিল না। অহেতুকী ছিল তাঁহার কৃপা, সুতরাং তাঁহার কৃপার মধ্যে কোনদিন কোন হেতু বা কারণ খুজিয়া পাওয়া যাইত না। তিনজন ভক্ত-সন্তানের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। পরের দিন শ্রীমা তিন জনের হস্তে তিনখানি গৈরিক বস্ত্র ও তিনটি কৌপীন দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন: "ঠাকুর, এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে যেখানেই থাকুক না কেন, এদের দুটি খেতে দিও।" ভাগ্যবান তাঁহারা। স্বয়ং শ্রীমা তাঁহাদিগের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা যে কঠোর ব্রত লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, শ্রীমার তাহাতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য নূতন দীক্ষিত সন্ন্যাসীদের বিদায় দিবার সময় তিনি বলিলেন: "তোমাদের এত কঠোর করে দরকার নেই—ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ। তবে

তোমরা নেহাত পরিব্রাজক হয়ে হেঁটে বেড়াবে সঙ্কল্প করেছ, তাই আমি একটু করতে দিচ্ছি, তোমরা কাশী পর্যন্ত হেঁটে যাও। সেখানে আমি তারককে লিখে দিচ্ছি। সেখানে তোমাদের সন্ন্যাস-জীবন গড়ে তুলো; আর তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস-নাম নিও।"

শিবানন্দ মহারাজ তখন কাশীতে অদ্বৈত-আশ্রমে ছিলেন। শ্রীমা নূতন সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন এবং তাঁহাদিগের হস্তে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নামে একটি পত্র দিলেন। শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীমা আচার-অনুষ্ঠান কিংবা যাগ-যজ্ঞ করিয়া কাহাকেও সন্ন্যাস দিতেন না। তিনি গেরুয়া-বস্ত্র ও কৌপীন হস্তে দিবার পর হয় রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ অথবা স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট বিধি-অনুযায়ী সন্ন্যাসের নাম ও যোগপট্ট প্রভৃতি গ্রহণ করিতে আদেশ দিতেন।

আর একটি ঘটনার কথা এইখানে বলি। জয়রামবাটীতে থাকার সময় শ্রীমার নিকট একটি এম. এ. পাশ করা যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার ইচ্ছা তিনি সাধুভাবে জীবনযাপন করিবেন। শিবানন্দ মহারাজই যুবকটিকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীম (মাষ্টার মহাশয়) যুবকটিকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া বিলম্বে সাধু হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমা সকল ঘটনা শুনিয়া পরে বরদা মহারাজকে বলিয়াছিলেনঃ "মাষ্টারের বাড়ীর কাছে ওদের বাড়ী, ঘরে মা-ভাই আছে। সাধু হবে শুনে মাষ্টার একটু গড়ি-মসি করেছে, বলেছে, 'এত তাড়াহুড়া করে নাই বা সাধু হলে'। মঠে তারক কিন্তু খুব উৎসাহ দিচ্ছে। মাষ্টার হাজার হোক সংসারী কিনা। আর তারক সাদা, সাধু লোক। ঠাকুরের ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করা, আহা, কত ভাগ্যে হয়! তারক ঠিকই বলেছে। সংসারে পড়লে আর উঠতে পারে ক'জন? ছেলেটির মনে খুব

জোর আছে।” যুবকটি পরের দিন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিলেন ও তাঁহার মনের ইচ্ছা শ্রীমাকে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন। শ্রীমা যুবকের সকল কথা শুনিয়া আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ঃ “মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হক—বাবা। তারক যা বলেছে খাটি কথাই বলেছে।” শ্রীমার দৃষ্টি এই রকমেরই ছিল। প্রকৃত বৈরাগ্যবানকে তিনি ত্যাগের পথেই সর্বদা উৎসাহ দান করিতেন। ‘আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ সন্ন্যাসীর জীবন। শ্রীমা এই আদর্শ সকল সন্ন্যাসী-সন্তানকে পালন করিতে উপদেশ দিতেন। সংসারে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহাদিগকেও শ্রীমা সৎপথে থাকিয়া জীবনযাপন করিতে উপদেশ দিতেন। এই যুগে ত্যাগীশ্বর ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীমা কী সন্ন্যাসী ও কী সংসারী সকলকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিতে বলিতেন। বলিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন স্মরণ-মনন করিয়া ধ্যান করিলেই হইবে। অপাপবিদ্ধ ও চিরপবিত্র ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও উপদেশ। শ্রীমা সেজন্য সকলকেই নিষ্ঠার সহিত এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ্ করিতে উপদেশ দিতেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী সন্তানদিগের মধ্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ছিলেন সকলের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল গোপালচন্দ্র ঘোষ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বা 'মুরুব্বি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভক্তমহলে তাহার নাম ছিল 'গোপাল-দা'। গোপাল-দা ছিলেন বিবাহিত। তাহার স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যে সকল ত্যাগী সন্তানরা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমার সেবা-শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বলিতে গেলে অদ্বৈতানন্দ মহারাজ ছিলেন তাঁহাদিগের প্রথম। একবার অদ্বৈতানন্দ মহারাজ তীর্থদর্শনে যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া?" গোপাল-দা বলিয়াছিলেন: "আজ্ঞে হাঁ। একটু ঘুরে-ঘেরে আসি।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন: "যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা তখনই জ্ঞান।" শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন: "যা চায়, তা কাছেই; অথচ লোকে নানাস্থানে ঘোরে।" অদ্বৈতানন্দ মহারাজের তীর্থভ্রমণের কথা শ্রীমার কর্ণেও পৌঁছিল। শ্রীমা একদিন গোপাল-দাকে ডাকিয়া বলিলেন: "তীর্থভ্রমণ তো ভাল, কিন্তু মহাতীর্থ তো এখন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) ছেড়ে আর কোথা যাবে।" অদ্বৈতানন্দ মহারাজ নীরবে শ্রীমার কথার মর্ম বুঝিয়া তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে অসুস্থ তখন শ্রীমাও

সেখানে থাকিতেন ও মন-প্রাণ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষাদি করিতেন। গোপাল-দা ঐ সময়ে সকল রকমভাবে শ্রীমাকে সাহায্য করিতেন। চিকিৎসকের নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্যাদি তৈয়ারী করিবার নিয়ম প্রভৃতি জানিয়া লইয়া গোপাল-দা শ্রীমাকে জানাইতেন এবং শ্রীমা তাহা তৈয়ারী করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন। কাশীপুর-উদ্যানবাটী হইতে চিকিৎসার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে যখন কলিকাতায় শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখনও গোপাল-দা শ্রীমাকে সকল রকম ব্যাপারে সাহায্য করিতেন। পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে গোপাল-দা প্রত্যহ বাজার করিয়া আনিতেন এবং শ্রীমাকে রন্ধনের কার্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নূতন বাড়ী নির্মিত হইলে গোপাল-দা সন্তানদিগের খাওয়ার জন্য জমিতে সব্‌জির বাগান তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সাধু-সন্ন্যাসীদের খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। লাটু মহারাজ অদ্বৈতানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: "আরে বুড়ো গোপাল-দা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের উপর তরকারি জুটত না। সব্‌জিবাগান করতে বুড়োগোপাল-দাকে কতই না খাটতে হয়েছে।" বাগানে যখন কিছু ঢেঁড়স, বেগুন, কাঁচকলা প্রভৃতি তরিতরকারি হইত তখনই অদ্বৈতানন্দ মহারাজ সর্বপ্রথমে শ্রীমার জন্য তাহা লইয়া যাইতেন এবং বলিতেন শ্রীমার সেবায় লাগিলে তবে সার্থক পরিশ্রম।

বয়সের গুণে গোপাল-দার সর্বশরীরে বাত হইয়াছিল। একদিন তিনি শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, এখন তাহার সমস্ত শরীরে বাত হইয়াছে, সুতরাং বাগানের জন্য নিজে আর কিছু করিতে পারেন না। নবাগত শিক্ষিত ব্রহ্মচারীরা বাগানের মর্যাদা ততটা বুঝিবে না। শ্রীমা গোপাল-দার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন: "হ্যাঁ বাবা, তুমি সেকেলে লোক, তুমি তো আর ছেলেদের মত থাকতে

পারবে না। মঠ,—ওতো একটা সংসার। খাওয়া-দাওয়া তো আছে, তুমি থাকতে পারবে কেন? তাই দেখে থাক।” গোপাল-দা শ্রীমার সহানুভূতিসূচক স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। সূর্যদেব পক্ষপাতশূন্য হইয়া নির্বিচারে যেমন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ ও সাধারণ-অসাধারণ সকলের উপর কিরণ বর্ষণ করেন, বিশ্বজননী করুণাময়ী শ্রীমা তেমনি তাঁহার অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসা জাতিধর্মনির্বিশেষে নির্বিচারে সকলকেই বিতরণ করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে সাধন-ভজনের জন্য ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরা প্রায়ই রাত্রিযাপন করিতেন। আহাদিগের জন্য সাধন-ভজনে পাছে বাধা-বিঘ্ন আসে সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের আহার প্রভৃতির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি শ্রীমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, রাখালকে ছয়খানি, লাটুকে পাঁচখানি, আর বুড়োগোপাল ও রামবাবুকে চারিখানি করিয়া রুটি দিবার জন্য। স্নেহ-বাৎসল্যময়ী মায়ের প্রাণ, সুতরাং সন্তানদিগের কষ্ট তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন! সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কড়া-নির্দেশকে সময়ে সময়ে শিথিল করিতেও শ্রীমা দ্বিধাবোধ করিতেন না। পরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বাবুরাম রাত্রে পাঁচ-ছয়খানি করিয়া রুটি খাইতেছেন। সন্তানদিগকে অধিক পরিমাণে খাবার দিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকেই মনে মনে দায়ী করিলেন। একদিন অনুযোগ করিয়া তিনি শ্রীমাকে বলিলেন যে, এইরূপ বিবেচনাহীন স্নেহের বশবর্তী হইয়া শ্রীমা সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছেন। পুত্রস্নেহাতুরা শ্রীমা সম্ভ্রমের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন: “ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।” চিরলজ্জাশীলা শ্রীমা লজ্জার নিবীড় অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া পুত্রস্নেহ যে সংসারের সকল বাঁধাকে অতিক্রম করিয়া রসোত্তীর্ণ

হইতে পারে তাহা সেইদিন প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমার সেই সর্ববিজয়িনী মাতৃশক্তি লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার কথার আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। মহাশক্তি মহাকালীর নিকট মৃত্যুঞ্জয় শিবের এই পরাজয় স্বীকার করার কাহিনী একেবারে নূতন নয়, বরং ইতিহাসে ও পুরাণে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যলীলাসঙ্গিনী ভগবতী শ্রীসারদাদেবীব কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সাধারণ সংসারেও দেখা যায় যে, সন্তানের জন্য যেখানে জননীর স্নেহ-ভালবাসা প্রবল সেখানে বিধি-নিষেধ বা সামাজিক অনুশাসনকে স্নেহশীলা জননী কোনদিনই যথাযথভাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই। শ্রীমার জীবনে এই ধরনের অপার্থিব মাতৃত্বের নিদর্শন আমরা বহুবারই লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাছাড়া ভবিষ্যতে শ্রীমা যেখানে তাঁহার সন্তানগণের সকল দায়িত্ব বা ভার গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘজননীরূপে প্রতিষ্ঠিতা সেখানে মাতৃশক্তির জয়লাভই সুনিশ্চিত এবং সেজন্যই জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মহাশক্তিরূপিণী শ্রীমা বলিতে সাহসী হইয়াছিলেনঃ "তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।" শ্রীমার সেই দিব্য-ভবিষ্যদ্বাণী পরে বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র ॥

ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর অন্যতম অনুগত সন্তান। গিরিশচন্দ্র বিল্বপত্র-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শ্রীমাকে জগজ্জননী-জ্ঞানে অর্চনা করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—শ্রীমা জীবন্ত কালী। বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের পাড়-মাতাল, বিখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা, কবি ও সুগায়ক গিরিশচন্দ্রের নাম তদানীন্তন সমাজে সকলের নিকটই পরিচিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে 'ভৈরব'-এর অবতার বলিতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শ্রীসারদাদেবীর নিকটও গিরিশচন্দ্র যে শুধুই বিশেষ পরিচিত ছিলেন তাহাই নহে, শ্রীমার তিনি একান্ত স্নেহের পাত্রও ছিলেন। ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সেইজন্য শ্যামপুকুরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'মা-কালী'-জ্ঞানে পূজাও করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যখন অসহায় শিশুর মত দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে উপনীত হইয়া আপনার সকল কর্মের দায়িত্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া বকলমা দিয়াছিলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দেখিয়া তিনি বলিতেন: "গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।"

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, একবার পুত্রশোকে কাতর হইয়া গিরিশচন্দ্র জয়রামবাটীতে শ্রীমার চরণে উপনীত হইয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র জয়রামবাটীতে শ্রীমার নিকট কিছুদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। একদিনের ঘটনা, ভক্ত গিরিশচন্দ্র স্নান সমাপন করিয়া জলসিক্ত বস্ত্রেই শ্রীমাকে প্রণাম

করিতে গমন করিলেন ও ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া শ্রীমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই তাঁহার পূর্বস্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন : "এ্যাঁ, মা তুমি ?" বিস্ফারিত নেত্রে গিরিশচন্দ্র শ্রীমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গিরিশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া শ্রীমা সরলা বালিকার মতো তখন হাসিতেছেন, যেন কিছুই জানেন না, অথচ ত্রিকালদর্শিনী শ্রীমা সকল কিছুই জানিতেন। গিরিশচন্দ্র যথার্থই সেইদিন শ্রীমার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

পূর্বের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। যুবক বয়সে গিরিশচন্দ্র একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং জীবনের আশা প্রায় ছিল না। সেই সময়ে অচৈতন্য অবস্থায় গিরিশচন্দ্র একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে অপরূপ লাবণ্যময়ী এক মাতৃমূর্তি আবির্ভূতা। মাতৃমূর্তির পরিধানে লাল চাওড়া পাড়ের শাড়ি, সর্বাঙ্গে উদ্ভাসিত অপূর্ব এক জ্যোতিঃ ও বদনমণ্ডলে অফুরন্ত স্নেহ ও করুণা প্রকাশিত। মাতৃমূর্তি অকস্মাৎ মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া গিরিশচন্দ্রের মুখে দিয়া বলিলেন : "খাও"। মাতৃমূর্তির অভয়হস্ত হইতে অমৃতময় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিবার সময় গিরিশচন্দ্রের দিব্যস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে ভাসমান তখনও সেই জ্যোতির্ময়া মাতৃমূর্তি এবং গিরিশচন্দ্রের জিহ্বায় তখনও সুগন্ধ-প্রসাদের আস্বাদন রহিয়াছে। আনন্দস্রোতে তিনি অনন্তের বুকে যেন ভাসিয়া যাইতেছেন অনুভব করিলেন। কিন্তু কে সেই দেবী? কে সেই চিরস্নেহময়ী আনন্দরূপিণী মাতৃমূর্তি?—এই প্রশ্ন গিরিশচন্দ্রের মনকে অশান্ত করিয়া তুলিল। অথচ কোন রহস্যেরই তিনি তখন সমাধান করিতে পারিলেন না। পরে তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইলে শোকে যখন একান্ত বিহ্বল তখন একদিন জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীমার চরণে উপস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখনই একদিন স্নানের পর

জলসিক্ত বস্ত্রে শ্রীমাকে প্রণাম করিতে যাইয়া শ্রীমার মুখের দিকে চাহিবা মাত্র পূর্বের স্বপ্নদৃষ্ট সেই কল্যাণী মাতৃমূর্তি শ্রীমার বদনমণ্ডলে ভাসিয়া উঠিয়াছিল ও তখন আর বুঝিতে বাকী ছিল না যে, মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীই সেই স্বপ্নদৃষ্ট জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি এবং শ্রীমাই তাঁহাকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র জীবনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। পরে শ্রীমার মুখে ঐ পূর্বোক্ত স্বপ্নের সত্যতা জানিবার জন্য অপর একজন ভক্তের দ্বারা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, গিরিশকে তিনি ঐভাবে কখনও দর্শন দিয়াছেন কিনা? শ্রীমা সেই স্বপ্নকথা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার পর একদিন গিরিশচন্দ্র নিজেই শ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: "মা, তুমি কি রকম মা?" শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন: "বাবা, আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, আমি সত্যিকারের মা।" ভক্ত গিরিশচন্দ্র তখন উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, শ্রীমা মানবী নন ও শুধু স্বর্গের দেবীও নন, তিনি বিশ্বমাতা মহাশক্তি, যুগে যুগে অবতারলীলার সঙ্গিনী হইয়া আসিয়াছেন ও আসিবেন।

কলিকাতা মহানগরীর প্রাণচঞ্চল কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া শান্তপরিবেশ পল্লীগ্রামে শ্রীমার নিকটে গিরিশচন্দ্র কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীমাও তাঁহার স্নেহের সন্তানের স্নেহ-যত্নের ত্রুটি করেন নাই। জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে গিরিশচন্দ্র অতি প্রত্যুষে উঠিয়া চা পান করিতেন। কিন্তু পল্লীগ্রামে সকল জিনিস সকল সময় পাওয়া দুরূহ বলিয়া করুণাময়ী শ্রীমা নিজেই কষ্ট স্বীকার করিয়া গিরিশচন্দ্রের জন্য চা করিয়া দিতেন। আবার গিরিশচন্দ্রের বিছানার চাদর মলিন হইলে নিজ হস্তে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বিব্রত বোধ করিতেন ও শ্রীমার অপার করুণা ও সন্তানবাৎসল্যের নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হইতেন ও ভাবিতেন, মনুষ্যবেশে দেবতার লীলা কত মধুর ও কত অপূর্ব!

জয়রামবাটী হইতে বহুদিন পরে শ্রীমা কলিকাতায় ফিরিতেছেন। সঙ্গে গোলাপ-মা এবং যোগীন-মা ছিলেন। হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীমাকে আনিতে গিয়াছিলেন বাবুরাম মহারাজ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, প্রেমানন্দ মহারাজ ও আরও অনেকে। শ্রীমা স্নেহের-সন্তানগণকে বহুদিন পরে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। গোলাপ-মা শাসনের ছলে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিয়াই ফেলিলেন: "হঁ্যা মহারাজ, তোমাদের একটু আক্কেল নেই যে, এই রোদে তেতেপুড়ে এলেন মা, আর তোমরা এসেছো প্রণাম করতে এখানে? সুতরাং অন্যদের আর দোষ কি?" এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ-প্রমুখ সন্তান ও ভক্তগণ শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আর সাহসী হইলেন না। শ্রীমা কিন্তু নীরব ও সহাস্যবদনা। শ্রীমাকে একটি ঘোড়ারগাড়ীতে করিয়া বাগবাজারে উদ্বোধনের বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। আনন্দময়ী মা আসিয়াছেন বহুদিন পরে, সুতরাং সকলেই আনন্দিত ও ব্যস্ত।

শ্রীমা উদ্বোধনের বাটীতে পৌঁছিলে উপরে দ্বিতলের ঘরে শ্রীমার বিশ্রামের জন্য গোলাপ-মা বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে ভক্ত গিরিশচন্দ্র শ্রীমা আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দে অধীর ও আত্মহারা হইয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। প্রথমে তিনি নীচে মহারাজদিগের নিকট শ্রীমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে গোলাপ-মা তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া ষ্টেশনেরই মতো গিরিশচন্দ্রকে একটু তীব্র ভাষায় উপরে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এখানে পট-পরিবর্তন ঘটিয়াছে, রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরিবর্তে স্বয়ং ভক্তচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র উপস্থিত। গোলাপ-মা যখন বলিতে লাগিলেন: "বলিহারি যাই ঘোষজার এই অপূর্ব ভক্তি দেখে। বলি গিরিশবাবু, মাকে তো দেখতে এসেছো, কিন্তু মা তো এলেন এইমাত্র তেতেপুড়ে। কোথায় একটু জিরুবেন, ঠাণ্ডা হবেন, না—এলে জ্বালাতন করতে।" গিরিশবাবু গোলাপ-মার কথায়

বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া একেবারে সোজা উপরে চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় সকলকে ডাকিয়া বলিলেনঃ "চলো, মাকে প্রণাম করে আসি।" সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ-মার দিকে একটু কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেনঃ "ঝাঁজালো মেয়ে, বলে কিনা মাকে জ্বালাতন করতে এসেছি। কোথায় এতদিন পরে এসে ছেলের মুখ দেখে মা-র প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, তা নয় তো ইনি এলেন মাতৃস্নেহ শেখাতে।" গোলাপ-মা গিরিশচন্দ্রের তীব্র কটাক্ষে ও কথায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গিরিশচন্দ্র সোজা উপরে উঠিয়া শ্রীমার চরণযুগলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন এবং করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "মা, ক্যামন আছেন?" শ্রীমা গিরিশচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দে অধীর। বলিলেনঃ "বাবা, ভাল আছি।" এই বলিয়া গিরিশচন্দ্রকে ও সমাগত সকল সন্তান ও ভক্তকে শ্রীমা প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। গোলাপ-মা কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি গিরিশচন্দ্রের পিছু পিছু উপরে উঠিয়া সজলনয়নে শ্রীমাকে গিরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। গোলাপ-মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ "শেষে কিনা গিরিশবাবু আমাকে এ'রকম বল্লে?" শ্রীমা প্রসন্ন মুখে গোলাপ-মার দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ "তা, তোমাকে তো অনেকবার বলেছি যে, আমার ছেলেদের সম্বন্ধে কোন-কিছু মতামত প্রকাশ করতে যেও না। এরা আমার ছেলে, এরা সব আমার কাছে আসবে বৈকি?" গিরিশচন্দ্র নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া করুণাময়ী শ্রীমার কথা শুনিলেন ও ভাবিলেন, এইরূপ না হইলে কি বিশ্বজননী নাম সার্থক হয়। তিনি শ্রীমার সম্মুখে সন্তানের জয়লাভ দেখিয়া গৌরবে আনন্দে অধীর হইয়া গোলাপ-মার দিকে কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন ও তাহার পর পুনরায় সাষ্টাঙ্গে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেনঃ "ওরে, সন্তানবৎসলা জননীর স্নেহ-ভালবাসার কি আর অন্ত আছে!"

একবার গিরিশচন্দ্র শ্রীমার সেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তিনি শ্রীমাকে বলিলেন: "মা, তুমিই আমাদের সেবা কর, আমরা কিন্তু তোমার সেবা করতে পারি না। মা বলো, কেমন করে তোমার সেবা করব?" এই কথা বলিতে বলিতে গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ ও মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন: "ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি চিন্তা করতে পার যে, তোমাদের সামনে গ্রাম্যবধূবেশে জগতের মা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, যিনি আজ সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও সংসারের আর সব রকম কাজকর্ম করছেন তিনিই জগজ্জননী মহামায়া ও মহাশক্তি। সর্বজীবের মুক্তির জন্য তিনি মাতৃত্বের পরমাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন।"

কিছুদিন অতীত হইল। শ্রীমা তখন উদ্বোধনের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। এদিকে বাগবাজারে গিরিশচন্দ্রের বাটীতে ধূমধামের সহিত দুর্গাপূজার আয়োজন চলিতেছে। তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিশ্বজননী শ্রীমা উপস্থিত থাকিবেন ইহাই গিরিশচন্দ্রের মনের একান্ত বাসনা। তিনি শ্রীমাকে একান্তভাবে অনুরোধ জানাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া অসিয়াছেন, যেন অনুগ্রহ করিয়া তিনি পদধূলি দান করিয়া তাঁহার গৃহ পবিত্র করেন। সপ্তমীর পূজা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তখনও শ্রীমা আসিয়া উপস্থিত হন নাই, সুতরাং গিরিশচন্দ্রের মন অস্থির। গিরিশচন্দ্রের দৃঢ়বিশ্বাস যে, শ্রীমা উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার পূজা পূর্ণ ও সার্থক হইবে না। সত্যই সেই সময়ে শ্রীমার শরীর বিশেষ ভাল ছিল না, সেইজন্য তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে। যাহাহউক অবুঝ সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীমা কষ্ট স্বীকার করিয়াও গিরিশের ভবনে পরপর দুইদিন পূজা-উপলক্ষ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেইভাবে চলাফেরা ও পরিশ্রম করার জন্য শ্রীমার শরীর পূর্বাপেক্ষা আরও খারাপ হইল। সুতরাং স্থির হইল শ্রীমা আর গভীর রাত্রিতে সন্ধিপূজায় উপস্থিত

থাকিবেন না। সেই সংবাদ গিরিশচন্দ্রের কর্ণে পৌঁছাইল। তিনি শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেনঃ "মা-ই যখন সন্ধিপূজায় আসিবেন না, তখন পূজামণ্ডপে যাওয়া বৃথা।" সন্ধিপূজায় শ্রীমা উপস্থিত থাকিবেন না ভাবিয়া গিরিশচন্দ্রের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সন্তানের কাতর-আবেদন শ্রীমার অন্তরে পৌঁছিল। শ্রীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার অসুস্থ শরীর লইয়াই গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সন্তান ও ভক্তগণ বারবার শ্রীমাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। শ্রীমা কিন্তু কাহারও কোন কথা শুনিলেন না। অগত্যা একটি ঘোড়ার গাড়ী আনা হইল। শ্রীমা তাহাতে করিয়া গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং দরজায় আঘাত করিয়া বলিলেনঃ "এই যে বাবা, আমি এসেছি।" শশব্যস্তে গিরিশচন্দ্র আসিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার দুইচক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বিহ্বল ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাবিলেন, মা শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও অধীনের গৃহে পূজা গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। শ্রীমাকে গিরিশচন্দ্র সেইদিন মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গা জ্ঞান করিয়া পরমভক্তি-সহকারে পুষ্প-চন্দন দিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও এমন কি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ এবং সমবেত পরিচিত ও অপরিচিত সকলেই ভক্তিভরে শ্রীমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া ধন্য হইলেন। আনন্দময়ীর আগমনে গিরিশচন্দ্রের বাড়ী সেইদিন আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল। 'জয় মা, জয় মা' রবে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। পবিত্র আনন্দমুখরিত এক পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়া শ্রীমা পরে উদ্বোধনের বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রতি শ্রীমার অপার স্নেহ-ভালবাসার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রীমার স্নেহ-মন্দাকিনীধারা অবিশ্রান্তভাবে চিরদিন এইরূপে প্রবাহিত ছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও নাগ মহাশয় ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর অন্যতম ভক্তসন্তান ছিলেন দুর্গাচরণ নাগ। সকলে তাঁহাকে 'নাগ মহাশয়' বলিয়াই জানিতেন।

সংসারে থাকিয়াও সংসারনির্মুক্ত বা অসংসারী নাগ মহাশয়ের ছিল ত্যাগনিষ্ঠ পরকল্যাণব্রত জীবন। সাধারণ মানুষ যে অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা দেবমানুষ হইতে পারে তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন ছিলেন ভক্ত নাগ মহাশয়। পত্নী বিয়োগের পর নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যসান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে মহাতীর্থে গমন করেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: "তুমি জনকের মত গৃহাস্থাশ্রমে থাকবে; তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।" সত্যই নাগ মহাশয়ের জীবন ও জীবনের আদর্শ ছিল সকল মানুষেরই অনুসরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র স্পর্শে নাগ মহাশয় খাঁটী সোনায় পরিণত হইয়াছিলেন।

ভক্ত নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসারবন্ধন কেন, সর্ববন্ধন হইতে মানুষ মুক্ত হইতে পারে। কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর'। বস্তু বা পরমবস্তু সংসারে একমাত্র ঈশ্বর, সুতরাং বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তিনি দুষ্কর ভব-সংসারের পারে লইয়া যান। ভক্ত নাগ মহাশয় এই আদর্শ ও লক্ষ্যকে জীবনে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস যে কত গভীর

ও একনিষ্ঠ ছিল তাহা তাহার জীবনের কার্যাবলী দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির কিছুদিন পূর্বে নাগ মহাশয় একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া শুনিলেন তাঁহার মুখ স্বাদবিহীন হওয়ায় তিনি আমলকীর অনুসন্ধান করিতেছেন। অবশ্য সেই অসময়ে আমলকী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু নাগ মহাশয়ের একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে আমলকীর সন্ধান অবশ্যই মিলিবে। সুতরাং সেই মুহূর্তেই উঠিয়া স্নান-আহার সমস্ত ভুলিয়া গিয়া নাগ মহাশয় দুইদিন ক্রমাগত প্রতিটি উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তৃতীয়দিনে আমলকীর সন্ধান মিলিল। তিনি সানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আমলকী আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আমলকী পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সরল বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন।

একবার নাগ মহাশয় অর্ধোদয়যোগের সময় কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতার মুমূর্ষু-অবস্থা এবং তিনি গঙ্গাস্নান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার পিতা আকুল হইয়া বলিলেন: "এখনও সময় আছে, আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চল।" তাহা শুনিয়া নাগ মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, মনে বিশ্বাস থাকিলে মা জাহ্নবী ভক্তের গৃহে আপনি আসিয়াই আবির্ভূত হইবেন। ঘটিল তাহাই। দেখা গেল যে, অর্ধোদয়যোগের পুণ্যদিনে দ্বিপ্রহর সময়ে নাগ মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণের এক পার্শ্ব হইতে প্রবলবেগে জলধারা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গন প্লাবিত করিতে লাগিল। সকলেই বিস্মিত। সেই বিস্ময়কর দৃশ্য দর্শন করিয়া পল্লীবাসী সকলে নাগ মহাশয়ের বাটীতে সমবেত হইয়া আনন্দে উল্লাস করিতে লাগিল। লোকের কলরব শুনিয়া নাগ মহাশয় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গন জলধারায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া 'মা পতিতপাবনী ভাগীরথী' বলিতে বলিতে বারবার প্রণাম করিয়া আপনার মস্তকে

জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সেই জলস্রোত প্রায়' একঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। শোনা যায়, তাঁহার পিতা দীনদয়ালবাবু গঙ্গার সেই পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া পরমপরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বিশ্বজননী শ্রীসারদদেবীর প্রতি ভক্ত নাগ মহাশয়ের ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল গভীর ও অবর্ণনীয়। আলমবাজার মঠের যখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে তখন মঠের সন্ন্যাসীদিগের সহিত তিনি প্রায়ই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া মনে শান্তি লাভ করিতেন। বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে যখন শ্রীমা কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন তখনও নাগ মহাশয় সেখানে প্রায়ই গমন করিয়া শ্রীমার চরণ বন্দনা করিয়া ধন্য হইতেন। শ্রীমা যে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মহাশক্তি নাগ মহাশয় তাহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। নাগ মহাশয়ের প্রতি শ্রীমারও স্নেহ-ভালবাসা ছিল চির-উৎসারিত। শ্রীমার ভালবাসার মধ্যে স্বতঃপ্রবাহিত ছিল বাৎসল্যরসের জাহ্নবীধারা এবং নাগ মহাশয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, শ্রীমার ভক্ত-সন্তানগণ সেই পবিত্র ধারায় অবগাহন করিয়া সর্বদাই ধন্য হইতেছেন। অগণিত নরনারী শ্রীমার অহেতুকী করুণার ভিখারী এবং শ্রীমা নির্বিচারে সেই করুণার ধারা বিতরণ করিয়া সকলকে শান্তি দান করিতেন।

ভক্ত নাগ মহাশয় যখন প্রথম প্রথম শ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেন তখন শ্রীমা বড় একটা বাহিরের কোন লোকের সহিত দেখা করিয়া কথা কহিতেন না। তখন কোন ভক্ত-সন্তান শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিলে তিনি শ্রীমার ঘরের চৌকাঠ হইতে প্রণাম করিয়াই চলিয়া যাইতেন। সেই সময়ে শ্রীমার নিকট সর্বদাই একজন দাসী থাকিত এবং সেইই শ্রীমাকে বলিয়া দিত যে, অমুক ভক্ত—কি সন্তান অথবা অমুকবাবু আপনাকে প্রণাম করিতেছেন ও শ্রীমা শুনিয়া তাহাকে ঘর হইতে আশীর্বাদ করিতেন। একদিন হইল যে, নাগ মহাশয় আসিয়া ঐভাবে চৌকাঠে মাথা রাখিয়া শ্রীমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন। নাগ মহাশয় এমনই জোরে চৌকাঠে বারবার

মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেছিলেন যে, তাঁহার মাথা হইতে রক্তধারা বহির্গত হইতেছিল। তাহা দেখিয়া দাসী বিস্ময়ে শ্রীমাকে ঐ সংবাদ দিয়া বলিল: "মা, নাগ মশাই তোমাকে এমনি জোরে মাথা ঠুকে প্রণাম করছেন যে, তাঁর মাথা দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত বেরুচ্ছে।" নাগ মহাশয়ের কিন্তু সেইদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই, তিনি একমনে চৌকাঠে মাথা ঠুকিয়া প্রণামই করিতেছেন এবং মুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন 'জয় মা! জয় মা!' শ্রীমা নাগ মহাশয়ের ঐ অবস্থার কথা শুনিয়া চঞ্চল হইয়া দাসীকে বলিলেন: "ওগো বল, প্রেমানন্দ মহারাজকে এখানে পাঠিয়ে দিতে।" স্নেহময়ী জননীর অন্তর তখন বেদনায় ভরিয়া গিয়াছে। প্রেমানন্দ মহারাজ আসিলেন ও শ্রীমার আদেশে আত্মভোলা নাগ মহাশয়কে শ্রীমার নিকটে ধরিয়া লইয়া গেলেন। শ্রীমা দেখিলেন যে, নাগ মহাশয়ের কপাল ফুলিয়া রক্তধারা পড়িতেছে এবং তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাওয়ায় শ্রীমাকে নাগ মহাশয় দেখিতে পাইতেছেন না। স্নেহ-বাৎসল্যময়ী শ্রীমা তখন চিরাভ্যস্ত স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও লজ্জার ভাব ভুলিয়া অবোধ ও শরণাগত সন্তানকে স্পর্শ করিলেন ও ধরিয়া বসাইলেন। নাগ মহাশয়ের মুখে কিন্তু তখনও সেই 'মা মা' শব্দ। শ্রীমা তখন স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া নাগ মহাশয়ের চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু প্রসাদ আনিয়া নিজে একটু গ্রহণ করিয়া পরে স্বহস্তে নাগ মহাশয়ের মুখে দিতে লাগিলেন। সন্তানবৎসলা জননীর সন্তানের প্রতি গভীর ভালবাসার নিদর্শন তখন প্রত্যক্ষ করিবার জিনিস। ইত্যবসরে কোন কোন স্ত্রীভক্ত আসিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) বলি এঁকে (নাগ মহাশয়কে) শ্রীমার নিকট হইতে সরাইয়া লইবার জন্য। শ্রীমা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন: "থাক্, একটু স্থির হয়ে নিক।" শ্রীমা ততক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীমার আহার করিবার সময় হইল। একজন স্ত্রীভক্ত শ্রীমার আদেশে

আহার্যদ্রব্য শ্রীমার সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন। শ্রীমা তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিয়া আহার করিলেন। আহারের শেষে যখন নাগ মহাশয় প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন শ্রীমার প্রতি চাহিয়া তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন: "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।" করুণাময়ী শ্রীমা নাগ মহাশয়ের সেই কথা শুনিয়া সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন: "দেখ, কী বুদ্ধি"। তাহার পর নাগ মহাশয় ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। শ্রীমা নাগ মহাশয়ের জ্বলন্ত বিশ্বাস ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া সেইদিন বিস্মিত হইয়াছিলেন।

বিশ্বজননী শ্রীমার হস্ত হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নাগ মহাশয় একবার আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন: "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।" তাহার পর করুণাময়ী শ্রীমা যখন গঙ্গার ধারে একটি গুদামবাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য ছিলেন তখন নাগ মহাশয় একদিন সেখানে শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেইদিন শ্রীমার নিকট কোন পাত্র না থাকায় নাগ মহাশয়কে তিনি একটি শালপাতায় প্রসাদ খাইতে দিয়াছিলেন। শ্রীমার অশেষ করুণার কথা ভাবিয়া নাগ মহাশয় আনন্দের অতিশয্যে একেবারে পাতা সমেত প্রসাদ খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। নাগ মহাশয় ভাবিতেন সাক্ষাৎ ভগবতী শ্রীমা যাহা প্রসাদস্বরূপ দিবেন তাহা অমৃতস্বরূপ ও মহাপ্রসাদ। এইরূপ একবার শ্রীমা নাগ মহাশয়কে একখানি কাপড় উপহার দিয়াছিলেন, নাগ মহাশয় তাহা শ্রীমার অহেতুকী আশীর্বাদ মনে করিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, পরিধান করেন নাই। যথার্থ ভক্তি হইলে মানুষ আপনার দেহ-সম্বন্ধ ভুলিয়া যায়, তখন আপন-পর ভেদজ্ঞানও দূর হইয়া যায়। করুণাময়ী শ্রীমা নাগ মহাশয়কে ঐরূপ যথার্থ ভক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন।

শ্রীমা যে ভক্ত নাগ মহাশয়কে কীভাবে দেখিতেন ও

ভালবাসিতেন তাহার একটি নিদর্শন এখানে দিই। জনৈক ভক্ত একদিন দেখিল যে, শ্রীমার শয়নগৃহের দেওয়ালে ঝুলানো স্বামীজী, গিরিশবাবু ও নাগ মহাশয়ের তিনটি প্রতিকৃতি শ্রীমা একে একে ঝাড়িয়া-মুছিয়া সেইগুলিতে চন্দনের ফোঁটা দিতেছেন। তিনি স্বীয় হস্তে স্বামীজী ও গিরিশবাবুর প্রতিকৃতি-দুইটি স্পর্শ ও চুম্বন করিয়া সর্বশেষে নাগ মহাশয়ের ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন: "কত ভক্তই আসছে, কিন্তু এমনটি আর দেখছি না।" ভক্ত নাগ মহাশয় কল্যাণময়ী শ্রীমার অন্তরের যে বৃহত্তম ক্ষেত্র অধিকার করিয়া শ্রীমার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন তাহা শ্রীমার এই কর্ম বা আচরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধসত্ত্ব না হইলে শুদ্ধচৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির কৃপা লাভ করা যায় না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও ভগিনী নিবেদিতা ॥

যে পুণ্যমুহূর্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মহাশক্তিরূপিণী শ্রীসারদা-দেবীর আবির্ভাব পৃথিবীর বক্ষে হইয়াছিল সেই মুহূর্ত ভারতের ইতিহাসে শুধু নয়, বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সেই পবিত্র মুহূর্তেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য পরমত্যাগী লীলাপর্ষদগণের সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা, নটচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তসন্তানগণের শুভাবির্ভাব দেখিতে পাই। সেই সময়েই দেখি যে, ভারতবর্ষের দিকে দিকে সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, ললিতকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদগ্ধ চিন্তানায়কদিগের আবির্ভাব বিশ্বকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। তখনই দেখা যায়, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র রচনা করিয়া মহামানবের সাগরতীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বিদগ্ধ সাধক ও অধ্যাত্মজ্ঞানপথের অগণিত পথচারী। সমগ্র বিশ্বসমাজেও তখন দেখা দিয়াছিল এক নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার আলোক ও প্রেরণা এবং সৃষ্টি হইয়াছিল প্রাণছন্দময় এক নূতন পরিবেশ। খ্রীষ্টান-মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণ ও হিন্দুসমাজের অন্তরায়স্বরূপ বিভিন্ন কর্ম ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের নব-অভ্যুদয় ও জাগরণ বরণীয় ও স্মরণযোগ্য। মহাত্মা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামনীষীগণের আবির্ভাব হিন্দুসমাজকে সচেতন ও প্রাণদীপ্ত করিয়াছিল। তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণের শুভাবির্ভাবে হিন্দুসমাজ আরও প্রদীপ্ত ও প্রাণচঞ্চল হইয়াছিল। বলিতে কি, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভাগমনে ভারতেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বে দেখা

শ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতা

জয়রামবাটীতে শ্রীমার মন্দির

দিয়াছিল এক নবজাগরণ এবং সেই জাগরণকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন একজন মহিয়সী নারী মার্গারেট নোবল বা ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহধন্যা মানসকন্যা।

মিস্ মার্গারেট নোবল ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াই তদানীন্তন যুগের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে আপনাকে গঠিত করিতে লাগিলেন এবং ভারতের কল্যাণচিন্তায় ও কর্মে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া বরেণ্য আচার্যপ্রদত্ত 'নিবেদিতা' নাম স্বার্থক করিয়াছিলেন।

নিবেদিতা আজীবন ছিলেন গুরুগতপ্রাণ। তাঁহার মধ্যে ইতিহাস, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনা সকল-কিছু চেতনারই উদ্বোধন হইয়াছিল তাঁহার আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় এবং এই কথা তিনি স্বীকারও করিয়াছেন তাঁহার অসংখ্য রচনায়, বক্তৃতায় ও গ্রন্থে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই নবভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধির আনন্দে চিরমগ্ন হইয়াছিলেন। ভক্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "স্বামীজীর বামদিকে ভগিনী নিবেদিতা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বসিয়া হাতপাখার সাহায্যে স্বামীজীর মাথায় অনবরত বাতাস করিতেছেন, আর অজস্র অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডদেশ বাহিয়া ঝরিতেছে। * * ভগিনী নিবেদিতা আমাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন: "Can you sing, my friend? Would you mind singing those songs which our Thakur used to sing?" এই বিষয়ে আমার অক্ষমতা জানাইলে ভগিনী পুনরায় অনুরোধ করেন: "Will you please request your friend on my behalf?" তখন আমার বন্ধু নিবারণচন্দ্র সুমধুর স্বরে কয়েকখানি গান প্রাণ খুলিয়া গাহিতে লাগিলেন: 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে', 'গয়া-গঙ্গা-প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়', 'কে বলে শ্যামা আমার কালো, মা যদি কাল তবে

কেন আমার হৃদয়পদ্ম করে আলো', 'মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীল-কমলে', 'মন আমার কালী কালী কালী বলনা, কালী বললে পরে কালের ভয় আর রবে না' ইত্যাদি। আকুল আগ্রহভরে সুমধুর গান শুনিতে শুনিতে বিষন্ন মূর্তি ভগিনীর অন্তরটির কানায় কানায় যে বেদনার স্রোত বুক ফাটিয়া ঠেলিয়া আসিতেছিল তাহারই উচ্ছ্বাস নয়নপথে বহিয়া যাইতে লাগিল। এই দৃশ্য করুণ, অবিস্মরণীয়; এই স্মৃতিটুকু ভুলিবার নয়। ** ভগিনী নিবেদিতার সেইদিনকার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম কতখানি বেদনায় তাঁহার সর্বস্বহারা ও বিষাদভরা চিত্ত আলোড়িত ও তাহার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের চেতনার ভিতরে নাড়া দিয়াছিল সেইদিন,—ইহা হৃদয়বেগজনিত দৌর্বল্য নহে।"[১] সত্যই গুরুগতাপ্রাণা ত্যাগ-তিতিক্ষানুরাগিণী তপস্বিনী ও মহীয়সী নারী নিবেদিতার অন্তরে তাঁহার আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাহা সেইদিনের প্রাণস্পর্শী দৃশ্য যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারই বুঝিয়াছেন।

পরমারাধ্য আচার্যদেবের মহাসমাধির পর ভগিনী নিবেদিতা পুনরায় নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া ও করুণাময়ী শ্রীসারদাদেবীর শান্তিময় আশ্রয় লাভ করিয়া জীবনসংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইলেন। সত্য বলিতে কি, স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দের শিখাময়ী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা নিবেদিতা সেইদিন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীর চরণেই সকল-কিছু সমর্পণ করিয়া জীবনে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

একবার জয়রামবাটীতে জনৈক ভক্তকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন:

১। 'বিশ্ববাণী' (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত), ভাদ্রসংখ্যা, ১৩৫৪, পৃঃ ১৩১

"দেখ, ঠাকুরের প্রায়ই সমাধি হত। একদিন অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভাঙ্গলে বললেন, 'দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম,—সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কি ভক্তি।' তখন কি বুঝতে পেরেছিলুম, এই গুলি বুলরা সব ভক্ত হবে? আমি তো ভেবে ভেবে অবাক, সাদা সাদা মানুষ আবার কি?" শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই দিব্যদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী পরে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার বাণী ও সার্বভৌমিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ম্যাক্স মূলার, রোম্যা রোলাঁ-প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীরা পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত রচনা করিয়া প্রচার ও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বর্তমান যুগে ধর্মসমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণদেবই অনন্যসাধারণ একজন মহামানব। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদিগের পাশ্চাত্য দেশে গমন ও ধর্মপ্রচার পাশ্চাত্যবাসী নরনারীগণের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাকে আরও বর্ধিত করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীর প্রতিও পশ্চিমদেশবাসী ভক্ত-সন্তানগণের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি অসাধারণ ছিল। শ্রীসারদাদেবী তাঁহা-দিগের প্রসঙ্গে প্রায়ই বলিতেন: "যখন যেমন তখন তেমন"। সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে লালিতপালিত ও ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শ্রীমাও সেইজন্য বিদেশী সন্তানগণের সহিত আলাপ-আলোচনা ও আচরণ করিতেন একেবারে তাঁহাদিগেরই আপনজনের মতো। একবার কয়েকজন বিদেশিনী মহিলা শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিলে শ্রীমা প্রথমে করমর্দনের ন্যায় তাঁহাদিগের হস্ত ধারণ করিলেন এবং পরে ভারতীয় রীতিতে চিবুক স্পর্শ করিয়া অতি-আদরের সহিত চুম্বন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি লিখিয়াছেন: "একবার শ্রীমা কলিকাতায় ছিলেন। তখন কয়েকজন ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান মহিলা দেখা করিতে গিয়া-

ছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সঙ্গে একসঙ্গে খাইয়াছিলেন? ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?" সত্যই শ্রীমা কি স্বদেশী ও কি বিদেশী সকলের সহিত এমনভাবে ব্যবহার করিতেন না যাহাতে তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমা তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া ভাবিতেছেন না, বরং সকলেই ভাবিতেন, শ্রীমা তাঁহাদিগের একান্ত আপনার জন। একবার কলিকাতায় আসিয়া ভগিনী নিবেদিতা যখন শ্রীমাকে প্রথম দর্শন করিতে আসিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন তখন শ্রীমা নিবেদিতাকে নিকটে বসাইয়া আপন কন্যার মতো স্বস্নেহে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নিবেদিতার ভাষা না বুঝিলেও দরদী মন দিয়া শ্রীমা তাহার মনের সকল ভাব ও ভাষা বুঝিয়া লইতেন। মাতৃস্নেহের অমৃতময় স্পর্শ দিয়া শ্রীমা নিবেদিতার অন্তর সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথাও তাই যে, বিশ্বমাতৃত্বের মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীমা সারদাদেবী বিশ্বের সকল নরনারী ও এমন কি সকল প্রাণীকে আপন সন্তান বলিয়া মনে করিতেন। ভগিনী নিবেদিতাও করুণাময়ী জননীর স্নেহের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে একবার লিখিয়াছিলেনঃ "ফল আর ছায়া দুই-ই দিতে পারে এমন বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় নিতে হয়। ভাগ্যে যদি ফল আর ছায়া না-ই জোটে, আমাদের ছায়া পাবার আনন্দ কেড়ে নেবে কে?" স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতার এই কথা মিষ্টার ষ্টার্ডিকে একটি পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

স্নেহধন্যা নিবেদিতা শ্রীমার পুণ্যস্পর্শ ও পবিত্র সাহচর্য লাভ করিয়া নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ এই দেশের (ভারতের) মতোই গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্ত্রীভক্তরা যেরূপে শয়ন করিতেন, নিবেদিতা তাঁহাদিগের মতো রাত্রে একসঙ্গে সেরূপেই মৃত্তিকায় শয়ন করিতেন। অন্যান্যদিগের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র তোশক, একটি বালিশ ও একটি কম্বল বিস্তৃত হইত নিবেদিতার জন্যও। নিবেদিতার

জীবনচিন্তা এবং আচরণও ছিল সম্পূর্ণ একজন ভারতবাসীর মতো এবং সর্বসমক্ষে আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। শ্রীমার নিকট গোপালের-মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি স্ত্রীভক্তগণ প্রায় সর্বদাই থাকিতেন এবং তাঁহারা সকলে নিবেদিতা ও স্বামীজীর অন্যান্য বিদেশিনী মহিলাগণকে স্নেহের সহিত একান্ত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে আচার-বিচারনিষ্ঠ সংস্কারপূর্ণ গোপালের-মার নিবেদিতার প্রতি উদার ব্যবহার সত্যই অভিনব। বলিতে গেলে, সকল সংস্কারকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া গোপালের-মা নিবেদিতাকে স্নেহ-মমতার পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-চেতনার উদ্বোধনে ও আত্মানুভূতির আশীর্বাদস্পর্শে মানুষ সকল সংস্কারের উর্ধে উঠিয়া মুক্তির আনন্দে সংসারবন্ধনও ছিন্ন করিতে পারে। গোপালের-মার হইয়াছিল তাহাই। শ্রীরামকৃষ্ণস্পর্শমণির স্পর্শ লাগিয়া তিনি খাঁটি সোনায় পরিণত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকেও গোপালের-মা অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন এবং সেইজন্য 'নরেনের মেয়েকে' গোপালের-মা কখনও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই, বরং কোলে টানিয়া লইয়া তাহাকে আপনার হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমার স্নেহ-করুণা লাভ করিয়া আপনাকে চিরনির্মল করিয়াই গঠন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা একবার বলিয়াছিলেনঃ "মা যখন সম্পূর্ণ আত্ম-সমাহিত হয়ে থাকতেন তখন একটা প্রচণ্ড শক্তিস্পন্দন বিচ্ছুরিত হত তাঁর সর্বাঙ্গ হতে। প্রাণের মর্মমূলে যেন তিনি নাড়া দিতেন।" সত্যই শ্রীমার অনির্বচনীয় করুণা ও সকল বিষয়ে ও চিন্তায় প্রেরণা লাভ করিয়া নিবেদিতা জীবনে এক নবচেতনা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় হিন্দুনারীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ও হিন্দুসমাজের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়া কর্ম করিবার নীতি ও কৌশল

তিনি শ্রীমার জীবনধারা হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। নিবেদিতা একবার শ্রীমার নিকট একাধারে এক সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদিন নিবেদিতা সন্ধ্যাকালে উপনীত হইয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিতেছেন এমন সময়ে শ্রীমা তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেনঃ "এবার তোমার কাজে নামবার সময় হয়েছে।" শ্রীমা দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া নিবেদিতার পক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার তখন সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীমার বাটীর অত্যন্ত নিকটেই বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার থাকিবার জন্য একটি বাটী ঠিক করা হইয়াছিল। সেই সময়ে গোপালের-মা নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া সেই নূতন বাটীটি দেখাইয়া আনিয়াছিলেন। গোপালের-মা ও নিবেদিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বোসপাড়ার সকল বাটীর দ্বারদেশেই প্রায় স্ত্রীলোকরা কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া একজন ব্রাহ্মণকন্যা গোপালের-মা ম্লেচ্ছদেশের বিদেশিনী রমণী নিবেদিতার হাত ধরিয়া যে চলিয়াছেন তাহা কৌতুকের সহিত দেখিতেছে। গোপালের-মা হাসিতে হাসিতে স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ "এই দেখ, মায়ের এক মেয়ে। ও আমাদের সঙ্গে থাকবে ঠিক করেছে। ঠাকুর ওর মঙ্গল করুণ।" সমবেত সকলেই গোপালের-মার কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহাদিগের দিকে চহিয়াছিল। সুতরাং সত্য যে, গোপালের-মা নিবেদিতাকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জন করিয়া লইয়াছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতাও আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতেরই একজন ভাবিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

একবার স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার উদ্দেশ্যে একটি আশীর্বাণী প্রেরণ করিয়া লিখিয়াছিলেনঃ

The mother's heart, the hero's will;
The sweetness of the southern breeze,

The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free :
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.
Be thou to India's future Son
The Mother, Mind and Friend in one.

অর্থাৎ—

মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিণের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে-অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর্য-বেদিতলে ঃ
এসব তোমারই হ'ক, আরও ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।
অনাগত ভারতের যে-মহাসাগর,
সেবিকা বান্ধবী মাতা-তুমি তার সব।

যাহাহউক শ্রীসারদাদেবীর স্নেহ-ভালবাসা যে কত নিবিড় ছিল ও কত গভীরভাবে সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল তাহা ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার কয়েকটি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমাকে প্রতিদিন বিচিত্র কর্মের মধ্যে ব্যাপৃত দেখিয়া নিবেদিতা অত্যন্ত মুগ্ধ হইতেন। শ্রীমা-সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ "আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ-প্রতিনিধি, না নূতন কোন আদর্শের অগ্রদূত ? তাঁহার মধ্যে দেখা যায় সাধারণতম নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্যস্বরূপ। তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। যত নূতন বা জটিলই কোন প্রশ্ন হউক না কেন, আমি তাঁহাকে ইহার উদার ও সহৃদয় মীমাংসা

করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মত।" শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান ও ভক্তগণের প্রতি শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসার কথা উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা আর একবার লিখিয়াছিলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানরা বেশীর ভাগ যাঁরা ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীমায়ের শিষ্য ছিলেন। শ্রীমা স্নেহভরে তাঁদের আশীর্বাদ করেন; সদ্‌গুরু কাছ থেকে যে-শক্তি যে-দিব্য ভাব লাভ করেছেন তারই কিছুটা যেন সঞ্চারিত করেন তাঁদের অন্তরে। যদি কেউ উপদেশ চান, তবে মায়ের মত আশ্বাস দেন তিনি, করুণাভরে সবার যত দুঃখ যত উদ্বেগের বোঝা তুলে নেন নিজের উপরে। তাঁরা আনন্দে ভরপুর হয়ে চলে যান।"

নিবেদিতা নেল হ্যামণ্ডকে যে পত্রটি লিখিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন: "শুনতে এ'সব কেমন লাগবে হয়তো, কিন্তু সবাই বলে এই মেয়েটি (শ্রীমা) ব্যাবহারিক জ্ঞান আর সাধারণ বুদ্ধিতে সবাইকে হার মানাতে পারেন। সত্যি. যারা তাঁকে সামান্যই চেনে তারাও তাঁর মধ্যে এর নিদর্শন পেয়েছে। কোনও কিছু করতে হলেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরামর্শ নিতেন। এখন শিষ্যরাও সবসময়ে তাঁর উপদেশ মেনে চলেন।" আর একটি পত্রের কথাও এখানে উল্লেখ করিব। পত্রটি নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন শ্রীমাকে কেম্ব্রিজ হইতে। সেই পত্রে নিবেদিতা লিখিয়াছেন:

"আদরিণী মা,

"স্যারার জন্য প্রার্থনা করবো বলে আজ ভোরে আমি গীর্জায় গিয়েছিলাম। সবাই ওখানে যীশুজননী মেরীর কথা চিন্তা করছে; আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা দৃষ্টি, পরনের সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—সবই যেন তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। আমার

মনে হল, তোমার সেই দিব্যসত্তাই যেন বেচারী স্যারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম, জানো মা? ভাবছিলাম, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আমার কী নির্বুদ্ধিতাই হয়েছিল! আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মত বসে থাকতে পারাটাই তো যথেষ্ট। মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মত উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা। তোমার ভালবাসা হল এক স্নিগ্ধ শান্তি—যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং অমঙ্গল চায় না। ও যেন লীলাচঞ্চল একটি হৈমদ্যুতি! কয়েক মাস আগেকার সেই রবিবারটি কী আশীসই না বয়ে এনেছিল! গঙ্গাস্নানে যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য দৌড়ে তোমার কাছে গেলাম। তোমার আনন্দময় ঘরখানিতে তুমি আমায় যে আশীর্বাদ জানালে, তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি। প্রেমময়ি মা, চমৎকার একটি একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমায় লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু তাতেও মনে হয়, বড় বেশী শব্দ করা হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মত। সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেমধারণের পাত্র। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে তাঁর প্রতীকস্বরূপ; আর আমাদের উচিত, তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা,—অবশ্য কখনও একটু মজা করা ছাড়া। বাস্তবিকই ভগবানের যা-কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই শান্ত নীরব। গোপনে ও অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদের জীবনে, যেমন বাতাস ও সূর্যের আলো, যেমন বাগানের ও গঙ্গার মাধুর্য। এই সব শান্ত জিনিষই তোমার তুলনা।

"বেচারী এস. স্যারাকে তোমার শান্তির উত্তরীয়খানি পাঠিয়ে দিও। রাগদ্বেষের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময়ে সময়ে তোমার চিন্তা

সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দুর মত ভগবৎসত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনও মলিন হয় না!

প্রিয়তমা মা আমার,
তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকী
নিবেদিতা।"

বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর অপার্থিব পুত্র-বাৎসল্য ও মাতৃত্বের অনন্যসাধারণ নিদর্শনের বর্ণনা এই পত্রে পাওয়া যায়। শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসা ভগিনী নিবেদিতার অন্তরকে এমনই গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল যে, সুদূর ইংলণ্ডের কোন গির্জায় যীশুমাতার স্বর্গীয় মাতৃভাবের মূর্তি দর্শন করিয়া নিবেদিতার মনে হইয়াছিল, শ্রীশ্রী-সারদাদেবীই যীশুজননী মেরীর প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি। প্রেম ও ভালবাসা দিয়া সকল কিছুই জয় করা যায়, শ্রীমা তাই তাঁহার অহেতুকী করুণা ও ভালবাসা দিয়া শুধুই নিবেদিতার কোমল অন্তর নয়, বিশ্ববাসীর অন্তরকেও সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছিলেন।

শিশুকন্যাদিগের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা ছিল নিবেদিতার অন্তরে বহুদিন হইতে এবং এই ইচ্ছার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন অন্তরের মধ্যে তাঁহার আচার্যদেব স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী যখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার লণ্ডনে যান (নিবেদিতাও সঙ্গে গিয়াছিলেন) তখন একদিন আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন ভগিনী নিবেদিতা তাহার উল্লেখ করিয়া *The Master as I Saw Him* গ্রন্থে লিখিয়াছেন:
"It was in the course of a conversation much more casual than this, that he turned to me and said, 'I have plans for the women of my own country in which you, I think, could be of great help to me', and

I know that I had heard a call which would change my life."[১] স্বামীজী পুনরায় অপর একটি প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন : "For my own part I will be incarnated two hundred times, if that is necessary to do this work amongst my people, that I have undertaken.' And the word stand in my (Nivedita's) own mind beside those which he afterwards wrote to me on the eve of my departure, **'I will stand by you unto death,** whether you work for India or not, * * ।"[২] পরমারাধ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিময়ী নির্দেশ ও প্রেরণা লাভ করিয়াই ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিবেদিতা বাগবাজারে (কলিকাতা) শিশুকন্যাদিগের জন্য একটি শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন[৩] ও সেই শিক্ষায়তনে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে শ্রীসারদাদেবীর একটি প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১। *The Master as I Saw Him* (1959), pp. 32-33.

২। Ibid. , p. 34.

৩। "It had been taken for granted from the first, that at the earliest opportunity I would open a girls' school in Calcutta. And it was characteristic of the Swami's methods that I had not been hurried in the initiation of this work, but had been given leisure and travel and mental preparation. * * The one thing that I knew was that an educational effort must begin at the standpoint of the learner and help him to development in his own way."—*The Master as I Saw Him* (1959), p 136.

পুনরায় পাদটীকায় ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার শিক্ষামন্দিরপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অনেক পরিমাণে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : "In the autumn of 1903, the whole work of Indian women

ভগিনী নিবেদিতার অন্তরের একান্ত বাসনা হইল 'একদিন শ্রীমা ঐ শিক্ষামন্দিরে পদধূলি দান করিয়া তাহা চিরপবিত্র করেন এবং তাঁহার অন্তরের সেই শুভসংকল্প একদিন শ্রীমাকে নিবেদন করিলেন। শ্রীমা নিবেদিতার আমন্ত্রন আনন্দে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং নিবেদিতার আনন্দের আর সীমা ছিল না।

নির্দিষ্ট দিনে রাধু, গোলাপ-মা ও অন্যান্য কয়েকজন স্ত্রীভক্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমা নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষামন্দিরে গমন করিলেন। তাঁহার ঘোড়ার গাড়ী শিক্ষামন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে সকলে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। নিবেদিতা শিশু-কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া করজোড়ে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া শ্রীমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীমা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে নিবেদিতা শ্রীমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শ্রীমাকে শিক্ষামন্দিরের মধ্যে হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া গেলেন। নিবেদিতার নির্দেশে শিক্ষামন্দিরের ছাত্রীগণ সেইদিন শ্রীমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল।

শ্রীমার বিদ্যালয়-পরিদর্শনের প্রসঙ্গে নিবেদিতা পরে কয়েকজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন: "মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে ও কেমন করিয়া সম্বর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয়ে স্থির করিতে তাহার আর বিন্দুমাত্রও সময় ছিল না।" শ্রীমার প্রতি নিবেদিতার কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল তাহা এই কথাগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়। তাহাছাড়া নিবেদিতার উপরও শ্রীমার যে কী ধরনের স্নেহ-মমতা ছিল তাহা শ্রীমার একটি পত্র হইতেও জানিতে পারা যায়। একবার নিবেদিতা নারীজাতীর শিক্ষার উন্নতিবিধানকল্পে

---

was taken up and organised by an American disciple, Sister Christine, * * From the experiment which I made in 1898 to 1899, was gathered only my own education—*Nivedita.*"—Ibid., p.137.

অর্থসংগ্রহের জন্য যখন আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন তখন শ্রীমা তাঁহাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রটির মর্ম হইল:

"শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু,
স্নেহের খুকী নিবেদিতা,

তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি আমার শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার সহিত একত্র তোলা তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক সময় চাহিয়া দেখি। তখন মনে হয়, তুমি যেন নিকটেই রহিয়াছ। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর ভালয় ভালয় ফিরিয়া আইস, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম-সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করুন এবং যথার্থ ধর্মশিক্ষা দ্বারা ঐ আশ্রমের উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়। আমার আশীর্বাদ জানিও। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ কর, ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কার্য করিতেছ। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা যখন তুমি ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না। ধ্রুব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যালাপ অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ ইহা বলাই বাহুল্য। প্রভুর নাম এবং লীলা উভয়ই কত সুন্দর!

তোমার
মাতাঠাকুরাণী।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয়বার যখন স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডন যাত্রা করেন (১৮৯৬ খ্রীঃ) তখন তাঁহার সহিত নিবেদিতাও যাইবেন স্থির হইয়াছিল। শ্রীমাকে ছাড়িয়া যাইতে নিবেদিতার

মন গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। আমেরিকা যাত্রার পূর্বদিন শ্রীমার সহিত নিবেদিতা সারাদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কেবলই তখন মনে হইতেছিল, আবার কতদিন পরে আসিয়া শ্রীমার করুণা ও স্নেহ-ভালবাসার ছায়ায় তিনি দিন অতিবাহিত করিতে পারিবেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে বিদায়-অভিনন্দন-উপলক্ষ্যে একদিন চা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেইদিন বেলুড় মঠের পক্ষ হইতে স্নেহ-উপহার-স্বরূপ নিবেদিতাকে একটি অভিনন্দনপত্র ও গোলাপ ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল। পরের দিন রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ বিদায়কালীন সভায় উদাত্ত কণ্ঠে সন্ন্যাসজীবনের ত্যাগদীপ্ত আদর্শ-সম্বন্ধে একটি অগ্নিময়ী বক্তৃতা দান করিয়া বলিয়াছিলেন, ঃ "সংক্ষেপে সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা। তবে কি আত্মহত্যা করতে হবে? একেবারেই নয়, মৃত্যু অনিবার্য জেনে নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে।" পরের দিন তাঁহাদের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছিল। শ্রীমা নিজে উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজী ও নিবেদিতা ব্যতীতও স্বামী তুরীয়ানন্দ ও বেলুড় মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীসন্তানদিগকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে নিবেদিতা পাশ্চাত্যভূমি হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীমার চরণ বন্দনা করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে শ্রীমার পবিত্র সান্নিধ্য ও করুণা লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। দৈনন্দিন জীবনে অজস্র কর্তব্যকর্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সময় পাইলেই নিবেদিতা শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইতেন। নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী ভারতীয় নারীজাতির জীবন্ত আদর্শ এবং এই আদর্শ নারীসমাজ গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ পুনরায় তাহার অতীত মহিমময় গৌরব ফিরিয়া পাইবে।

নিবেদিতা যখনই শ্রীমার নিকটে যাইতেন তখন ক্রিষ্টীনও প্রায় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং উভয়ে শ্রীমার পার্শ্বে বসিয়া অনেক

সময়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। নিবেদিতা যখন আলমোড়ায় ছিলেন তখন বিভিন্ন মানসিক অশান্তি ও বেদনা তাঁহার হৃদয়কে অনেক সময় ব্যথিত করিত, কিন্তু যখনই তিনি পুনরায় শ্রীমার পরমশান্তিপূর্ণ সান্নিধ্য, স্নেহ-আশীর্বাদ ও অপার করুণার কথা মনে করিতেন তখনই শান্তির প্রবাহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত। একবার নিবেদিতা একটি পত্রে শ্রীমার প্রসঙ্গে মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেনঃ "মাতা দেবী এখানে রহিয়াছেন। কি রকম ছোট, রোগা ও কালো হইয়া গিয়াছেন। পল্লীজীবনের কঠোরতাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ। কিন্তু পূর্বের ন্যায় সেই নির্মল অন্তঃকরণ নারীত্বের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা! তাঁহাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার জন্য কত জিনিষ যে দিতে ইচ্ছা করে! একটি নরম বালিশ, একটি তাক ও একখানি কম্বলের প্রয়োজন। কত জিনিষের দরকার! সর্বদা তাঁহার নিকটে লোকজনের ভীড় লাগিয়াই আছে। আমার ইচ্ছা করে—তাঁহাকে একখানি সুন্দর ছবি দিই। অবশ্য অপেক্ষা করিতে পারা যায়।" স্নেহধন্যা কন্যা ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রীমার কি গভীর স্নেহ-মমতা ছিল তাহার মর্মস্পর্শী চিত্র এই পত্রটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নারীজাতির আদর্শ-সম্বন্ধে একবার প্রেরণাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজী মনে করিতেন এবং স্বীকার করিতেন যে, ভারতীয় নারীজাতির জ্বলন্ত আদর্শের ভাব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীর পবিত্র জীবনাদর্শ হইতে। স্বামী বিবেকানন্দ ঐ আদর্শকেই অন্তরে চিরজাগ্রত রাখিয়া বলিয়াছেনঃ "……হে ভারত, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার

সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" এই প্রেরণাময় প্রাণদীপ্ত ভাষণে যেখানে স্বামীজী 'মা'-র কথা বলিয়াছেন সেখানে তিনি জগজ্জননী শ্রীসারদাদেবীর অপার্থিব জ্বলন্ত আদর্শের উপরই ভারতজননীর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দুইয়ের মধ্যে কোন্ পার্থক্য রাখেন নাই। ভগিনী নিবেদিতাও সেইজন্য আপন আচার্যদেবের সময়ের সাগরতীরে অঙ্কিত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত-জননীকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই একবার কথাপ্রসঙ্গে শ্রীসারদাদেবীকে তিনি বলিয়াছিলেন: "মা, আমরা আর জন্মে হিন্দু ছিলাম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি।" আসলে ভগিনী নিবেদিতা যে ভারতবাসী এবং আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দান করিতে গৌরব অনুভব করেন সেকথাই বিশ্বরূপিণী মা শ্রীসারদাদেবীকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা যখন পাশ্চাত্য হইতে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন তখন শুধু বাঙলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতের বুকে স্বদেশী-আন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের স্বনামধন্য বহু মনীষীই তখন স্বদেশী-আন্দোলনের যজ্ঞে যোগদান

করিয়াছেন। সেই সময়ে ইংরাজ-সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষসংগ্রামে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই বন্দী অবস্থায় কারাগৃহের অন্ধকারে আবদ্ধ ছিলেন এবং অনেকে ফাঁসীকাষ্ঠে জীবন দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অন্যতম নেতা ছিলেন মনীষী অরবিন্দ ঘোষ। ইংরাজী মে মাসে বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি লাভ করিলে জুন মাসের 'কমযোগিন' পত্রিকায় তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বহু বিপ্লবী সন্তান রামকৃষ্ণসংঘে যোগদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব ও কর্মধারায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে শ্রীমা বাস করিতেছিলেন বাগবাজারে উদ্বোধনের বাটীতে। কোন কোন বিপ্লবী সন্তান শ্রীমার নিকট গোপনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধুলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিতেন। মনীষী শ্রীঅরবিন্দও ঐ সময়ে শ্রীমার সহিত উদ্বোধনের বাটীতে বাগবাজারে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবেদিতারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তদানীন্তন সময়ে ঐ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা আনন্দিত হইয়া একবার লিখিয়াছিলেন: "সব দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়া বলিতেছে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিকট হইতে নূতন প্রেরণা আসিতেছে। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দলে দলে সকলে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। শ্রীমা বলিতেছেন, ছেলেরা কী নির্ভীক! দেশের মধ্যে কী পরিবর্তন আসিয়াছে! সকলেই বলিতেছে, তাহারা স্বামীজীর শিষ্য।" মনে পড়ে, এই প্রসঙ্গে শ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা: "তোমার এত ছেলে হবে যে 'মা' ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে নি।" শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়া ভগিনী নিবেদিতাও একদিন শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন: "মা, ঠাকুর যে বলেছিলেন, কালে আপনি বহু সন্তান লাভ করবেন, বোধহয় তার সময় অতি নিকট। সমগ্র ভারতবর্ষই আপনার।" শ্রীমা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন: "তাই তো দেখছি।"

পাশ্চাত্য দেশ হইতে নিবেদিতা শ্রীমার জন্য কিছু উপহারসামগ্রী আনয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমা ঐ সকল উপহার পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীমা তাঁহার সকল সন্তানের স্নেহের উপহারগুলি একান্ত যত্নের সহিত রাখিয়া দিতেন ও বলিতেন: "জিনিসের আর দাম কি, স্মৃতিরই দাম।"

ভগিনী নিবেদিতা একবার একটি জার্মান-সিলভারের কৌটা শ্রীমাকে উপহার দিয়াছিলেন। ঐ কৌটাতে শ্রীমা যত্নের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখিয়াছিলেন এবং বলিতেন: "পূজার সময় কৌটোটি দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে।" ভগিনী নিবেদিতা এক সময়ে শ্রীমাকে একখানি এণ্ডির চাদর উপহার দিয়াছিলেন। বহুদিন অতীত হইলে জনৈক ভক্ত অকস্মাৎ বাক্স হইতে সেই জীর্ণ এণ্ডির চাদরটি বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন: "মা, এখানি রেখে কি হবে? ওতে কিছু নেই, ফেলে দিই।" তাহাতে শশব্যস্ত হইয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "না বাবা, ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়েছিল। ওখানি থাক।" শ্রীমা সেই জীর্ণ এণ্ডির চাদরটিকে একান্ত যত্নের সহিত কালজীরা দিয়া রাখিয়া দিতেন, আর বলিতেন: "কাপড়খানিকে দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কি মেয়েই ছিল বাবা! আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম কথা কইতে পারত না, ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাঙ্গালা শিখে নিলে। আমার মাকে খুব ভালবাসত।" বিদেশিনী নিবেদিতার পক্ষে বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীকে আপন জননী বলিয়া জ্ঞান করা এক অভিনব ঘটনা বৈকি!

একদিন ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রীমা কুশল-প্রশ্ন করিয়া পশমের তৈয়ারী একটি ছোট পাখা উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন: "আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।" নিবেদিতা শ্রীমার নিকট হইতে পাখাটি উপহার পাইয়া একবার মস্তকে স্পর্শ করান, একবার বক্ষে ধারণ করেন এবং একবার বলেন: "কি সুন্দর, কি চমৎকার!" নিবেদিতার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া শ্রীমা হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন: "কি একটা

সামান্য জিনিষ পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখছ! আহা কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) কি ভক্তিই না করে। নরেন এদেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে এদেশে (ভারতবর্ষে) তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরেই বা কি ভালবাসা!”

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভগিনী নিবেদিতা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ও ভারতের নরনারীকে আপনার অন্তর দিয়া শুধু ভালবাসিতেন নয়, শ্রদ্ধা করিতেন। চির-আনন্দময়ী শ্রীমার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত স্নেহধারা, শান্ত-সমাহিত অধ্যাত্মভাবরাশি এবং শ্রীমার প্রসন্নোজ্জ্বল স্নেহপূর্ণ মূর্তি ও সকল সন্তানের প্রতি বর্ষিত অবিশ্রান্ত প্রেম ও করুণার ভাব ভগিনী নিবেদিতার অন্তরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শুনিয়াছি, নিবেদিতা যখন শ্রীমাকে প্রণাম করিতেন তখন অতি সন্তর্পণে রুমাল দিয়া তিনি শ্রীমার চরণযুগল মুছাইয়া দিতেন। একবার অতীতে মিসেস্ ওলি বুলের জন্য নিবেদিতা একটি গীর্জায় প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার ডায়েরীতে (Diary) তিনি লিখিয়াছিলেনঃ “গীর্জায় গিয়াছিলাম। সারদাদেবীকে আমাদের মেরীমাতা বলিয়া মনে হইল। তাঁহার সান্নিধ্য শুদ্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়, আমরা সকলেই তাঁহার (শ্রীমার) মত হই।” অবশ্য পূর্বে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি।

মিসেস্ ম্যাকলাউড-সম্পর্কেও এখানে একদিনের একটি ঘটনার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, কেননা সেই ঘটনা তাহা হইতেও বোঝা যাইবে যে, শ্রীমার প্রতি তাঁহাদিগর অন্তরের আকর্ষণ ও ভালবাসা কত গভীর ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় বেলুড় মঠে মিসেস্ ম্যাকলাউড উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে প্রণাম ও জপ ধ্যান করিয়া তিনি যখন অতিথি-ভবনের (গেষ্ট-হাউস) দিকে যাইতেছিলেন তখন ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেনঃ “আমি তাঁকে দেখেছি, আমি

তাঁকে দেখেছি।” প্রদীপ্ত তাঁহার মুখ এবং আনন্দে তিনি গদগদ। কিছুক্ষণ পরে ম্যাকলাউড পুনরায় অস্ফুটস্বরে বলিলেন: “পবিত্রতাস্বরূপিণী মা! আমি তাঁকে দেখেছি।” এইভাবে আত্মহারা হইয়া মাঝে মাঝে তিনি 'মা মা' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রায় দুই শত গজ পথ ভাবের ঘোরে অতিক্রম করিলেন, বহির্জগতের প্রতি তখন তাঁহার আর কোন দৃষ্টিই ছিল না। ম্যাকলাউড তখন শ্রীমার ধ্যানেই যেন আত্মসমাহিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিদেশিনী ভক্তগণও শ্রীমার দেবীত্বের ও মাতৃত্বের অপরূপ মাধুর্যে ও স্নেহলাবণ্যময় বিকাশে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

পুনরায় ভগিনী নিবেদিতার প্রসঙ্গেই বলি। নিবেদিতার ছিল বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি। নিবেদিতা ছিলেন একাধারে শিল্পরসিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক ও আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। তবে কেহ নিবেদিতাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'আমি শিক্ষয়িত্রী', কেননা ভারতের জনগণের মধ্যে শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের পবিত্র আদর্শ প্রচার করিতে তিনি কম চেষ্টা করেন নাই। নিবেদিতার প্রদর্শিত ভারতীয় শিল্পের আদর্শকে অনুসরণ করিয়াই জাপানের বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক কাকুজো ওকাকুরা *The Ideals of the East* (With Special Reference to the Art of Japan) গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরাজী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভগিনী নিবেদিতা শিল্প-সমালোচক ওকাকুরার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ গ্রন্থের উপর চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা (Introduction) লিখিয়া দেন। সেই ভূমিকার শেষভাগে তিনি তাঁহার বরেণ্য আচার্যদেব স্বামী বিবেকানন্দের নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: Aptly enough, within the last ten years, by the genius of a wandering monk—the Swami Vivekananda—who found his way to America and

made his voice heard in the Chicago Parliament of Religions in 1893, Orthodax Hinduism has again became aggressive, as in the Asokan period. * * repeat itself in a few decades and the world may again witness the Indianising of the East. * * Our author has talked in vain if he has not conclusively proved that contention with which this little handbook opens, that Asia, the Great Mother, is for one."[1] নিবেদিতা ভূমিকার নিম্নে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন "Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda, 17, Bose Para Lane, Bagh Bazar, Calcutta"

এই কথা অতীব সত্য যে, ভারতের সেবায় ও ভারতীয় আদর্শের পূজায় ভগিনী নিবেদিতা আপনার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষার বাহ্যিক ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও অনুকরণকে তিনি মনে-প্রাণে কোনদিনই পছন্দ করিতেন না, পরন্তু শিক্ষা ও শিল্পের আদর্শ মানুষের চরিত্রকে চিরপবিত্র করিবে ও মানুষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে ইহাই ছিল শিক্ষা ও শিক্ষার আদর্শ-সম্বন্ধে নিবেদিতার মনোভাব। সেইজন্য একবার তিনি বলিয়াছিলেন: "হায়, শিক্ষাই তো ভারতের সমস্যা। কেমন করে প্রকৃত শিক্ষা—জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, য়ুরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণের পরিবর্তে, ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে পারা যায়, তাই সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতিসাধন। তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে, পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র স্থাপন।"

নিবেদিতা যে আপনাকে ভারতীয়দের মধ্যেই একজন (আপনার)

1. *The Ideals of the East* (London, 1903), pp. XX-XXII

করিয়া লইয়াছিলেন সেইকথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের বাটীতে যখন তিনি থাকিতেন তখন তাঁহার পড়িবার ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন বাইবেল, বাউডেনের 'বুদ্ধচর্চা', 'এপিক্‌টেটাস', রেনাঁর 'চয়নিকা'। তাহাছাড়া থাকিত এমার্সন, থোরো, যোয়ান্ অব আর্ক, সেণ্ট লুইস্, আলেকজাণ্ডার, পেরিক্লিস্ ও আলাদিন প্রভৃতির জীবনী। কক্ষের দেওয়ালের গাত্রে ঝোলানো থাকিত আপনার একান্ত আদরের হাতীর দাঁতে নির্মিত ক্রস্ (Cross) এবং নালভাঙা লিলির অর্ঘ্য লইয়া বিবশা মেরী দেবদূতের বার্তা শুনিয়া এলাইয়া পড়িয়াছেন—এই একটি-মাত্র ছবি বা প্রতিকৃতি। বাগবাজারপল্লীর শিশুরা আনন্দে দল বাঁধিয়া সমবেত হইত নিবেদিতার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার আপনার হস্তে সজ্জিত করা কক্ষটি দেখিবার জন্য এবং নিবেদিতা সেইজন্য আনন্দে অধীর হইয়া অতিযত্নের সহিত তাহাদের সকল-কিছু দেখাইতেন। পল্লীর শিশুরাও নিবেদিতার আদর-যত্নে যেন আপনার হইতে আপন হইয়া যাইত! নিবেদিতাকে যদি কেহ প্রশ্ন করিতঃ "তোমার শিক্ষামন্দিরের উদ্দেশ্য কি?" তাহা হইলে নিবেদিতা দৃপ্তকণ্ঠে বলিতেনঃ "শিক্ষামন্দিরে যে শিক্ষা ছোট মেয়েরা পাবে, তা যেন তাদের সারাজীবনের পাথেয় হয়।" কেহ একবার নিবেদিতাকে তাঁহার শিক্ষামন্দির-সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেনঃ "ছাত্রীরা (আপনার শিক্ষামন্দিরে) কোন্ ভাষায় কথা বলে?" নিবেদিতা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ "বাংলাভাষায়। তিন বৎসর পরে সংস্কৃত ও চার বৎসর পরে সামান্য ইংরাজী ভাষা তাদের (ছাত্রীদের) শিক্ষা দেওয়া হবে।"

"(আপনার শিক্ষামন্দিরে) কি কি গ্রন্থ বিশেষভাবে পড়ানো হয়?"

"রামায়ণ ও মহাভারত।"

"আপনার ধর্ম কি? (অর্থাৎ আপনি কোন ধর্মে বিশেষ বিশ্বাসী?)"

"আমরা শ্রীসারদাদেবীর একান্ত অনুগত। আপনার বিশ্বজননীর চরণে আত্মসমর্পণ করেছি।" তাহাছাড়া নিবেদিতা আরও বলিয়াছিলেন ঃ "উপনিষৎ, বেদান্ত, গীতা এ'সকল ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থই আমাদের শিক্ষার নিয়ামক ও আদর্শ।"

ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার যে কী গভীর জ্ঞান ছিল সেই সম্বন্ধে পূর্বে সামান্যভাবে আলোচনা করিয়াছি। পূণ্যভূমি ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়া বরেণ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতা ভারতের সকল দেশ, সকল তীর্থক্ষেত্র, গুহাচিত্র ও ও কলাক্ষেত্র প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া জীবনে অভূতপূর্ব ও অপরিমেয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'ফুটফলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রী' (*Footfalls of Indian History*) ও অন্যান্য গ্রন্থে তিনি ভারতের ভাস্কর্য, চিত্র ও গুহাচিত্র প্রভৃতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাতে ভারতীয় শিল্পবিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পক্ষেত্রে তাঁহার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী (original viewpoint) ছিল এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তদানীন্তন বিদগ্ধ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ই. বি. হ্যাভেল, ওকাকুরা এবং আরও অনেক শিল্পী ও চিত্র-সমালোচক। প্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামীও নিবেদিতার শিল্পদৃষ্টিতে কম আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হন নি। তাহাছাড়া তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও দেশসেবক সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্না নারী নিবেদিতার কর্মে, গুণে ও সাংস্কৃতিক অবদানে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ এবং আরও বাঙলার ও ভারতের প্রথিতযশ মনীষীগণ ভগিনী নিবেদিতার অসামান্য চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া ও তাঁহার নিকটে সাহায্য লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কে নিবেদিতার মধ্যে ছিল স্বতন্ত্র ও অভিনব এক আদর্শবাহী দৃষ্টিভঙ্গী। শিল্পপ্রসঙ্গে

নিবেদিতা একবার বলিয়াছিলেন: "শিল্পের অভ্যুদয়ের উপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অবশ্য ঐ শিল্প জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।" সত্যই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর শিল্পপ্রতিষ্ঠা যদি গড়িয়া না উঠে তবে দেশের জাতীয় জীবনে তাহা কোনদিনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাই আপনার দিক হইতে নিবেদিতা ভারতের সকল-কিছুকেই অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু একদিন আপনার অঙ্কিত 'দশরথের মৃত্যু' চিত্রটি লইয়া নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। নিবেদিতা সেই চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন: "আমার খুব ভাল লাগছে। এই যে ঘরটা করেছ, এটা খুব কাম্ অ্যাণ্ড কোয়ায়েট হয়েছে। ঠিক শ্রীমার ঘরের মতো মনে হচ্ছে, সেজন্য বোধহয় এত ভাল লাগছে আমার।" নিবেদিতার এই কথাগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করি আমরা দেবীপ্রতিমা শ্রীসারদাদেবীর প্রতি তাঁহার অন্তরের কি আনন্দনিবিড় দৃষ্টি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা!

আসলে শ্রীসারদাদেবীর জীবনে যে অনাড়ম্বর সহজ সরল প্রশান্তি ও আত্মসমাধির অপার্থিব ভাব নিহিত ছিল তাহাই নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ও সেইজন্য তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ধ্যান করিয়াছিলেন ও জীবনে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই শান্ত সমাহিত ধ্যানঘন ভাব। এই প্রসঙ্গে শ্রীসারদাদেবীর জীবনে একদিনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথম প্রথম ভগিনী নিবেদিতা মিসেস্ ওলি বুল ও মিস্ ম্যাকলাউডকেসঙ্গে লইয়া শ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। একদিন তাঁহারা তিনজনে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া মৃত্তিকায় আসনে বসিলেন। সেই সময়ে একজন মহিলা বিদেশিনী মহিলাদের জন্য পিতলের রেকাবি করিয়া কিছু কাটা ফল, মিষ্টি ও চা আনিয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীমার জন্যও একটি চীনামাটির পাত্রে ঐ সকল ফল-মিষ্টান্নাদি আনিয়া দিলেন। সদানন্দময়ী শ্রীমা

মনের আনন্দে ও প্রসন্নতায় তাঁহাদিগের সহিত ফল, মিষ্টি প্রভৃতি খাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিবেদিতা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন: "কী যে অপরূপ দেখতে।" এই কথা বলিয়া নিবেদিতা অপলক দৃষ্টিতে শ্রীমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু শ্রীমা সেইদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একমনে খাইতে খাইতে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীমা নিবেদিতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "তোমরা বাড়ীতে কিভাবে ঠাকুর পূজো কর? কি ধরনের প্রার্থনা কর তাঁর কাছে? তোমাদের বাপ-মা এখনও বেঁচে আছেন?" শ্রীমার প্রশ্নগুলি শুনিয়া তাঁহারা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিতে লগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিবেদিতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীমা পুনরায় বলিলেন: "তোমরা আসায় ভারী খুসী হয়েছি—মা।" শ্রীমার অমৃতসিক্ত স্নেহপূর্ণ কথায় তাঁহারা তিনজনেই আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। পরে আশীর্বাদ মস্তকে লইয়া তাঁহারা শ্রীমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর একদিনের কথা। শ্রীমার নিকট নিবেদিতা আসিয়াছেন। শ্রীমা তাঁহাকে একটি ধর্মসঙ্গীত গাহিতে বলিলেন। নিবেদিতা হাসিতে হাসিতে ইংরাজীতে একটি ধর্মসঙ্গীত গাহিয়া শ্রীমাকে শুনাইলেন। শ্রীমা গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নিবেদিতাও নির্বাক হইয়া শ্রীমার সেই জ্যোতির্ময় আত্মসমাহিত ভাব দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আর একদিন নিবেদিতা ও কৃষ্টীন শ্রীমার আদেশে খ্রীষ্টানমতে বিবাহপ্রথা বুঝাইয়া দিতে দিতে বর-কন্যা ও পুরোহিতের আচরণাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবার সময় বিবাহ-মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া বলিলেন: "সুখে-দুঃখে, সৌভাগ্যে-দারিদ্র্যে, রোগে-স্বাস্থ্যে, যতদিন না মৃত্যু আমাদিগকে পৃথক করে" ইত্যাদি! ঐ মন্ত্র শুনিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "আহা কি ধর্মীয় কথা গো।" শ্রীমা আপনাকে এমনিভাবে বিদেশী ধর্মভাব ও আচার-ব্যবহারের সহিত

মিশাইয়া ফেলিতেন যে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

একবার মিস্ ওলি বুল ছবি (ফটো) তুলিবার জন্য শ্রীমাকে একটি ষ্টুডিওতে লইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমা তাহাতে প্রথমে মোটেই সম্মত হন নাই। কিন্তু পরে ওলি বুলের একান্ত অনুরোধে তিনি রাজী হইয়াছিলেন। তবে শ্রীমার একান্ত ইচ্ছানুসারে একজন সাহেবকে (ইউরোপীয়ান ফটোগ্রাফারকে) ফটো তুলিবার জন্য আনয়ন করা হইল। সুতরাং সাহেব তাঁহার যন্ত্রপাতি (ক্যামেরা প্রভৃতি) লইয়া উপস্থিত হইলে চিরলজ্জাশীলা শ্রীমা বিদেশী ভদ্রলোক হইলেও নিঃসঙ্কোচে ছবি তুলিবার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমাকে আসনে বসাইয়া তাঁহার কেশরাশি পরিপাটি করিয়া বাঁধিয়া কাপড়ের আঁচল প্রভৃতি ভালভাবে বিন্যাস করিয়া দিলেন। ফটো তোলা হইল। আর একটি ফটো সম্ভবত শ্রীমার সহিত নিবেদিতা তুলিয়াছিলেন তাহা নিবেদিতাকে লিখিত শ্রীমার একটি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। যেমন, পত্রে শ্রীমা নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন ঃ "আমার সহিত একত্রে তোলা তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক সময় চাহিয়া দেখি, তখন মনে হয়, তুমি যেন নিকটেই রহিয়াছ।"

নিবেদিতার শিক্ষামন্দিরের ছাত্রীদের নিকট শোনা যায় যে, তিনি (নিবেদিতা) ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। তাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার নিবেদিতার সৌন্দর্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে নাকি বলিয়াছিলেন ঃ "সুন্দরী? সুন্দরী তোমরা কাকে বল জানিনা। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে

মনের বল পাওয়া যেত। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; কি ক'রে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।" আর একবার শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতাকে জাপানী মনীষী ওকাকুরার সম্বর্ধনাসভায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন: "নিবেদিতার গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা, ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।" সত্যই নিবেদিতার মধ্যে শুধু দৈহিক সৌন্দর্যেরই প্রকাশ ছিল না, ছিল তাঁহার অন্তরেও এক স্বর্গীয় সুষমার বিকাশ এবং সেই অনিন্দ্যসুন্দর সুষমার দীপ্তি প্রকাশ পাইত তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু-দুইটিতে এবং বদন-মণ্ডলেরও সর্বত্র। শ্রীমাও নিবেদিতার অন্তরের সেই সৌন্দর্য দিব্যচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন। প্রশংসাও করিতেন সেইজন্য অনেক সময়ে।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির অব্যবহিত পরে নিবেদিতা "স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি" (*The Master as I saw Him.*) গ্রন্থটি রচনা করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অবসর-সময়ে নিবেদিতা গ্রন্থটি একনিষ্ঠভাবে চারি বৎসর ধরিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল গ্রন্থটি যাহাতে তাঁহার বরেণ্য আচার্যদেবের পুণ্যজন্মদিনে প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্কল্প তাঁহার সার্থক হইয়াছিল। *The Master as I saw Him* গ্রন্থটির মুদ্রণের সর্ববিধ ব্যয়ভার সারদানন্দ মহারাজ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্পাদনা-কর্মেও তিনি নিবেদিতাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর *The Master as I saw Him*-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হইয়াছিল এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে গ্রন্থের প্রুফ দেখা আরম্ভ হয়। *The Master as I saw Him* গ্রন্থটি তাঁহার পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্যদেব স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও অন্তর-মাধুর্যের পরিচিতিমূলক বিবরণ, যাহাকে ইংরাজীতে বলিতে পারা যায়

'এ্যাপ্রিসিয়েটিভ লাইফ' বা মূল্যায়ণমূলক জীবনী। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত ঐ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য নিবেদিতার পরিশ্রমের আর অন্ত ছিল না। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে হারিকেনের আলোকের সাহায্যে তিনি প্রুফ দেখিতেন। কতদিন বা গ্রন্থের প্রুফ দেখিতে দেখিতে গভীর রাত্রি হইয়া যাইত এবং নিদ্রায় চক্ষু আবিষ্ট হইলেও প্রুফ দেখা শেষ করিয়া তবে তিনি নিদ্রা যাইতেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১লা ফেব্রুয়ারী স্বামীজীর শুভজন্মদিনে গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য তাঁহার অন্তরের একান্ত কামনা ছিল, কিন্তু প্রেসের বিলম্বের নিমিত্ত ৩১শে জানুয়ারী তাঁহার *The Master as I saw Him*-গ্রন্থ উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত হয়। নিবেদিতা বিশেষভাবে কাপড়ে বাঁধানো একটি গ্রন্থ লইয়া বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজীর পবিত্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে সোফায় স্বামী বিবেকানন্দ উপবেশন করিতেন তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর গ্রন্থটি রাখিয়া নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন। গ্রন্থ-রচনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিবেদিতার অন্তরের প্রার্থনাই ছিল যে, তাঁহার জীবনদেবতা স্বামী বিবেকানন্দ যেন দিব্যশরীরে গ্রন্থ-রচনায় তাঁহাকে সাহায্য করেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছিলেন: "গুরুর প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থখানি বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া নিবেদিতা তাঁহার গুরুর সকল ভ্রাতৃগণের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছেন।" একই সময়ে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড (ইংল্যাণ্ডের লঙম্যানস্ গ্রীন কোম্পানী) হইতে গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মিসেস্ ওলি বুল, মিস্ ম্যাকলাউড এবং নিবেদিতার অনুরাগী সকলেই গ্রন্থটি পাঠ করিয়া নিবেদিতাকে অজস্র প্রশংসা-পত্র লিখিয়াছিলেন। নিবেদিতা তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও গর্ব বা আনন্দবোধ করেন নাই, বরং প্রিয়তম আচার্যদেবের সামান্যও সেবা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন!

ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন চিন্তাশীল লেখিকা, অনন্যসাধারণ বিদুষী

ও অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী। বহু গ্রন্থই বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার *Indian Nationality, Education, Indian Studies,* প্রভৃতি গ্রন্থ[১] সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া নিবেদিতা নিজেই লিখিয়াছেন: "আমার পুস্তকগুলি সমস্তই স্বামীজীর। তিনিই আমাকে শক্তি ও প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। সুতরাং উহাদের সমগ্র আয় তাঁহার অভিলষিত নারিজাতির শিক্ষাকার্যে ব্যয়িত হইবে।" নিবেদিতার দানে স্বার্থ ছিল না, ছিল একমাত্র নিঃস্বার্থ প্রেম এবং দেশ ও দশের জন্য অফুরন্ত ভালবাসা।

সত্যই ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, স্বাধীনতা, ধর্ম ও জাতীয় জাগরণের পশ্চাতে রহিয়াছে ভগিনী নিবেদিতার প্রাণদীপ্ত কল্যাণ-ইঙ্গিত ও প্রেরণা। বিদেশাগত হইলেও ভারতবর্ষকে স্বদেশ করিয়া লইয়া তিনি অন্তরের সহিত ভারতের সকল-কিছুকে ভালবাসিয়াছিলেন। ভারতের প্রাণপুরুষকে তিনি সাধনা ও ধ্যানচিন্তার সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দেরই শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা ও জীবনাদর্শ ছিল নিবেদিতার জীবনে ধ্যান ও জ্ঞান। মনে পড়ে, গুরুগতপ্রাণা নিবেদিতা প্রিয়তম আচার্যদেবকে হারাইয়া যেদিন সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব ও অসহায় জ্ঞান করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও নিজেকে স্থির রাখিতে পারিতেছিলেন না। একবার স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: "মার্গট, মরণকে ভালবাসতে শেখ, ভয়ঙ্করের পূজা কর। দেবতা যেন বৃত্তের মত। সকল আধারেই তার কেন্দ্র, কিন্তু পরিধি কোথাও

১। বর্তমানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব-উপলক্ষ্যে (১৯৬১) তাঁহার সমগ্র রচনা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু-লিখিত 'লোকমাতা নিবেদিতা' তথ্যবহুল গ্রন্থ ভগিনী নিবেদিতার অসাধারণ জীবনকর্ম ও ঘটনার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে।

নাই। মৃত্যু আর কিছুই নয়, কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে 'স্থিতি মাত্র। জীবনে মরণ আর মরণে জীবনকে দেখতে শেখ। রুদ্রের অর্চনা কর—মার্গট।" নিবেদিতা আচার্যদেবের সেই নির্দেশ ও উপদেশবাণী জীবনে কোনদিনই ভুলেন নাই। মরণ বা মৃত্যুকে সেইদিন হইতে তিনি জীবনের পরমসহচর বলিয়া ভালবাসিয়াছিলেন।

তখন স্বামী বিবেকানন্দের অসুখের (হাঁপানি) সংবাদ নিবেদিতার মনে এক মর্মান্তিক বেদনা সৃষ্টি করিয়াছিল। তবে নিরাশার অন্ধকারে নিবেদিতা সকল সময়েই এক আশার আলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন শান্তিময়ী শ্রীসারদাদেবীর স্নেহছায়ায়। শ্রীমার স্নেহ-ভালবাসা, উপদেশ ও সান্ত্বনাবাণী ভগিনী নিবেদিতার জীবনে সহায় ও সম্বল হইয়াছিল। শ্রীমার নিকটে উপস্থিত হইতেন নিবেদিতা তাঁহার বেদনাহত প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিবার জন্য। করুণাময়ী শ্রীমা প্রথমে হয়তো দুঃখ প্রকাশ করিতেন তাঁহার আদরের সন্তান নরেন্দ্রনাথের সাময়িক অসুস্থতার জন্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সান্ত্বনা দান করিতেন নিবেদিতাকে। আসলে আপনার বেদনা দিয়া শ্রীমা নিবেদিতার অন্তরের বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তিনি কখনও কখনও অন্তরের বেদনা চাপিয়া নিবেদিতাকে বলিতেন: "ঠাকুর একবার গাঁয়ে এসে ছ'মাস কাটিয়েছিলেন। তখন তিনি অসুস্থ। আমি তখন চৌদ্দ বছরের মেয়ে। প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতাম। অভাবের মধ্যেও তাঁর স্বভাবের দ্যুতি ঠিকরে পড়ত। কী মিষ্টি ব্যবহারই না করতেন আমার সঙ্গে! বিকালবেলা আমতলায় বসে আমায় পড়তে শেখাতেন। সংসারের সব-কিছু তিনিই আমায় শিখিয়েছিলেন। তাঁর মুখ চেয়েই বেঁচে ছিলাম। কিন্তু যখন সময় হল, তিনি বললেন, 'এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে তোমায়'।"[*] এই সকল সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া শ্রীমার নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্বে নিবেদিতা শ্রীমার শান্তিময় ক্রোড়ে হয়তো মস্তক স্থাপন করিলে শ্রীমা

স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতেন ঃ "গুরুকে ভালবেসো। তোমার ভালবাসা হ'ক অফুরন্ত। সাধুপুরুষকে ভালবাসলে আত্মার নবজন্ম হয়। এই তো ভক্ত-ভগবানের ভালবাসা। শুদ্ধ ভালবাসাই আত্মার আলো। চুপ, যা বলি মুখ বুজে শোন। * * আমার গুরুকে আমি যেমন ভালবাসতাম, তুমিও স্বামীজীকে তেমনি ভালবেসো * *।" নিবেদিতা শ্রীমার ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া তখন মনে মনে বলিতেন ঃ "ভালবাসা। অন্তর দিয়া কেবল গুরুকে, দেবতাকে, বিশ্বের নরনারীকে ও বিশ্বচরাচরের সকল বস্তুকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে হইবে। ভালবাসাই ভগবান। শ্রীমাও বলিয়াছেন, ভালবাসাই ভক্ত ও ভগবানের ভালবাসা।" নিবেদিতা এই সকল কথা চিন্তা করিয়া জীবনে শান্তি লাভ করিতেন এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন।

ভারতবর্ষের কর্মে অর্থ-সংগ্রহের জন্য নিবেদিতাকে পুনরায় একবার আমেরিকা যাইতে হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার দুই তিনদিন পরেই তিনি উদ্বোধনের বাটীতে শ্রীমার পদবন্দনা করিতে গিয়াছিলেন। মিসেস ওলি বুল ঠিক সেই সময়ে দেহত্যাগ করেন। সেই দুঃসংবাদ করুণাময়ী শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইলে স্নেহের কন্যা ওলি বুলের জন্য শ্রীমা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। আচার্যদেবকে হারাইবার পর প্রিয় বান্ধবী ওলি বুলের মহাপ্রয়াণে নিবেদিতা আপনাকে আরও অসহায় মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীমার সান্ত্বনায় ও কল্যাণ-আশীর্বাদে মন কিছুটা শান্ত হইলেও নিবেদিতার অন্তরে যেন তখন হইতে প্রায়ই ধ্বনিত হইতে লাগিল—'আর সময় নাই, যাহা করিবার সত্বর করিয়া লও'। শুধু তাহাই নহে, তখন হইতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে মনে হইত ঃ "বিশ্বের বোঝা বহন করবার তুমি কে? তোমার নিজের কাজ করে যাও, অপরের কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। নিজের কাজ আগে শেষ কর।" অপরের চিন্তা না করিয়া কেবল নিজের চিন্তা ও কর্ম করিবার নির্দেশ মনকে

কেন্দ্রাভিমুখী বা আত্মাভিমুখী করিবার জন্য। 'আপন ঘরে' ফিরিয়া যাইবার চিন্তাই তখন নিবেদিতার মনকে বিশেষভাবে আবিষ্ট ও আকুল করিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের স্বাধীনতা-লাভকে তিনি জীবনের অন্যতম ব্রত ও মুক্তিমন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। সেই সময়ে বিভিন্ন কারণে নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিয়ম-নির্দেশের বাহিরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক ও ভারতের কোটি কোটি পরাধীন নরনারী স্বাধীনতার আলোকে স্নাত হইয়া সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করুক ইহাই ছিল তখন নিবেদিতার জীবনে একমাত্র আশা ও আকাঙ্খা এবং তাহারি জন্য তিনি দেশের মুক্তিসংগ্রামে কিছুদিন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের ত্যাগ, অধ্যাত্মসাধনা ও ঈশ্বরানুভূতির কথা নিবেদিতার জীবনে চিরজাগ্রত ছিল। নিবেদিতা ভুলেন নাই যে, আধ্যাত্মসাধনা ও জীবনসিদ্ধিই ভারতের মর্মকথা ও চরমরহস্য।

জীবনের শেষ কয়েকটি দিন নিবেদিতা দেবতাত্মা হিমালয়ের নির্জন ক্রোড়ে দার্জিলিঙে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করেন। চিরপরিশ্রান্ত অবসাদময় জীবনে শান্তি পাইবার জন্যই তিনি হিমালয়ের শান্তিছায়ার আশ্রয় চাহিয়াছিলেন। সুতরাং শৈলনিবাস দার্জিলিঙে যাত্রা করিবার পূর্বে নিবেদিতা একদিন আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য শ্রীমার নিকটে আগমন করেন এবং যোগীন-মাকে প্রণাম করিয়া বলেন: "যোগীন-মা, আমি বোধহয় আর ফিরব না।" যোগীন-মা নিবেদিতার মুখ হইতে অকস্মাৎ ঐ অমঙ্গলসূচক কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া বলিলেন: "এ' কি নিবেদিতা, তুমি এ'কথা বলছ কেন?" নিবেদিতা উত্তর দিলেন: "কি জানি যোগীন-মা, আমার কি রকম মনে হচ্ছে, এই বোধহয় শেষ।" কথাগুলি উদাসভাবে বলিতে বলিতে নিবেদিতা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিবেদিতার তখন মনে হইতে লাগিল

তাহার আচার্যদেবের বাণী : "মার্গট, 'চরৈবেতি' * * সকল সময়ে মনে রেখ। একদিন পরাশান্তি আর অতিমুক্তির অধিকারী হবে তুমি, আর ভারতের সাধনা হবে জয়যুক্ত।" আচার্যদেবের ঐ আশীর্বাণীর উত্তরে নিবেদিতার বেদনাহত মন বলিয়া উঠিল : "স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য মায়ের পূজায় শক্তি অর্জন করতে হয়েছে আমায়। কিন্তু এমন কোন শাশ্বত মুহূর্ত এ'জীবনে আসবে এবং সেদিন তাঁর ইচ্ছায় ঘটবে অবসান।......এবার সব ছেড়ে দিয়ে আরাধনা করছি মহেশ্বরের, ভালবাসছি শুধু তাঁকেই।"

নিবেদিতা জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখিতেছেন! অতীতের কত-কিছু ঘটনার কথা উদিত হইয়া নিবেদিতার অন্তরে যেন তখন উত্তাল এক তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছিল। দার্জিলিঙে যাত্রা করিবার পূর্বে যে শ্রীমার আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য উপনীত হইয়াছেন নিবেদিতা তাহা বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমাও নিবেদিতার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য আপনার অতীত জীবনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিবেদিতাকে বলিলেন : "আমার তখন কুড়ি বছর বয়স। ঠাকুর একদিন ডেকে পাঠালেন। ভরা বসন্ত তখন। বল্লেন, বাগানে একটি ছোট ঘর আছে। ওখানে গিয়ে থাকতে হবে। ধ্যান আর জপ করবে। একদিন বন্ধ দুয়ার খুলে যাবে, 'মা' বলে অনেকে ভীড় করবে তোমার চারপাশে।" নিবেদিতা শ্রীমার অন্তরের গোপন অভিপ্রায় বুঝিয়া আত্মসংবরণ করিলেন। শ্রীমার কথায় তিনি অন্তরে পরমশান্তি লাভ করিলেন এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ও শ্রীমার কল্যাণ-আশীর্বাদ লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নিবেদিতা দার্জিলিঙে যাত্রা করিলেন। দার্জিলিঙে অবস্থানের সময়ে অকস্মাৎ একদিন নিবেদিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি অনুভব করিলেন যেন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে তিনি বাস করিতেছেন এবং পার্থিব জগতের সকল-কিছু সম্পর্ক ও বন্ধন তাঁহার সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রিয়তম আচার্যদেব স্বামী বিবেকানন্দের

আশীর্বাণীর কথা তখন নিবেদিতার মনে হইতে লাগিল। স্বামীজী প্রায়ই তাঁহাকে বলিতেন : "শরীর আসে যায়—বিনাশী, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর।" ইহা গীতার সেই শাশ্বত বাণী : "অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য * *" (২।১৮)। নিবেদিতা গীতার ও স্বামীজীর মহান্ সত্যের বাণীকে তাঁহার জীবনের স্মৃতিফলকে সর্বদা জাগ্রত রাখিয়াছিলেন। নিবেদিতা জীবনে অপার এক আনন্দ ও শান্তি তখন উপলব্ধি করিতেন এবং সেই উপলব্ধিকে তিনি 'মৃত্যু' ও 'প্রিয়তম' নাম দিয়াছিলেন। ঐ উপলব্ধি-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন : "কাল রাত্রে মনে হইল, এই সমগ্র জড়জগতের সহিত সংমিশ্রিত ও ইহার অন্তরে ওতঃপ্রোত হয়ত আর একটি সত্তা বিদ্যমান—উহাকে গভীর ধ্যান, চিত্ত বা যাহা ইচ্ছা বলিতে পার,—সম্ভবতঃ উহাই মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ। ইহাকে স্থানান্তরে গমন বলা চলে না, কারণ এই সত্তা জড় নহে, সুতরাং ইহার দেশরূপ আধার থাকিতে পারে না। দেহবুদ্ধির কল্পনা হইতে ক্রমশ অধিকতর বিমুক্ত হইয়া সেই সত্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে মগ্ন হইয়া যাওয়া,—ইহাই মৃত্যু। সুতরাং পরলোকগত স্বজনবর্গ আমাদের স্থূলদেহেরই সন্নিকটে রহিয়াছেন বলা যাইতে পারে, যদি তাহাদের সম্বন্ধে এই চিন্তা আমাদের সান্ত্বনা দান করে। অথচ এই সংস্পর্শ থাকা সত্ত্বেও তাহারা বিরাটের সহিত এক এবং চরমমুক্তি ও আনন্দের সহিত অভিন্ন।" ঐ প্রিয়তম মৃত্যুর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করিয়া তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেন : "ভাবিয়া দেখিলাম, অসীম যেন এইরূপে মিলিত হইয়াছে সসীমের সহিত, আর আমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সীমারেখার উপর দণ্ডায়মান। উভয়ের উপর অধিকার স্থাপন—সীমার মধ্যে অসীমের মধ্যে অসীমের উপলব্ধি—ইহাই আমাদের প্রতি নির্দেশ। আমি ক্রমশ অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, মৃত্যুর অর্থ কেবল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাওয়া,—উপলখণ্ডের নিজ সত্তার কূপমধ্যে (অতলপ্রদেশে) নিমজ্জন। মৃত্যুর পূর্বে শান্ত দীর্ঘ প্রহর-

গুলির মধ্যেই এই অবস্থার সূচনা—মন যখন তাহার জীবনের বিশিষ্ট ভাবটি লইয়া নাড়াচাড়া করে, যে ভাবটিতে ইহার সকল চিন্তা, কর্ম ও অভিজ্ঞতা পর্যবসিত। এই প্রহরগুলিতে ইতিমধ্যেই জীবাত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। "আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি, কাহারও সমগ্র প্রেম ও মৈত্রীভাবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব কিনা, যেখানে বিরুদ্ধ ভাবের একটি তরঙ্গও উঠিবে না, যাহাতে সেই অন্তিম সময়ে সে এক বিরাট ধারণায় চিরসমাহিত হইয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে সে অন্ততঃ অনন্তের ক্রোড়ে স্বার্থচিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং বিশ্বের সমগ্র অভাব ও দুঃখকে ধারণ করিয়া নিজেকে এক শান্তিময় ও শিবময় জাগ্রত আর্বিভাবরূপে অনুভব করিতে পারিবে।"

ঐ "প্রিয়তম" রচনাটির গোপন বা অন্তর্নিহিত ভাব ও ভাষাকে বাহিরে ব্যক্ত করিয়া তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেনঃ "আমি যেন সর্বদাই স্মরণ রাখি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ। আমার প্রিয়তমই অতিপ্রিয়, শুধু তিনি এই বাতায়নের মধ্য দিয়া চাহিয়া আছেন, শুধু এই দ্বারে করাঘাত করিতেছেন। প্রিয়তমের কোন অভাব নাই, তথাপি তিনি মানুষের অভাবের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসেন, যাহাতে আমি তাঁহার সেবার সুযোগ পাই। তাঁহার ক্ষুধা নাই, তথাপি প্রার্থী হইয়া আসেন, যাহাতে তাঁহাকে দিতে পারি। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, যাহাতে আমি রুদ্ধদ্বার খুলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারি। তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন, শুধু যাহাতে আমি তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে পারি। তিনি ভিক্ষুকের বেশে আসেন, যাহাতে আমি দান করিতে পারি। প্রিয়তম, হে প্রিয়তম, আমার যাহা-কিছু সবই তোমার। হ্যাঁ, আমি একান্তভাবে তোমারই। আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া তুমি সেইখানে আসিয়া দাঁড়াও।"

এখানে মনে পড়ে, দার্জিলিঙে যাত্রা করিবার কয়েকদিন পূর্বে

নিবেদিতা কতকগুলি বৌদ্ধ প্রার্থনাবাণী ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং কয়েকজনের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন: "Let all things that breathe, without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely, each in his own path! In the East and in the West, in the South, let all beings that are without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining chearfulness, move forward freely, each in his own path."

জীবনের শেষ কয়দিন ভগিনী নিবেদিতা সর্বদাই গভীর ধ্যানে সমাহিত হইয়া থাকিতেন। দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য, চিরতুহিনাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার ভাবগম্ভীর অপরূপ দৃশ্য, স্বচ্ছন্দবিহারী মেঘমালা ও কুয়াশার রহস্যময়ী খেলা, বিচিত্র গন্ধের ও রঙের পুষ্পরাশির সমরোহ নিবেদিতার ধ্যানসমাহিত মনকে সর্বদাই আত্মভোলা করিয়া রাখিত। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর সহধর্মিণী লেডী অবলা বসুর একান্ত যত্ন ও স্নেহ-ভালবাসা এবং তাঁহাদিগের প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য-পরিশোভিত গৃহের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ নিবেদিতার অন্তরে এক অপার্থিব ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন বিশেষভাবে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করিলেও নিবেদিতা অভ্যাসবশতঃ শ্রীগুরুপ্রদত্ত মালা সর্বদাই জপ করিতেন। কিন্তু শেষের দিকে যখন একান্তভাবে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন চেষ্টা করিলেও আর জপমালা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। নিবেদিতার পক্ষে মর্ত্যের সকল স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরবিদায় লইবার যেন চরমমূহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার মস্তক তখন লেডী অবলা বসুর ক্রোড়ে ন্যস্ত। নিবেদিতা অবলা বসুকে তাঁহার বরেণ্য আচার্যদেবের প্রিয় প্রতিকৃতিটি চক্ষের সম্মুখে ধরিতে অনুরোধ

করিলেন। লেডি অবলা বসু স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিলে নিবেদিতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার আচার্যদেবের উদ্দেশ্যে শেষপ্রণাম জানাইলেন। তাহার পর তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় রুদ্রস্তুতিটি অতি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি।

অর্থাৎ 'অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া চল, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া চল, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম আমার নিকটে জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভূত হউন।' উপনিষদের এই মন্ত্র বা শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে নিবেদিতার মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন: 'The boat is sinking. But I shall see the sunrise,'—'তরণী ডুব্ছে, কিন্তু আমি সূর্যোদয় অবলোকন করব'। নিবেদিতা ধ্যাননেত্রে তাঁহার প্রিয়তম আচার্যদেব স্বামী বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত মূর্তি দর্শন করিতে করিতে অনুভব করিলেন যেন স্মিতহাস্যে আচার্যদেব (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁহার স্নেহের মানস-কন্যাকে বরাভয়হস্তে আশীর্বাদ করিতেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন জ্যোতির্ময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এবং স্নেহ-করুণাময়ী জননী শ্রীসারদাদেবীকে। অনুভব করিলেন, তাঁহাদিগের স্নেহের কন্যাকে অভয় দান করিয়া তাঁহারা আশীর্বাদ করিতেছেন। ক্রমশ জ্যোতির্ময় আলোকমালা নিবেদিতার চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। নিবেদিতা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার শাশ্বত আত্মা চিরশান্তিময় শ্রীরামকৃষ্ণব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া গেল।

ভগিনী নিবেদিতার দেহাবসানের মর্মন্তুদ সংবাদ শ্রীমার কর্ণে উপস্থিত হইল। শ্রীমা নিবেদিতার জন্য একান্তভাবে অধীর হইয়া পড়িলেন। সিষ্টার কৃষ্টিনও সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। অথচ

বেদনাহত সিষ্টার কৃষ্টিনকে শ্রীমা তখন মর্মবেদনা লইয়াও সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন: "তুটিতে একসঙ্গে ছিলে, এখন একলা থাকতে কত কষ্ট হবে। আমাদেরই তাঁর জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার তো আরও বেশী হবে—মা। কি লোকই ছিল। তার জন্য আজ কত লোক কাঁদছে।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে করুণাময়ী শ্রীমা নিবেদিতার জন্য পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া বলিলেন: "যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা)।" সর্বমায়ানির্মুক্তা মহাজ্ঞানরূপিণী শ্রীমার নিবেদিতার জন্য অধৈর্য, আকুলতা ও মর্মবেদনা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেও চিন্তার বিষয়। লীলার জন্যই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী আপনাকে মহামায়া-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, লীলার অবসানে পুনরায় নিত্যে তাঁহার আপন স্বরূপে স্থিতি। তখন তুঃখ নাই, শোক নাই, ধূলি-কালিমাময় পৃথিবীর আকর্ষণ ও বেদনা নাই, কিন্তু লীলার জন্য যোগমায়া বিশ্বের সকল-কিছু লইয়াই—সকল-কিছু সুখ ও তুঃখ—মুক্তি ও বন্ধন—আনন্দ ও বেদনা লইয়া খেলা করেন। খেলায় বা লীলার মধ্যেও তাঁহার যেরূপ আনন্দ, স্বরূপে বা নিত্যেও সেরূপ আনন্দ। চির-আনন্দময়ী মা সারদাদেবী তাই বিবেকানন্দের মানস-কন্যা শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চির-আদরের নিবেদিতার দেহাবসানের সংবাদ পাইয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অশ্রু তাঁহার পার্থিব ও অপার্থিব উভয় প্রেম-ভালবাসারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও গৌরী মা ॥

সন্ন্যাসিনী গৌরী-মা বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ তেজস্বিনী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। একবার স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো হইতে পত্রে লিখিয়াছিলেন: "গৌরী-মা কোথায়? এক হাজার গৌরী-মা দরকার—ঐ noble strring spirit (মহতী ও চেতনাদায়িনী শক্তি)।"

গৌরী-মা শুনিয়াছিলেন যে, বেলুড় মঠে নাকি স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশাধিকার নাই। সেই কথা শোনা অবধি গৌরী-মা মঠের ভিতরে যাইতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের কর্ণে যখন সেই সংবাদ উপস্থিত হইল তখন তিনি ছুটিয়া গিয়া গৌরী-মাকে বলিলেন: "একি ব্যাপার? ওঠ, মঠে চল শিগ্‌গির। তুমি কি মেয়ে মানুষ? তুমি যে আমাদের মা।" এই কথা বলিয়া স্বামীজী গৌরী-মাকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন।

গৌরী-মা যে সময়ে বাগবাজারে বোসপাড়ায় বলরামবাবুর বাটীতে অতিবাহিত করিতেন তখন বলরামবাবু একদিন গৌরী-মাকে বলিয়াছিলেন: "দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বরকল্প। প্রেমোন্মত্ত একজন সন্ন্যাসী সেখানে আছেন, তাঁকে দর্শন করে এসো।" গৌরী-মা তাহাতে বলিয়াছিলেন: "জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে দাদা, নূতন কোন সাধুদর্শনের আর সাধ আমার নেই। তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান,—তার আগে যাচ্ছিনে।" কিন্তু তাহার পর হইতেই গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরের প্রতি দিবারাত্রি এক প্রবল আকর্ষণ হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই আকর্ষণ ক্রমে তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। বলরামবাবু গৌরী-মার সেই অবস্থা

দেখিয়া পুনরায় একদিন ডাকিয়া বলিলেন ঃ "দিদি, দক্ষিণেশ্বরের সেই মহাপুরুষের কাছে যাবে?" গৌরী-মা সেইবার বলরামবাবুর কথা আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রেমোন্মত্ত ঈশ্বরপাগল সাধুকে দর্শন করিতে যাইতে সম্মত হইলেন। সুতরাং বলরামবাবু একদিন তাঁহার স্ত্রী, দুইজন মহিলা ও গৌর-মাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঘরে বসিয়া আপন মনে সূতা জড়াইতেছেন ও মধুরকণ্ঠে গান করিতেছেন,

যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি,
সে-রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি শ্যামা?
একবার নাচগো শ্যামা?" ইত্যাদি

বলরামবাবু-প্রমুখ ভক্তগণ গৃহে প্রবেশ করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সূতা জড়ানো শেষ হইল। তিনি বলরামবাবুর নিকট নবাগত গৌরী-মার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলরামবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমস্তই নিবেদন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত আনন্দিত, যেন আত্মভোলা সদানন্দময় পুরুষ। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গের আলোচনা করিলেন এবং বিদায়কালে গৌরী-মার দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ "আবার এসো মা।" গৌরী-মা হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সস্নেহ আহ্বানে উত্তর দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, আসবো।"

ইহার পর হইতে গৌরী-মা একাকীই দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন। একদিন গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন ঃ "তোর কথাই ভাবছিলুম।" বিভিন্ন কথার পর গৌরী-মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অত্যন্ত আপনার জন ভাবিয়া 'তুমি' সম্বোধন করিয়া উত্তর দিলেন ঃ "তুমি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, আগে তো তা বুঝতে পারি নি—বাবা।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব একগাল হাসিয়া বলিলেন ঃ "তাহলে আর এত সাধন-ভজন কি করে হত?"

কিছুক্ষণ পরে গৌরী-মাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর নহবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেনঃ "ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।" ইহার পর হইতে গৌরী-মা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীসারদাদেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পূর্ণ-অবতার জ্ঞান করিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা করিতেন। বিশেষ করিয়া শ্রীমার প্রতি গৌরী-মার একান্ত আকর্ষণ ও গভীর ভালবাসা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন কৌতুকচ্ছলে গৌরী-মাকে বলিলেনঃ "তুই কা'কে বেশী বেশী ভালবাসিস্?" তাহাতে গৌরী-মা গান গাহিয়া প্রশ্নের উত্তর দিলেন,

'রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী,
লোকের বিপদ হ'লে
ডাকে মধুসূদন ব'লে,
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী।'

গৌরী-মার কণ্ঠে সুমিষ্ট গান শুনিয়া শ্রীমা লজ্জিত হইলেন এবং কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া গৌরী-মার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তখন ভাবে ঢলঢল এবং পরাজিত হইয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেইস্থান ত্যাগ করিলেন। এই তত্ত্বময়ী লীলার ও প্রেমের খেলার রহস্য সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে। যুগে যুগে অবতারলীলায় এই রহস্যময় খেলাই সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে। আউল ও বাউলের দল অবতারপুরুষদিগের সঙ্গে আগমন করেন এবং প্রেমের খেলা খেলিয়া আবার চলিয়া যান। এই লীলা ও নিত্যের খেলাই অহরহঃ চলিতেছে এবং অনন্তের বুকে সর্বদা চলিতে থাকিবে।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসারদাদেবীর সহিত গৌরী-মার অপূর্ব ও অবর্ণনীয় এক মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল।

একদিকে গৌরী-মা যেমন শ্রীসারদাদেবীকে জগজ্জননী-রূপে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, অপরদিকে তেমনি কখনও কখনও শ্রীমার সহিত স্নেহের মাতাপুত্রী, কখনও সঙ্গিনী, আবার কখনও বা প্রিয়সখীর সম্পর্ক পাতাইয়া গৌরী-মা এমন কি হাস্য-পরিহাসও করিতেন। ক্রমে গৌরী-মা শ্রীসারদাদেবীকে তাঁহার জীবনের পরমাশ্রয় ও পথপ্রদর্শিকা-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য কোনদিন কখনও কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে গৌরী-মা প্রথমেই শ্রীমাকে তাহা নিবেদন করিতেন এবং শ্রীমার নির্দেশ ও পরামর্শকে বেদবাক্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া কর্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতেন। শ্রীসারদাদেবীও গৌরী-মাকে আপনার স্নেহের কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সকল অবস্থায় সকল রকমভাবে গৌরী-মাকে উপদেশ দানে সাহায্য করিতেন।

গৌরী-মার মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা ছিল এবং শ্রীমা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একদিন ঐ প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমা গৌরী-মাকে বলিয়াছিলেনঃ "যে বড় হয়, সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরীদাসী।" আবার গৌরী-মাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমা কখনও কখনও বলিতেনঃ "মেয়েদের তো সন্ন্যাস নেই। গৌরীদাসী কি মেয়ে? ও তো পুরুষ। ওর মত কটা পুরুষ আছে? এই স্কুল, গাড়ী, ঘোড়া সব করে ফেললে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনও মেয়ে নয়—সে তো পুরুষ'।" শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও একদিন গৌরী-মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।" গৌরী-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেনঃ "এখানে কাদা কোথায় যে মাখ্‌ব? সবই যে কাঁকর।" শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে হাসিয়া বলিয়াছিলেনঃ "আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" গৌরী-মা সাধন-ভজন ও নির্জনতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গ লইয়া তিনি

শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন বলিয়াছিলেন: "সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না; হৈ হৈ আমার ধাতে সয় না। আমার সঙ্গে কতকগুলি মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি।" সেই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গৌরী-মাকে বলিয়াছিলেন: "না গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধন-ভজন ঢের হয়েছে, এবার এ' জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট।" গৌরী-মা আর তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা অমান্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের যদি ইচ্ছা ও নির্দেশ হয়, তবে ভবিষ্যতে সেই ব্রত তিনি জীবনে গ্রহণ করিবেন। সত্যই ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পরে গৌরী-মা শ্রীমার অনুমতি লইয়া কলিকাতার নিকট গঙ্গাতীরে শিশুকন্যাদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা ও সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গৌরী-মার সেই আশ্রমের নামকরণ হইয়াছিল 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের ইচ্ছায় ও অনুরোধে শ্রীমা একবার দক্ষিণ-ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানের মহিলা-ভক্তগণ শ্রীমাকে যখন বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তখন শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "আমি লেকচার দিতে জানি না, যদি গৌরীদাসী আসত, তবে দিত।" গৌরী-মার প্রতিভার কথা শ্রীমা পূর্ব হইতেই জানিতেন এবং সেজন্যই শ্রীমা বলিয়াছিলেন: "যদি গৌরীদাসী আসত, তবে দিত।" তাহাছাড়া গৌরী-মার তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার কথাও শ্রীমা বিশেষভাবে জানিতেন এবং সেইজন্য একবার তিনি গৌরী-মাকে বলিয়াছিলেন: "তোমার ভয়ে সব ঠিক থাকে—মা।" সত্যই গৌরী-মার তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য শ্রীমার নিকট যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা গৌরী-মাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতেন।

একবার বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীমার সহিত গৌরী-মা একসঙ্গে ছিলেন। সেই সময়ে গৌরী-মাকে একদিন একটি বৃশ্চিক দংশন করে ও শ্রীমা ব্যাকুল হইয়া সারারাত্রি জাগিয়া গৌরী-মার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কন্যার অসহ্য বেদনায় দয়াময়ী শ্রীমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল।

এই ধরনের ঘটনা অবশ্য বহুবারই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যেমন, একবার শ্রীমা যখন উদ্বোধনের বাটীতে ছিলেন তখন শ্রীশ্রীশারদীয়া-পূজার অনুষ্ঠান চলিতেছিল ও পল্লীতে পল্লীতে নরনারীদিগের মধ্যে আনন্দের হাট বসিয়াছিল। গৌরী-মা সেই সময়ে শ্রীমাকে সাক্ষাৎ দেবী দুর্গা জ্ঞান করিয়া শ্রীমার সম্মুখে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করিয়াছিলেন। মহানবমীতিথি সমাগত হইলে গৌরী-মা বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীর চরণযুগলে রক্তচন্দনসিক্ত অষ্টোত্তরশত রক্তপদ্ম অঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। শ্রীমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবার সময় গৌরী-মা বলিয়াছিলেনঃ "মা, আজ আমার চণ্ডীপাঠের ব্রত উদ্‌যাপিত হল সর্বার্থসাধিকে শ্রীশ্রীচণ্ডীর সামনে চণ্ডীপাঠ করে। এর পরও পাঠ করবো তুমি যখন যেমন করাবে।" গৌরী-মা যখন চণ্ডীপাঠের শেষে রক্তচন্দনমিশ্রিত পুষ্পাঞ্জলি শ্রীমার চরণযুগলে অর্পণ করিতেছিলেন তখন শ্রীমাকে যাহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন শ্রীমা সমাধিস্থা এবং শ্রীমার সর্বশরীর হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিচ্ছটা যেন চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। অপরূপ সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দেবীমূর্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়বিহ্বল হইয়া 'মা মা' ধ্বনিতে চতুর্দিক পূর্ণ করিতেছিল। দেবদুর্লভ সেই দৃশ্য। গৌরী-মা ও সকলে শ্রীমার সেই দিব্যরূপ দর্শন করিয়া সেইদিন ধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রীসারদাদেবীর বিশেষ আগ্রহে গৌরী-মা মহিলাদিগের আশ্রমের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং মহাসরস্বতীরূপিণী জ্ঞানদায়িনী শ্রীমার দ্বারাই সেই আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নূতন আশ্রমের জমিতে যখন পদার্পণ করেন তখন

শ্রীমা আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন: "খাসা জমি, বেশ বাড়ী হবে। মেয়েরা সুখে থাকবে।" সেই সময়ে আনন্দে অধীরা গৌরী-মা শ্রীমাকে মিষ্টিমুখ করাইয়া বলিয়াছিলেন: "এই তো আশ্রমের বাস্তুপূজা আর দেবীর অধিবাস হয়ে গেল।" জগজ্জননী করুণাময়ী শ্রীমার পবিত্র আশীর্বাদসিক্ত সেই আশ্রম ক্রমশই বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং বিভিন্ন স্থান হইতে কুমারী-কন্যারা আসিয়া সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। শিক্ষা, সাধনা, জপ-ধ্যান ও দেশহিতকর্মব্রতে কন্যারা আত্মনিয়োগ করিল। কিছুদিন পরে সেই আশ্রমের সেবিকাগণের একনিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও কর্মে কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া একান্ত দৃঢ়তার সহিত গৌরী-মা বলিয়াছিলেন: "মা ঠাক্‌রুণের কৃপায় আশ্রমের কাজ ভালই চলবে।" কেননা গৌরী-মা মনে-প্রাণে জানিতেন যে, শক্তিরূপিণী শ্রীমার অফুরন্ত করুণা ঐ আশ্রমের উপর রহিয়াছে। সেইজন্য গৌরী-মা প্রায়ই বলিতেন: "মা ব্রহ্মময়ী যখন আশ্রমের জন্য ভাবছেন, তখন আর ভাবনা কি?" শ্রীমাও আশ্রমের ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হইবে বলিয়া গৌরী-মাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। শ্রীমা পরে এই সম্পর্কে বলিয়াছিলেন: "গৌরীদাসীর আশ্রমের সল্‌তেটি পর্যন্ত সে উস্‌কে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।" পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রতিটি কর্মে ও ব্যাপারে গৌরী-মা বিশ্বরূপিণী মা সারদার সহিত পরামর্শ করিতেন এবং সর্বক্ষেত্রে সকল বিষয়েই শ্রীমার অমোঘ আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তবে অগ্রসর হইতেন এবং সিদ্ধির সার্থকতা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। একদিন কলিকাতায় গোয়াবাগানের আশ্রমে সন্ধ্যাবেলায় একজন মহিলা আসিয়াছেন। মহিলাটির মধ্যে কোনরকম আড়ম্বর বা ঐশ্বর্যের লেশ-মাত্র ছিল না। পরিধানে সাদাসিধা একখানি শাড়ী, হাতে দুইগাছি শাঁখা ও সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুররেখা। তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন: "শ্রীশ্রীমা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি

বলেছেন, 'আমার এক মেয়ে আছে, নাম গৌরীপুরী। গোয়াবাগানে তাঁর আশ্রম, তুমি সেখানে যেও মা। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণে শান্তি পাবে।" এই মহিলার সুমিষ্ট ব্যবহারে আশ্রমবাসিনীরা সকলেই যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একজন ঐ অপরিচিতা মহিলাকে তাঁহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেই মহিলার নাম সরোজবালা দেবী, আসাম-গৌরীপুরে নিবাস। মহিলা বলিলেন: "এই ঠিকানা লিখলেই আর কোন গোল হবে না।" কথাগুলি বলিতে বলিতে মহিলার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। আশ্রমবাসিনীরা তখন একটু ভয়ে ও সসম্ভ্রমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "তবে কি আপনি রাণী?" নিতান্ত লজ্জা ও কুণ্ঠার সহিত মহিলা উত্তর দিলেন: "দিদি, আমি কেউ নই, সামান্য রমণী মাত্র। আপনাদের পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হতে এসেছি।" সত্যই সেই মহিলা আসাম-গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবী। রাণী-মা অতিশয় উন্নত চরিত্রের রমণী ছিলেন। দয়া ও দানশীলতার জন্য তাঁহার প্রজারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। সেই ধর্মপ্রাণা রাণী-মার প্রদত্ত অর্থের দ্বারাই 'শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শোনা যায়, রাণী সরোজবালা যখন কলিকাতায় আসিতেন তখনই গৌরী-মার নিকট উপনীত হইয়া সাধন-ভজনের উপদেশ লইতেন। গৌরী-মাও রাণী-মাকে একান্তভাবে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। রাণী-মা আসিয়া দেখিতেন, গৌরী-মা শ্রীসারদাদেবীর ভাবে একেবারে অনুপ্রাণিত। গৌরী-মা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, আশ্রমের অধিশ্বরী দেবী অন্নপূর্ণারূপে তাঁহাদিগকে অন্ন দান করিতেছেন এবং সেই সিদ্ধিদায়িনী অধিশ্বরী দেবীই শ্রীসারদাদেবী-রূপে সকলকে জ্ঞান ও অভয় দান করিতেছেন এবং তিনিই জগদ্ধাত্রী-রূপে সর্ববিঘ্ন হইতে আশ্রমকে ও আশ্রমবাসিনীদের সর্ববিধভাবে রক্ষা করিতেছেন।

একবার শ্রীসারদাদেবী যখন জয়রামবাটীতে ছিলেন তখন

শ্রীগৌরী-মা

শ্রীগোপালের-মা

কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে জয়রামবাটীর অনেকেরই মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, মাতাঠাকুরাণীর প্রভাবে দেশের ছেলেরা বোধহয় সকলেই সাধু-সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। শোনা যায়, এমন-কি সেইজন্য শ্রীমার অভিভাবকরাও সরলস্বভাবা শ্রীমাকে সামাজিক শাসনের ভয় পর্যন্ত দেখাইয়াছিলেন। একদিন সেইজন্য শ্রীমা গৌরী-মাকে দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন: "দেখ মা, এখানকার কেউ কেউ বলে কিনা, ছেলেদের আমি সব সাধু-সন্নিাসী করে দিচ্ছি; অজাতকে মন্তর দিচ্ছি। আমার কাছে এলে না কি লোকেদের জাত যাবে।" শ্রীমার মুখে সেই কথা শুনিয়া গৌরী-মা বলিয়াছিলেন: "তোমার কাছে সন্ন্যাস পাওয়া তো মহাভাগ্যের কথা—মা। কটা লোক সাধু-সন্ন্যাসী হতে পারে? আর জাতফাতের যিনি মালিক, তাঁর কাছে এলে জাত যাবে, কে বলে এমন কথা? আচ্ছা দেখছি আমি।" এই বলিয়া শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সেইদিনই গৌরী-মা সমাজপতিদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে গমন করলেন। ঐ অঞ্চলে কোয়ালপাড়া একটি গ্রাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া গৌরী-মা ঐ অঞ্চলের প্রধানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসিনী মাতার আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিলেন এবং গৌরী-মার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৌরী-মা তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীঠাকুরাণীর মহিমার কথা অগ্নিময়ী ভাষায় আলোচনা করিলেন। দীক্ষিতদিগের মধ্যে যাহারা বিবাহিত, তাহাদিগের পক্ষে যে সস্ত্রীক যাইয়া গুরুমাতার চরণবন্দনা করা অবশ্য-কর্তব্য, একথাও গৌরী-মা গ্রামের প্রধানদিগকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া গৌরী-মা বলিলেন: "তোমাদের মধ্যে কারা এমন কথা প্রচার করছ যে, মা-ঠাকৃরুণের কাছে গেলে জাত যাবে? এত বড় স্পর্দ্ধার কথা বলে তোমরাই ধর্মের কাছে অপরাধী হচ্ছ। নিজের দেশের লোক বলে তোমরা তাঁহার স্বরূপ চিনতে পারছ না। তিনি

সামান্যা নারী নন। তিনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী। জগতের কল্যাণে নারীদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যা করছেন, তোমাদের সমাজের কল্যাণের জন্যই করছেন।" তেজোদীপ্তা সন্ন্যাসিনী গৌরী-মার অগ্নিগর্ভ বাণী শুনিয়া সমাজপতিরা সকলেই নির্বাক ও হতভম্ব হইলেন। তাঁহাদিগের কয়েকজন গৌরী-মার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিলেন: "মা, আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা মা-ঠাকৃরুণকে সত্যিই বুঝতে পারিনি। কাল সকালে তাঁর চরণে উপস্থিত হয়ে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" মহাশক্তিরূপিণী শ্রীমা সারদারই পরিশেষে সর্বপ্রকারে জয় লাভ হইল!

আর একদিন গৌরী-মা ভক্তগণের আহ্বানে গ্রামে গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী প্রচার করিয়া আসিলেন। তাঁহার উৎসাহবাণীতে চতুর্দিকে এক নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার পর হইতে পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী পল্লী হইতে দলে দলে নরনারীরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনে জয়রামবাটীতে আসিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন: "গৌরী যে ঠাকুরের কথায় এদেশ ভাসিয়ে দিলে।" সত্যই গৌরী-মার মত তেজস্বিনী ও তপস্বিনী রমনীর পক্ষেই শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার্থিব আদর্শ ও ভাবধারাকে জয়রামবাটী প্রভৃতির মতো অনুন্নত পল্লীগ্রামে প্রচার করা সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণও গৌরী-মার অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার যখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন গৌরী-মা তাঁহার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্ববিজয়ী সন্তান পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিয়াছেন ইহাতে গৌরী-মার গৌরব ও আনন্দের পরিসীমা ছিল না। বহুদিন পরে স্বামীজীর সহিত গৌরী-মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বামীজী কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া গৌরী-

মাকে বিদেশের বহু গল্প করিয়া শুনাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ গৌরী-মাকে বলিয়াছিলেনঃ "আমি কিন্তু ওদের কাছে তোমার কথা বলে এসেছি। তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাব—আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়ে জন্মায়।" স্বামীজীর ইহাই ছিল লক্ষ্য যে, শুধু শাস্ত্রবিচার ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা নয়, পরন্তু সত্যকারের প্রাণদীপ্ত সচল জীবনের নিদর্শন ভোগসর্বস্বজীবন পাশ্চাত্য নরনারীর সম্মুখে উপস্থাপন করিতে হইবে। তাহারি জন্য স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ-প্রমুখ মহাত্যাগী গুরুভ্রাতাগণ সুদূর ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ও মহাপুরুষদিগের জীবন-সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলেও বেদান্তের চলমান বিগ্রহ স্বামী তুরীয়ানন্দকে তিনি আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিলেন ভারতের ত্যাগ-তপস্যার জীবনকে চাক্ষুষভাবে পাশ্চাত্যবাসীকে দেখাইবার জন্য। ভারতের তপস্যাময় নারীজীবন পাশ্চাত্যবাসী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক এই বাসনাও লুক্কায়িত ছিল স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরে এবং সেইজন্য তপস্বিনী গৌরী-মাকে তিনি বলিয়াছিলেনঃ 'গৌরী-মা, তোমায় নিয়ে দেখাব—আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়ে জন্মায় দেখাবার জন্য।"

গৌরী-মা স্বামী বিবেকানন্দেকে তাঁহার বারাকপুরের আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন এবং আশ্রম দেখিয়া তিনি আনন্দে প্রাণভরিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। স্বামীজী গৌরী-মার আশ্রম-সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেনঃ "হুড় হুড় করে টাকা আসা উচিত ছিল। গৌরী-মাকে বললুম, চল আমার সঙ্গে আমেরিকায়। ওরাও বুঝতো আমাদের দেশেও কেমন মেয়ে জন্মায়। একবার ঘুরে এলে টাকার কত সুবিধে হতো!"

একদিন স্বামী বিবেকানন্দ গৌরী-মার ভবিষ্যৎজীবন ও ব্রত অনুধাবন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই মতো বলিয়াছিলেনঃ "গৌরী-মার ভিতরটা পুরুষ ও বাহিরটা স্ত্রীলোক। একদিকে গৌরী-মার যেমন

গম্ভীর, রাশভারী ও প্রত্যক্ষ রুদ্রানীর মূর্তি, অপরদিকে তেমনি স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি ও স্নেহ-মন্দাকিনীর প্রস্রবণ।" প্রথম হইতেই স্বামীজী গৌরী-মার ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টিপ্রতিভার বিষয় অবগত ছিলেন এবং সেজন্যই গৌরী-মাকে তিনি বিশেষভাবে উচ্চস্থান দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া একদিন গৌরী-মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার উদ্দেশ্যে কতকগুলি দ্রব্য-সামগ্রী এবং গৌরী-মার জন্য কয়েকখানি কাপড় সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গৌরী-মা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের স্নেহ-ভালবাসার উপহার পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া স্নেহপূর্ণ-অন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াইয়াছিলেন। গৌরী-মার আশ্রমের কন্যারা সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে শুনিয়া এবং তাহাদের প্রস্তুত কাপড়, তোয়ালে প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য দেখিয়া অভেদানন্দ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। আশ্রম-কন্যাদিগের হস্তনির্মিত একটি কোট বা জামা ঐদিন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে গৌরী-মা উপহার দিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেই উপহার পাইয়া গৌরী-মাকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

তপস্বিনী গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে নির্দেশ লাভ করিয়াই বৃন্দাবনধামে তপস্যা করিতে গমন করিয়াছিলেন। শোনা যায়, লীলাসংবরণের কয়েকদিন পূর্বে গৌরী-মাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেনঃ "এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না। আমার ভেতরটা যেন বিল্লিতে আচড়াচ্ছে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলরাম বসু বৃন্দাবনে আত্মীয়দিগের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু গৌরী-মার কোন সংবাদই তখন পাওয়া যায় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের

মহাসমাধির কিছুদিন পরে শ্রীমা যখন বৃন্দাবনধামে তীর্থদর্শনে গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি যোগানন্দ মহারাজ ও অদ্ভুতানন্দ মহারাজকে গৌরী-মার অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। একদিন যোগানন্দ মহারাজ দূর হইতে দেখিয়াছিলেন একটি নির্জন স্থানে একটি গৈরিক শাড়ী শুকাইবার জন্য রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন, যমুনার তীরে একটি গুহার মধ্যে গৌরী-মা যোগাসনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীমাকে সেই কথা জানাইলেন। পরের দিন শ্রীমা ব্যাকুল অন্তরে গৌরী-মার সাধনার স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে গৌরী-মার সহিত শ্রীমার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। তখন দুইজনেই কাঁদিয়া আকুল। কিছুটা আত্মসংবরণ করিয়া শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনের কথা গৌরী-মাকে আনুপূর্বিক বলিলেনঃ "ঠাকুর আমাকে দর্শন দিয়ে বলেছেন, 'তুমি হাতের বালা খুলো না। বৈষ্ণবতন্ত্র জান তো?' আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বৈষ্ণবতন্ত্র কি? আমি তো কিছু জানি নে'। ঠাকুর বল্লেন, 'আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার কাছে শুনবে'! এখন গৌরীদাসী, তুমি বল—বৈষ্ণবতন্ত্র কি? তোমায় সেই থেকে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।" গৌরী-মা শ্রীমার কথা শুনিয়া একদিকে যেমন বিস্মিত হইলেন, অন্যদিকে তেমনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বারবার শ্রীমার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। অপূর্ব সেই দৃশ্য! শ্রীমার অনুরোধে গৌরী-মা তখন বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রীমার বৈধব্য নাই, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর নিত্যবর্তমান। শ্রীমা স্বয়ং লক্ষ্মী, সেইজন্য সধবার বেশ পরিত্যাগ করিলে বিশ্বের অকল্যাণ হইবে। শ্রীমা গৌরী-মার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন এবং তাহার পর হইতে শ্রীমা হস্তে সোনার বালা ও পরণে সরুলালপাড় কাপড় পরিধান করিতে লাগিলেন।

আর একদিনের কথা। একটি গুহার মধ্যে ধুনি জ্বালাইয়া শ্রীমা

ও গৌরী-মা দুইজনে যখন আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে দুইটি বিষধর সর্প তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্প দর্শন করিয়া শ্রীমা ভীতস্বরে বলিয়া উঠিলেন: "ও গৌরীদাসী, কি হবে গো, দুটো সাপ যে।" গৌরী-মা শান্তভাবে বলিলেন: "ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে ওরা। কিছু ভয় নেই মা, প্রসাদ পেয়ে এক্ষুণি চলে যাবে।" এই কথা বলিয়া গৌরী-মা গুহার এক পার্শ্বে রক্ষিত দামোদরের কিছু প্রসাদ ছিল তাহা সর্প-দুইটির সম্মুখে ঢালিয়া দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সর্প-দুইটি নিঃশেষে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। শ্রীমা সেই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন: "কি সর্বনাশ! তুমি সাপ নিয়ে কি করে থাক এখানে?" গৌরী-মা হাসিয়া অস্থির। সর্বভয়হরা বিশ্বরূপিণী শ্রীমার সর্পভয় দেখিয়া গৌরী-মা একদিকে যেমন বিস্মিতা হইলেন, অন্যদিকে তেমনি শ্রীমার মর্ত্যলীলায় জীবনকর্মের কথা ভাবিয়া পুলকিত হইলেন। বিশ্বপ্রকৃতি মহামায়ার খেলা সত্যই রহস্যময়!

গৌরী-মার প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা এখানে বলি। একদিন গৌরী-মা বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ্ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কালিপদ-বাবুকে বলিয়াছিলেন: "চল কালি, আসল কালীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব আজ।" তখনও কালিবাবু বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই আসল কালী কে ও কোথায়? গৌরী-মা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন: "মা, তোমার এই ছেলেকে এনেছি, একে কৃপা কর।" কালিপদবাবুকে দেখিয়া শ্রীমা বুঝিতে পারিলেন যে, সে লক্ষণযুক্ত চিহ্নিত সন্তান। শ্রীমা সেইদিনই তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কৃপা করিলেন। কালিপদবাবু জগজ্জননী শ্রীমার অপার স্নেহ-আশীর্বাদ লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন।

আর একবারের একটি ঘটনা। গড়পারের শীতলামাতার এক পূজারী-ব্রাহ্মণ গৌরী-মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। একদিন

ব্রাহ্মণ গৌরী-মাকে বলিলেন: "মাগো, বৃন্দাবনধামে গিয়ে ব্রজেশ্বরী রাধারাণীকে দর্শন করার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। তোমার সঙ্গে একবার গিয়ে দেখবো।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন গৌরী-মা। তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া একদিন শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূজারী-ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন: "এঁকে ভাল করে দেখ, স্বাভীষ্ট দেখতে পাবে।" প্রথমে সন্দিগ্ধ চিত্ত লইয়া ব্রাহ্মণ শ্রীসারদাদেবীকে প্রণাম করিলেন এবং প্রণাম করিয়াই বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে শ্রীমাকে বারবার দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের তখন কিছুটা চৈতন্যের উদয় হইয়াছে। তিনি শ্রীমার চরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

বন্দে রাধাং আনন্দরূপিণীম্,
রাধাং আনন্দরূপিণীম্, রাধাং আনন্দরূপিণীম্।"

পূজারী-ব্রাহ্মণের দুই চক্ষে তখন অবিরল ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। গৌরী-মা ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মহাশক্তিরূপিণী শ্রীমারই যে অশেষ করুণায় ব্রাহ্মণ পবিত্র ও ভাবমুগ্ধ হইয়া ধন্য হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। গৌরী-মার অন্তরের একান্ত বাসনাই ছিল যে, আনন্দময়ীর নিকট ব্রাহ্মণকে লইয়া গেলে শ্রীমা তাঁহাকে কৃপা করিয়া পরমানন্দ দান করিবেন। গৌরী-মার বাসনা অন্তর্যামিনী শ্রীমা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

গৌরী-মার জীবনে এই ধরনের কত ঘটনাই না ঘটিয়াছে এবং শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি তাঁহার অন্তরের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস জীবনের সকল চেষ্টায় ও কর্মে তাঁহাকে সাফল্য আনিয়া দিয়াছে। গৌরী-মার জীবন অধ্যাত্ম-উপলব্ধির অম্লান আলোকে উদ্‌ভাসিত ছিল এবং সেই উপলব্ধির অমৃত-আশীর্বাদ তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের দিব্যদিশারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর কল্যাণ-ইচ্ছায়। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে গৌরী-মার ত্যাগদীপ্ত জীবনের কাহিনী ত্রিকালসাক্ষী হইয়া লিখিত থাকিবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও যোগীন-মা ॥

শ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতির সহিত যোগীন-মার দিব্যজীবনকাহিনীও জড়িত রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগীন-মা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: "যোগীন সামান্যা রমণী নহে। সহস্রদলপদ্মের কুঁড়ি, সত্বর শুকায় না, ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া দিকে দিকে সৌরভ বিস্তার করে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে যোগীন-মার জীবনে পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর শুভাবির্ভাবের ফলে ভারতবর্ষে বহু গার্গী, মৈত্রেয়ী ও আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকূলের অভ্যুদয় হইবে। স্বামীজী যোগীন-মার সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, যোগীন-মা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্ত ভাবরাশি সকল নারীজাতির মধ্যে প্রসারিত হইবে। গোপাল-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি সেই মহীয়সী নারীজাতিরই প্রতিমূর্তি। শ্রীসারদাদেবী যোগীন-মাকেও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শ্রীমা যোগীন-মাকে 'মেয়ে-যোগেন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীমা বলিতেন: "যোগেন আমার জয়া, আমার সেবিকা, বান্ধবী, আমার চিরসঙ্গিনী" এবং "মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী।" দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পর ধীরে ধীরে শ্রীমা ও যোগেন-মার মধ্যে বেশ একটি স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে একজন ছিলেন যেন দিব্যকায়া এবং অপরজন ছিলেন অনুসারিণী ছায়া। শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে লাভ করিয়া যোগীন-মা আপনার জীবনকে দিব্যভাবে গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীমা যোগীন-মার সহিত প্রায় সকল সময়ে সকল

বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করিতেন। যোগীন-মা শ্রীমার কেশ বন্ধন করিয়া দিতেন এবং শ্রীমা তাহা এমনই পছন্দ করিতেন যে, চারি দিন অতীত হইলেও ঐ কেশবন্ধন তিনি খুলিতেন না, বলিতেন: "ও যোগেনের বাঁধা চুল, সে আস্‌লে সেইদিন খুলব।"

যোগীন-মা শ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে বহু কথাই পরবর্তী জীবনে সকলের নিকট বলিতেন। যেমন যোগীন-মার নিকট হইতে জানিতে পারি: "একবার শ্রীমা জয়রামবাটী যাচ্ছেন। তাঁর নৌকাখানি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই নৌকার পানে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে শ্রীমার নৌকা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন শ্রীমাকে দেখতে না পেয়ে বুকের ভেতর আটুপাটু করতে লাগল। নহবতে ফিরে গিয়ে শ্রীমার বিরহে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক সেই সময় ঐ পথ দিয়ে পঞ্চবটী থেকে নিজের ঘরে ফিরছিলেন। তিনি আমায় দেখে একটু চিন্তিত হলেন এবং নিজের ঘরে ফিরেই আমায় ডেকে পাঠালেন ও স্নেহভরে বল্লেন, 'ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে বুঝি? এই কথা বলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাধন-জীবনের বহু ঘটনা বলতে বলতে আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর কিছুদিন পরে শ্রীমা যখন আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীমাকে বলেছিলেন, 'সেই যে ডাগর ডাগর চোখ মেয়েটি তোমার কাছে আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি যাবার দিন নহবতে বসে কাঁদছিল।' শ্রীমা শুনে বলেছিলেন, 'হাঁ, আমি তাকে বেশ ভালভাবেই জানি। তার নাম যোগেন।'"

যোগীন-মা সামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও চৈতন্য-চরিতামৃতাদিও নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যোগীন-মার স্মৃতিশক্তিও বেশ প্রখর ছিল। ভগিনী নিবেদিতা যোগীন-মার নিকট হইতে যে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার

Cradle-Tales of Hinduism-গ্রন্থে কৃতজ্ঞতার 'সহিত তিনি স্বীকার করিয়াছেন। যোগীন-মার জীবনে প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দীন-দুঃখীদের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। তাঁহার নিকট আসিয়া কেহ রিক্তহস্তে কোনদিন ফিরিয়া যাইত না। তাহা ছাড়া তাঁহার মধ্যে ছিল একনিষ্ঠ সেবার ভাব। কোন আর্ত ও পীড়িত যোগীন-মার নিকট উপস্থিত হইলে নিঃসঙ্কোচ মন লইয়া তিনি তাহার সেবা করিতেন এবং ভাবিতেন, জীবন্ত নারায়ণের তিনি সেবা করিতেছেন। সকল প্রাণীতে নারায়ণবুদ্ধিতে সেবার ভাব ও আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন যোগীন-মা তাঁহার জীবনপথের দিশারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে এবং যোগীন-মা তাহা চিরদিনই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসংবরণের পরে যোগীন-মা বৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে শ্রীমা ও যোগীন-মা দুইজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনজনিত শোকে মাঝে মাঝে ক্রন্দন করিতেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দান করিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন সেই কথা আমরা বলিয়াছি। একদিকে গৌরী-মা ও অপরদিকে যোগীন-মা দুইজনেই বৃন্দাবনে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। যোগীন-মার তপস্যা দেখিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "যোগেন খুব তপস্বিনী। এখনও কত ব্রত উপবাস করে।"

শোনা যায়, একবার যোগীন-মার মনে নাকি শ্রীমা-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, সংসারের কাজেই নাকি শ্রীমার বেশী আসক্তি। যোগীন-মা মনে করিয়াছিলেঃ "ঠাকুরকে দেখছি এমন ত্যাগী, কিন্তু শ্রীমাকে দেখছি ঘোর সংসারী।" যাহাহউক করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর যোগীন-মাকে দর্শন দিয়া তাঁহার মনের সেই মিথ্যা সংশয় দূর করিয়াছিলেন। ঘটনাটি হইল এই যে, একদিন গঙ্গাতীরে যোগীন-মা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ তিনি দর্শন করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া তাঁহাকে যেন বলিতেছেনঃ "দেখ, দেখ,

গঙ্গায় কি ভেসে যাচ্ছে।" যোগীন-মা দেখিলেন, এক সদ্যোজাত নাড়ীনালবেষ্টিত রক্তাক্ত শিশু গঙ্গার জলস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: "গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয়? ওকেও (শ্রীমাকেও) তেমনি ভাববে। ওকে আর একে (নিজের দেহকে দেখাইয়া) অভিন্ন জানবে।" যোগীন-মা বিস্মিত হইলেন ও বুঝিতে পারিলেন যে, অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মনের সংশয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য সংশয়মুক্ত করিলেন। যোগীন-মা অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীমার নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং আনুপূর্বক সকল কথা শ্রীমার নিকট ব্যক্ত করিলেন। শ্রীমা শুনিয়া যোগীন-মাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন: "তুমি ভাগ্যবতী। ঠাকুর তোমার সংশয় দূর করেছেন, চিন্তা কি।" সংশয় সাধারণত অনিষ্টকর হইলেও সংশয়ই আবার যথার্থ সত্যের আবিষ্কার করিয়া মনকে সন্দেহমুক্ত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন: "ব্যাকুল হয়ো না গো। মরণকালে তোমার সহস্রদলপদ্ম বিকশিত হয়ে তোমায় পরমজ্ঞান দান করবে।" ঘটিয়াছিল তাহাই। জীবনের শেষমুহূর্ত উপস্থিত হইলে যোগীন-মা গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া মনকে ইষ্টে লয় করিয়াছিলেন এবং যোগীন-মার নশ্বর-দেহ ধূলিমলিন পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে শ্রীমা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শ্রীমা তখন চিন্তা করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর যোগীন-মা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: "ও কুঁড়ি, ফুল নয় যে একটুতেই ফুটে যাবে। ও যে সহস্রদলপদ্ম! ধীরে ধীরে ফুটবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যবাণী যোগীন-মার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। মার্কিণ মহিলা দেবমাতা যোগীন-মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন: "এইরূপ অধ্যাত্ম জীবন এক একটি সরোবর তুল্য। প্রচণ্ড ভাস্কর তাঁহার প্রখর রশ্মিপ্রভাবে সরোবরের বারি শোষণ করিতে পারে, কিন্তু সেই বারি পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে বর্ষিত হইয়া পৃথিবীকে

শীতল, স্নিগ্ধ ও শস্যশ্যামল করে। কালের কঠিন স্পর্শে এইরূপ অধ্যাত্ম জীবন লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনের সার্থকতা আলোকস্তম্ভরূপে পথভ্রান্ত পথিককে পথ প্রদর্শন করিয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সন্ধান দিয়া থাকে।” সত্যই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত স্নেহধন্যা যোগীন-মা বিশ্বসমাজে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হইয়া থাকিবেন। অবতারের সঙ্গে যাঁহারা পূর্বে পূর্বে আসিয়াছেন এবং যাঁহারা পরে আসিবেন ও অবতারলীলাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন তাঁহারা বিশ্বের প্রতিটি মনুষ্যের নিকট নমস্য। তাঁহাদিগের জীবনের কর্ম ও জীবনচরিত্রের মহিমা অবতারলীলার সহিত যুক্ত হইয়া সংসারতাপতপ্ত মানুষকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও গোলাপ-মা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসমাজে গোলাপ-মার নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য। গোলাপ-মা শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান ও ভক্তগণের জননী-স্থানীয়া ছিলেন। নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে স্বামী, কন্যা ও পুত্র যখন একে একে পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছিল ঠিক সেই সময়ে যোগীন-মা বেদনাহত দেহ-মন লইয়া দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যোগীন-মাই গোলাপ-মাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন, কেননা যোগীন-মা জানিতেন যে, সেই নিদারুণ শোকে গোলাপ-মাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন একমাত্র পরমশান্তিনিকেতন লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবই এবং সেইজন্য একদিন তিনি যোগীন-মাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া গোলাপ-মা জীবনে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

গোলাপ-মা অভূতপূর্ব এক ভালবাসার আকর্ষণে পড়িয়া প্রতিদিন দক্ষিণেশ্বরতীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সমীপে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া গোলাপ-মা শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার বন্ধু শ্রীরাম মল্লিকের ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন: "জন্ম-মৃত্যু এসব ভেলকির মত; এই আছে, এই নাই। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। তাঁর উপর কি করে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টাই কর, শোক করে কি হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে ঐকথা শুনিয়া পুত্র ও স্বামী-শোকাতুরা গোলাপ-মা হৃদয়ে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিয়া ভাবিলেন, সত্যই তো সংসারে কোন-কিছুই নিত্য ও সত্য নয়। ভাই,

বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলেই অনিত্য—আজ আছে, কাল নাই। গোলাপ-মা মনে মনে বলিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক কথাই বলিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বর যাইতে যাইতে শ্রীমার সহিত গোলাপ-মার ক্রমশ পরিচয় হইল এবং শ্রীমার অফুরন্ত স্নেহ-করুণায় তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। একদিন গোলাপ-মার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন ঃ "তুমি ওকে (গোলাপ-মাকে) খুব পেট ভরে খেতে দেবে। পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে। তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন করো। ঐ বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।" শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীমা নিজের কন্যার ন্যায় গোলাপ-মাকে স্নেহ করিয়া আপনার নিকটেই রাখিয়াছিলেন। শ্রীমা গোলাপ-মার প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন ঃ "গোলাপ আমার বিজয়া। আমার জীবনে যা-সব হয়েছে, এই গোলাপ সব জানে।" গোলাপ-মাও শ্রীমাকে অন্তরের সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। তাহাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরও শ্রীমা-সম্বন্ধে অনেক সময়ে গোলাপ-মাকে বলিতেন এবং গোলাপ-মা শুনিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ ও পুলকিত হইতেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুর গোলাপ-মাকে শ্রীমার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন ঃ "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে ওর রূপ অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" গোলাপ-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ কথা ও ইঙ্গিত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে রাখিয়াছিলেন এবং শ্রীমা যে জ্ঞানদায়িনী সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতী তাহা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তাহাছাড়া বিশাল সমুদ্রের বুকে জাহাজ যেমন ধ্রুবতারার দিকে কম্পাসের কাঁটা স্থির রাখিয়া দিকনির্ণয় করে তেমনি গোলাপ-মা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সারদার জীবনাদর্শকে লক্ষ্য করিয়া আপনার জীবন গঠন এবং জীবনের সকল চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় শ্যামপুকুর ও কাশীপুরের বাটীতে শ্রীমা

যখন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, গোলাপ-মাও ছায়ার মত পার্শ্বে থাকিয়া দিবারাত্র শ্রীমাকে সকল কর্মে সাহায্য করিতেন। তাহাছাড়া গোলাপ-মার চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল যে, তিনি নিজের সকল-কিছু ক্রটী-বিচ্যুতির কথা মুক্তকণ্ঠে শ্রীমার নিকট তো বটেই, পরন্তু সকলের নিকটই স্বীকার করিতেন। তাহাছাড়া গোলাপ-মা ছিলেন স্পষ্টবক্তা ও সত্যবাদী। শ্রীমা তাঁহার সত্যবাদিতার জন্য কখনও কখনও বলিতেন: "ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার ? 'অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়'।" আবার কখনও কখনও বা শ্রীমা বলিতেন: "গোলাপের সত্যকথা বলতে গিয়ে চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেছে।" তবে স্পষ্টবাদিতা ও সত্যবাদিতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেকের নিকট গোলাপ-মা অপ্রিয়ভাজনও হইতেন। কিন্তু তথাপি সত্যই কলির তপস্যা মনে করিয়া গোলাপ-মা জীবনের সকল মুহূর্তে সকল কর্ম সত্য ও আচারনিষ্ঠ হইয়া সম্পাদন করিতেন।

জয়রামবাটীতে গোলাপ-মা কিছুদিনের জন্য শ্রীমার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধাম, পুরী, কোঠার, কৈলোয়ার, কাশী ও রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানে ও তীর্থে পরিভ্রমণকালে গোলাপ-মা শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। বেলুড়ে, বাগবাজারে এবং কলিকাতায়ও শ্রীমার সহচারিণীরূপে গোলাপ-মা থাকিতেন। একবার জনৈক ভক্ত অবিবেচক-রূপে আবদার করিয়া শ্রীমাকে একটি ঘরের মধ্যে আসনে বসাইয়া ধূপ-ধূনাদি-সহকারে পূজা ও স্তবপাঠ করিতেছিলেন। ধূপ-ধূনার ধুঁয়ায় ঘরটি অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। এদিকে শ্রীমার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইয়া শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্কোচে ও ভক্তের আবদারের জন্য তিনি কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। এরূপ সময়ে গোলাপ-মা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবপ্রবণ ভক্তের অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন: "তোমরা কি কাঠ-পাথরের ঠাকুর পেয়েছ গা ?" গোলাপ-মার তীব্র অথচ স্নেহপূর্ণ তিরস্কারে ভক্তের চেতনা হইয়াছিল ও জগজ্জননী শ্রীমাকে অকারণে কষ্ট দিতেছেন

বুঝিতে পারিয়া তিনি লজ্জায় ও দুঃখে পরে গোলাপ-মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যাহাহউক সেই সময় হইতে শ্রীমা কোথাও গমন করিলে গোলাপ-মাকে সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না। শ্রীমা ঐ প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেনঃ "গোলাপ না গেলে কি আমি যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা।" তাহাছাড়া শ্রীমা অকপটে সকল কথাই গোলাপ-মাকে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। গোলাপ-মার সহিত শ্রীমার যে কেবলই মায়িক সম্বন্ধ ছিল তাহা নহে, অধ্যাত্মজীবনের পথেও গোলাপ-মা ছিলেন তাঁহার সঙ্গিনী। গোলাপ-মা সম্বন্ধে একবার শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "এই গোলাপ, যোগেন (যোগীন-মা) কত ধ্যান-জপ করেছে! গোলাপ জপে সিদ্ধ। যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।" শ্রীমার এই কথাগুলি সত্যই রহস্যপূর্ণ। যাহাহউক গোলাপ-মার জীবন ছিল তপস্যাময় অথচ কর্মচঞ্চল এবং তাঁহার সকল কর্ম সম্পন্ন করার মধ্যেও বেশ একটি ওজনবোধ ও সংযমের ভাব ছিল। তাহাছাড়া প্রতিদিন ঠাকুর-ঘরে গমন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে প্রণাম কবিয়া তবে গোলাপ-মা তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন কর্ম করিতেন।

সকলের প্রতি শ্রীসারদাদেবীর শিক্ষাই ছিলঃ "অপচয় করতে নেই, অপচয়ে মা লক্ষী কুপিতা হন।" এই উপদেশ গোলাপ-মা জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তিনি নিজেও অপচয় ও বিশৃঙ্খলা পছন্দ করিতেন না এবং অন্য কাহাকেও উহা করিতে দিতেন না। তাহাছাড়া মুক্তহস্তে দান করিতে পারিলেই গোলাপ-মা হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিতেন। দীন-দুঃখী ও অভাবী সকলেই জানিত যে, গোলাপ-মার নিকট উপস্থিত হইলে কিছু না লইয়া তাহারা ফিরিবে না। সত্যই গোলাপ-মা কাহাকেও রিক্তহস্তে কোনদিন ফিরাইতেন না। এই ধরনের একটি অনাথিনী পাগলিনী গোলাপ-মার নিকট প্রায়ই আসিত। সে আসিয়া ডাকিতঃ "গোলাপের মা, আমি এসেছি।" দুঃখিনী পাগলিনীর যাওয়া-

আসারও কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। সুতরাং দিবাভাগে কিংবা রাত্রে যখনই পাগলিনী আসিয়া উপস্থিত হইত তখনই গোলাপ-মা বলিতেন: "আহা, পাগল অনাথ, দোরে দোরে মেগে খায়; সময় হোক অসময় হোক, এলে একমুঠা দিতে হয়।" সেইজন্য সম্মুখে যাহা থাকিত—চাউল, কাপড় অথবা টাকা-পয়সা, পাগলিনী আসিয়া উপস্থিত হইলে গোলাপ-মা তাহাই তাহাকে দিতেন এবং ভিক্ষা পাইয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া চলিয়া যাইত। এমনি ছিল গোলাপ-মার সকলের প্রতি দরদী-মনের পরিচয়। এমনও দেখা গিয়াছে যে, অপরের অভাব-দৈন্য দূর করিতে গিয়া গোলাপ-মা আপনার সকল-কিছু বিতরণ করিয়া দিতেন। দরিদ্র প্রতিবেশীর চিকিৎসার জন্য আপনিই ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া চিকিৎসা করাইতেন ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। শ্রীমা গোলাপ-মার এই উদার স্বভাব ও পরহিতে দানের কথা জানিতেন এবং সেইজন্য ত্যাগব্রতী গোলাপ-মাকে তিনি কন্যা-নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন।

একবার শ্রীমা তাঁহার আহারের সময় একজন সেবককে কিছু ডাঁটা-চচ্চড়ি আনিয়া দিতে বলিলেন। শ্রীমার আদেশে সেবক ডাঁটা-চচ্চড়ি আনয়ন করিয়া শ্রীমাকে দিল। শ্রীমার আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এরূপ সময়ে গোলাপ-মা আসিয়া উপস্থিত এবং একটু রাগস্বরে শ্রীমাকে বলিলেন: "শূদ্রের হাতের সক্‌ড়ি জিনিষ খাচ্ছ কি করে মা?" শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন: "বল কি গোলাপ, ভক্তের আবার কি জাত আছে?" শ্রীমা এমনই স্নেহপূর্ণভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, তাহা শুনিয়া গোলাপ-মা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া শ্রীমার মুখের প্রসাদী ডাঁটা চাহিয়া লইয়া নিজের মুখে দিলেন ও নীরবে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। সত্যই সেইদিন হইতে গোলাপ-মার হৃদয় হইতে শুচি-অশুচির ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা এখানে মনে পড়ে। একবার শ্রীমা অসুস্থ হইলে তাঁহার ব্যবহৃত পায়খানার পাত্র

গোলাপ-মা সহস্তে পরিষ্কার করিয়া তবে ঠাকুর-ঘরের কার্য করিতে যাইতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া নলিনী-দিদি একদিন শ্রীমার নিকট অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন: "গোলাপ-দিদি পায়খানা সাফ করে এসে আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল। আমি বলেছিলাম, 'ও কি গোলাপ-দিদি, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস'। তখন গোলাপ-দিদি বলেছিলেন, 'তোর ইচ্ছা হয় তুই যা না'।" গোলাপ-মার বিরুদ্ধে নলিনী-দিদির অভিযোগ শুনিয়া প্রসন্নময়ী শ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন: "গোলাপের মন কত শুদ্ধ; কত উঁচু মন! তাই ওর অত শুচি-অশুচি বিচার নেই,—অত শুচিবাই-টাইয়ের সে ধার ধারে না। ওর এই শেষজন্ম। তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার।" নলিনী-দিদি আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ধীরপদক্ষেপে সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই সাধক রামপ্রসাদরচিত এই গানটি গাহিতেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে মন,
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া,
তার, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে, বিবেক নামে তারি বেটা
তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি।
(যখন) দুই সতীনে পিরীত হবে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥
—প্রভৃতি

গোলাপ-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে গানটি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ গানের আদর্শ নিজের জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে সর্বদা

চেষ্টা করিতেন। বলিতে কি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় গোলাপ-মা শুচি-অশুচির পারে উপনীত হইয়া জীবনে চিরপবিত্র হইয়াছিলেন। পরশমণির স্পর্শে গোলাপ-মার মনের মধ্য হইতে সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল ভেদজ্ঞান ও আপন-পর ভাব চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়াছিল। শ্রীমাও একদিন গোলাপ-মার সেই শুদ্ধ ও নির্মল সংস্কারের প্রসঙ্গে একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেনঃ "দশজনের সুবিধা হলে ও তারা যে শান্তি পেলে ওতে গোলাপের মঙ্গল হবে, তাদের শান্তিতে এরও শান্তি হবে। অনেক সাধন-তপস্যা থাকলে তবে এ'জন্মে মনটি শুদ্ধ হয়।" সত্যই একজন্মে মনকে পরিশুদ্ধ করিতে হইলে ত্যাগ-তপস্যা এবং সাধন-ভজনের প্রয়োজন। করুণাময়ী শ্রীমা তাহা জানিতেন বলিয়াই গোলাপ-মার শুদ্ধচিত্তের জন্য অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। একজন্মে মন শুদ্ধ হয় না, কিন্তু শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের কৃপা হইলে একজন্মেই চিত্ত নির্মল হইয়া শুদ্ধমনের গোচর ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়। ঈশ্বর দর্শন হইলে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়। গোলাপ-মা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার অন্যান্য সঙ্গী ও সন্তানরা শ্রীভগবানের সান্নিধ্য ও করুণালাভ করিয়া জীবনসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও অঘোরমণি দেবী ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্তসাধিকা ছিলেন অঘোরমণি দেবী। তিনি শ্বশুরকুলের গুরুদেবের নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এই মহীয়সী ভক্ত-রমণী সকলের নিকট 'গোপালের-মা' নামে পরিচিতা ছিলেন।

অঘোরমণি দেবী যখন কামারহাটীগ্রামে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে ছিলেন তখন দত্ত-গৃহিণীর সহিত তাঁহার গভীর প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল। ভাগ্যবতী দত্তগৃহিণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন অঘোরমণি দেবী লোকমুখে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা, আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যানুভূতির কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি শুনিলেন যে, শক্তিপূজারী একজন ভগবান-পাগল, সর্বদা 'মা মা' করেন ও ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। অঘোরমণি এই অদ্ভুত পূজারীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং দত্তগৃহিণী ও অপর একটি রমণীকে সঙ্গে লইয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদিগকে সাদরে আপনার ঘরে বসাইলেন এবং তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাচিত্ত ও ভক্তিভাব দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তাহার পর বহুক্ষণ ভগবদ্‌প্রসঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের কতকগুলি ভজনগান শুনাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব, আচরণ, গান ও অমৃতময় উপদেশ শুনিয়া অঘোরমণি দেবী মনে মনে চিন্তা করিলেন, লোকে বলে ইনি পাগল, কিন্তু ইহার পাগলামী তো দেখিতেছি ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বরজানিত এই মহাপুরুষ। যাহাহউক সেইদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবেকে দর্শন করিয়া

অঘোরমণি দেবী অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। দত্তগৃহিণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একদিন কামারহাটীর ঠাকুরবাড়ীতে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও সেই আমন্ত্রণ আনন্দে গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কামারহাটীতে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তিনি কামারহাটী গমন করিলেন। সেখানে অঘোরমণি দেবী-পূজিত শ্রীগোপাল-বিগ্রহ দর্শন করিয়া ভাবে আত্মহারা হইয়া কীর্তনানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নৃত্য দেখিয়া অঘোরমণি দেবীর আনন্দের আর সীমা ছিল না। তিনি কীর্তনানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ দিব্যভাবের আবেশ দেখিয়া শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার পর অঘোরমণির জীবনে এক অভিনব পরিবর্তনের সূচনা হইল। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। অঘোরমণির মন পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদিন কিছু সন্দেশ কিনিয়া লইয়া তিনি একাকিনীই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। অঘোরমণিকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া উঠিলেন: "এসেছ? আমার জন্য কি এনেছ, দাও।" সলজ্জভাবে অঘোরমণি কাপড়ের মধ্য হইতে সন্দেশ বাহির করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের হস্তে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উহা লইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন: "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো একটা আসবার সময় আনবে। যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চড়ি, আলু, বেগুন, বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারী তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতে রান্না খেতে বড় সাধ হয়।"

অঘোরমণি একটু বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—'এ আবার' কিরূপ সাধু, কেবল 'নিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে'। কোথায় একটু ধর্মকথা বলিয়া বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিয়া সময় কাটাইবেন, না কেবল খাই খাই। আমি গরীব—কাঙ্গাল লোক, কোথায় এত খাওইয়াতে পাইব। দূর হোক্, আর এই সাধু দর্শন করিতে আসিব না'। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর অঘোরমণির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তবে কিছু বলিলেন না। এইদিকে অঘোরমণির মনও আর কিছুতেই দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারহাটিতে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছিল না। তিনি প্রবল এক আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন এবং জোর করিয়াই সেইদিন কামারহাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু ফিরিয়াও তো মনে শান্তি নাই। চুম্বকপাথর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, শ্রীশ্রীঠাকুর তেমনি অঘোরমণির মনকে স্নেহ দিয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং অঘোরমণি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, কেবলিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তা করেন ও দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন বলিয়া মন অস্থির। সুতরাং দুই একদিন পরেই চচ্চড়ি রান্না করিয়া তাহা লইয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে উহা খাইতে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চচ্চড়ি খাইতে খাইতে আনন্দে বলিলেন: "আহা, কি রান্না গো, যেন সুধা—সুধা।" শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দে অঘোরমণির চক্ষে জল আসিল এবং তাঁহার প্রতি গোপাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার স্নেহ-যত্নের কথা চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

কয়েক মাস সেইভাবে অঘোরমণি দেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ইহার পরে একদিন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন: "গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হল? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, সে কেবল খেতে চায়। আর আসব না।" পূর্বসংস্কার অনুযায়ী অঘোরমণির মনে মাঝে মাঝে ঈশ্বরবিশ্বাস ও একান্ত ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহের ভাব প্রকাশ পাইতে

লাগিল। কিন্তু সেই সন্দেহ আর কতদিন থাকিতে পারে! যে সন্দেহভঞ্জনকারী নারায়ণের সান্নিধ্যে তিনি আসিয়াছেন তিনিই সময়ে তাহা দূর করিয়া দিলেন। আলোকের পার্শ্বে অন্ধকার কোনদিনই থাকিতে পারে না। সেইজন্য অঘোরমণি মনে মনে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন না বলিতেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহের আকর্ষণ তাঁহাকে টানিতেছে, সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে না আসিয়া তাঁহার উপায় নাই। তাই কামারহাটীতে ফিরিয়া গেলেও অন্তরের আকর্ষণে তিনি কামারহাটী হইতে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার জীবন্ত গোপাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

একদিনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা। অঘোরমণি কামারহাটীর বাটীতে যখন শ্রীগোপাল-বিগ্রহের পূজা করিতেছেন তখন অকস্মাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার গোপালের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। প্রথমে চক্ষুর ভ্রম বলিয়া তিনি মনে করিলেন, কিন্তু পরে বারবার ভাল করিয়া দেখিলেন যে, গোপাল শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তিতে তাঁহার পূজা গ্রহণ করিতেছেন! তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং সেইদিন বুঝিলেন তাঁহার আদরের গোপাল-বিগ্রহ আর কেউ নন, দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার জীবন্ত গোপালকে দর্শন করিবার জন্য তখনই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সুতরাং পরের দিন প্রাতঃকালে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া অঘোরমণি দেবী ব্যাকুল হইয়া 'গোপাল গোপাল' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ক্ষীর, ননী, সর প্রভৃতি খাওয়াইতে লাগিলেন। তিনি ভাবে আত্মহারা ও বাহিরের সকল জ্ঞানই যেন তখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অঘোরমণির এই ভাব লক্ষ্য করিয়া করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুগ্ধ হইয়া বলিলেন: "দেখ দেখ, আনন্দে ভরে গেছে, ওর মনটা

এখন গোপাললোকে চলে গেছে।” শ্রীশ্রীঠাকুরেরও তখন সন্তানভাব। তিনি যেন স্নেহময়ী জননীর হস্ত হইতে ভাবে গদগদ হইয়া ক্ষীর, সর, ননী প্রভৃতি গ্রহণ করিতেছিলেন। অঘোরমণি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই ভাব স্নেহময়ী মাতা যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের সেই অতীতের স্মৃতি মনে করাইয়া দিতেছিল। অবতারলীলার মাধুর্যের কথাই স্বতন্ত্র ও বর্ণনাতীত! সেইদিন হইতে অঘোরমণি দেবী ‘গোপালের-মা’-রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহাকে আদর করিয়া ‘গোপালের-মা’ বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ আমরা লীলাময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাধিকা অঘোরমণি দেবী তথা গোপালের-মার মধুর সম্পর্ক লইয়াই আলোচনা করিতেছিলাম। এইবার শ্রীমা সারদাদেবীর সহিত গোপালের-মার কী নিবিড় সম্পর্ক ছিল তাহারই কিছুটা পরিচয় দিব।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত গোপালের-মা ও গোলাপ-মা বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বলরামবাবু গোপালের-মা প্রভৃতির জন্য কিছু কাপড় ও দ্রব্যসামগ্রী উপহার দিলেন। ইহার একটি পুটুলি গোপালের-মার হস্তে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে একটু বিরক্তির ভাব উপস্থিত হইল এবং গম্ভীরভাবে থাকিয়া গোপালের-মার সঙ্গে তিনি একটি কথাও কহিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই গম্ভীর ভাব ও নির্বাক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গোপালের-মা বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। নানান্-কিছু চিন্তা করিয়া গোপালের-মা অবশেষে বলরামবাবু-প্রদত্ত সকল দ্রব্যই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিবেন স্থির করিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া শ্রীমাকে বলিলেনঃ “ও বউ মা, গোপাল এই সব জিনিষের পুটুলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? তবে এসব আর নিয়ে যাব না, এখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই।” গোপালের-মার ব্যথিত হৃদয় অনুভব করিয়া করুণাময়ী শ্রীমা হাসিয়া

বলিলেন ঃ "উনি বলুন গে। তোমায় দেবার তো কেউ নেই, তা তুমি কি করবে—মা? দরকার বলেই তো এনেছ!" গোপালের-মা প্রসন্নময়ী শ্রীমার কথা শুনিয়াও কিছু দ্রব্য বিলাইয়া দিলেন এবং শাক-সব্‌জী সামান্য যাহা-কিছু ছিল তাহার দ্বারা তরকারী রন্ধন করিয়া তাঁহার জীবন্ত গোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও পরমানন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন। অবতারলীলার রহস্য ভেদ করা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়, তবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহার ভাগবত লীলার কিছু কিছু আভাস প্রদান করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী গোপালের-মাকে শ্বাশুড়ির ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং গোপালের-মাও শ্রীমাকে 'বউ-মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মাতা-কন্যার মধ্যে সম্পর্ক বেশ মধুর ছিল। গোপালের-মা যখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন তখন শ্রীমা আপন হস্তে সর্বত্র গোবর ও গঙ্গাজল দিয়া পরিস্কার করিয়া গোপালের-মাকে রন্ধন করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, গোপালের-মার আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা ছিল একটু বেশী রকমের—যদিও পরবর্তীকালে শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য-সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার আচার-বিচার ও নিয়ম-নিষ্ঠার আতিশয্য অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল।

বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর নিকট যে কোন সময়ে যে কেহই উপস্থিত হইত কাহাকেও তিনি রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিয়া নিরাশ করিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ভক্ত-শিষ্যগণ যখনই আসিতেন তখন তাঁহারা ফল-মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিতেন ও শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা নহবতে শ্রীমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং শ্রীমা সেই সমস্ত সামগ্রী হইতে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া বাকী সমস্তই ভক্ত-সন্তানদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। একদিন এইভাবে সমস্ত দ্রব্য বিলাইয়া দিতে দেখিয়া গোপালের-মা বলিলেন ঃ "বউ-মা, আমার গোপালের জন্য কিছু রাখলে না?" শ্রীমা তাঁহার কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। ঠিক সেই সময়ে নবগোপাল-

বাবুর স্ত্রী এক চাঙ্গারি সন্দেশ আনয়ন করিয়া শ্রীমার হস্তে দিলেন। শ্রীমা তখন সেই সম্মুখ বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন এবং ভাবিলেন ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই লীলা।

শ্রীমা সকল বিষয়েই মুক্তহস্ত ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার সেই স্বভাবের কথা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুটা অনুযোগের স্বরে শ্রীমাকে বলিয়াই ফেলিলেন: "এত খরচ করলে কিভাবে চলবে?" শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার অর্থ বুঝিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করিয়া অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে নহবতের ঘরে চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার ভাব বুঝিতে পারিলেন, সেইজন্য ব্যস্ত হইয়া রামলাল দাদাকে বলিলেন: "ওরে রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখাইয়া) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।" সর্বশক্তিরূপিণী শ্রীমার নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর সেইদিন যেন পরাজয় স্বীকার করিলেন। ঈশ্বরীয় লীলার ইহাও একটি রহস্যময় প্রকাশ।

একবার শ্রীমা যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন: "তা যোগেন, মানুষ কি সব কথাই মেনে চলতে পারে?" পরে একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন: "তা বাপু যাই বল, কেউ মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।" সত্যই দেখা যায় যে, স্নেহময়ী শ্রীমার নিকটে সন্তানের স্থান ও দাবী সকলের অপেক্ষা প্রথমে। সেইজন্য শ্রীমা সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত হইলেও সন্তান-দিগের বিষয়ে তাঁহার মধ্যে কখনও কখনও বিপরীত ভাবের আচরণ দেখা যাইত, কেননা ভক্ত-সন্তানদিগের নিকট শ্রীমা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বজননীর বাৎসল্যভাব লইয়া মর্ত্যভূমিতে শ্রীমার আগমন, আবার গুরুরূপে বা আচার্যের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীমা সকলকেই জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য আকুল। পার্থিব জগতে আদর্শ মানবীর সকল মাধুর্য ও স্নেহ-ব্যবহার লইয়া যেমন শ্রীমার আবির্ভাব, তেমনি অপার্থিব জগতে মহাজ্ঞানদায়িনীরূপে

ও দেবীরূপে তাঁহার প্রকাশও প্রত্যক্ষ ও নিবিড় অনুভবের বিষয় ছিল। স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধানকে তাই আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবী নিকট করিয়া দিয়া বিশ্বের সকল মানুষের সাধনার, অধ্যাত্মভাবনার ও শাশ্বত শান্তি লাভের পথকে সুগম ও সচ্ছল করিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্গের দেবী হইলেও শ্রীমা ছিলেন মর্ত্যবাসীর স্নেহ ও আদরের জননী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমাকে ঠিক সেইভাবেই গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীমা চিরকল্যাণী অভয়দায়িনী এবং সেজন্যই তাঁহার মধ্যে সর্বদা সর্বভয়হরা অভয়ার আবেশ ও ভাবের প্রকাশ ছিল।

যাহাহউক একদিন গোপালের-মা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত ভগবদ্প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ-আলোচনার পর নহবতে গিয়া জপ করিতে বসিলেন এবং তাঁহার জপ শেষ হইবার শেষমুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চবটী হইতে নহবতে আসিয়া গোপালের-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "তুমি এখনও এত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে?" গোপালের-মা বলিলেন : "জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন : "সব হয়েছে।" গোপালের-মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন : "সব হয়েছে?" শ্রীশ্রীঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন : "হাঁ,—সব হয়েছে।" গোপালের-মা বলিলেন : "বল কি? সব হয়েছে?" এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন : হাঁ, তোমার নিজের জন্য জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে। তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হয়তো করতে পার।" গোপালের-মা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন : "তবে এখন থেকে যা-কিছু করব, সব তোমার, তোমার, তোমার জন্য।" এই ঘটনার পর গোপালের-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্যাণের জন্য একমাত্র মালা জপ করিতেন এবং যতদিন পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর মর্ত্যশরীরে জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ 'গোপাল' জ্ঞানে সেবা-যত্ন করিতেন।

ক্রমে বার্ধক্যের জন্য গোপালের-মা চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়েন।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সেইজন্য ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর বাটীতে গোপালের-মাকে লইয়া আসেন। শ্রীসারদাদেবীর জন্যও তখন কোন স্থান কলিকাতায় স্থির করা হয় নাই, সাময়িকভাবে বাটী ভাড়া করিয়াই শ্রীমাকে রাখা হইত। এইদিকে বলরাম বসুর বাটীতে অসুস্থ গোপালের-মার ক্রমশ অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন ভগিনী নিবেদিতা সারদানন্দ মহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন যে, ১৭নং বোসপাড়া লেনে তাঁহার বালিকা-বিদ্যালয়ের পৃথক একটি ঘরে গোপালের-মার থাকার বন্দোবস্ত হইতে পারে এবং তিনি তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ভার লইতে পারেন। শরৎ মহারাজ শুনিয়া আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন। কাজেই ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে গোপালের-মাকে ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে স্থানান্তরিত করা হইল। নিবেদিতা পরমসাধিকা ও শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা গোপালের-মার সেবার অধিকার ও সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। তখন মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখিত প্রতিটি পত্রে নিবেদিতা লিখিতেন: "গোপালের-মা এখানে (আমার নিকট) আছেন, আমার যে কী আনন্দ?"

১৭নং বোসপাড়া লেনে গোপালের-মা দীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। তখন বিভিন্ন কর্মে ও কর্তব্যে লিপ্ত থাকিয়াও ভগিনী নিবেদিতা মন-প্রাণ দিয়া গোপালের-মার দেখাশোনা ও সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গোপালের-মার জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি এবং বাক্‌শক্তিও সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। চক্ষের দৃষ্টি ও বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইবার কিছুকাল পূর্বে শ্রীমা সারদাদেবী একদিন গোপালের-মার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলে তিনি অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন: "কে, বউ মা? এসো।" শ্রীমাও শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তর দিলেন: "কেমন আছ মা?" গোপালের-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন:

"ভাল।" গোপালের-মা পরে অস্ফুটস্বরে শ্রীমাকে বলিলেন ঃ "গোপাল এসেছ? এস, এস। ভ্যাখ, এতদিন তুমি আমার কোলে বসেছিলে, আজ তুমি আমাকে কোলে নাও।" শ্রীমা বিস্মিত হইয়া গোপালের-মার দিব্যভাবের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমা বুঝিলেন যে, গোপালের-মার বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি তাঁহার স্নেহের গোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে তন্ময় হইয়া আছেন। সুতরাং শ্রীমা সস্নেহে গোপালের-মার মস্তক আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শ্রীমার হস্তের শীতলস্পর্শ পাইয়া গোপালের-মা ধীরে করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ঃ "গোপাল, এতদিন তুমি আমার পা ধুইয়ে দিয়েছ, আমার বসবার আসন পেতে দিয়েছ, আজ তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও গোপাল।" তখন সেবিকা বস্ত্রাঞ্চলে শ্রীমা সারদার পবিত্র পদরেণু লইয়া গোপালের-মার সর্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। শ্রীমা নির্বিকার ও স্তব্ধ। তিনি ধীরে ধীরে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। অপূর্ব সেই স্নিগ্ধ ও স্বর্গীয় ভাবের মাধুর্য। গোপালের-মার মস্তক জগজ্জননী শ্রীমার ক্রোড়ে ন্যস্ত এবং শ্রীমাও গভীর ধ্যানের আনন্দে আত্মহারা। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। শ্রীমা গোপালের-মার মুখের দিকে অপলকনেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এতদিন পর্যন্ত গোপালের-মা শ্রীমার নিকট শ্বাশুড়ীর স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, কিন্তু আজ গোপালের-মা শ্রীমার স্নেহধন্যা কন্যা ও বিশ্বরূপিণী জননী শ্রীসারদা অসহায় শরণাগত কন্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা। শ্রীমা বুঝিয়াছিলেন যে, ভাগ্যবতী গোপালের-মার গোপাললোক বৈকুণ্ঠে গমন করিবার সময় অতি নিকটে। দক্ষিণেশ্বরের সেই অতীত দিনগুলির কথা শ্রীমা একমনে তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন সেইদিনের কথা যেইদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা আহার করিতে বসিয়াছেন ও গোপালের-মা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন ঃ "বউ মা, কি খাচ্ছিস, একটু দেনা।" শ্রীমা তাহার উত্তরে

বলিয়াছিলেনঃ "বাপ্‌রে, আপনাকে দিতে পারব না।" শ্রীমার সহিত গোপালের-মার তখন শাশুড়ি-বধূ বা মাতা-কন্যার সম্ভ্রম ও স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক। কিন্তু আজ গোপালের-মা জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়াইয়া তাঁহার আরাধ্য ও স্নেহের গোপালের সহিত চিরদিনের জন্য মিলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং শ্রীমা গোপালের-মার স্নেহ-মায়াময়ী জননীরূপে সমাগতা। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তখন অনেক পৃথক বা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী পরিণত হইয়াছে তখন স্বর্গে এবং পর্থিব সম্পর্ক তখন স্বর্গীয় সুষমায় সমাচ্ছন্ন। শ্রীমা গোপালের মাকে আশীর্বাদ করিয়া ধীর পদক্ষেপে অন্তর্হিত হইলেন।

গোপালের-মার ইচ্ছানুযায়ী অন্তিম সময়ে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। গঙ্গাতীরে গোপালের-মার জন্ম এবং আজীবন গঙ্গাতীরে বাস করিয়াই গঙ্গাজল পান ও গঙ্গাজলে রন্ধনাদি কার্য করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। গোপালের-মা সেই কথা বিশ্বাস করিতেন। সেইজন্য জীবন-সায়াহ্নে গঙ্গাতীরে বাসই গোপালের-মার কাম্য। সারদানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য সকলে গোপালের-মাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং নগ্নপদে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া গোপালের-মার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে শয্যা রচনা করিয়া দিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট দুইদিন ঐ গঙ্গাতীরেই গোপালের-মার শয্যাপার্শ্বে অবস্থান করিয়া নিবেদিতা অক্লান্তভাবে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ৮ই জুলাই (১৯০৬) গোপালের-মার মহাপ্রয়াণের দিন সমাগত হইল। রাত্রির অন্ধকার তিরোহিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রভাতের আলোক উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া সূর্যদেব পূর্বগগনে উদিত হইতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়ে গোপালের-মার শরীর পবিত্র জাহ্নবীসলিলে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় স্থাপন করা হইল। তাঁহার দুই হস্ত বক্ষে জপমুদ্রায় স্থাপিত হইল। তখন গোপালের-মার বদনমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিচ্ছটায়

সমুদ্ভাসিত। সমবেত ভক্তগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ-ব্রহ্ম' এবং সেই শব্দ গঙ্গাবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া উচ্চারিত হইল 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ-ব্রহ্ম'। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের-মার পবিত্র আত্মা শাশ্বত আনন্দলোকে চিরদিনের জন্য মিশ্রিত হইল। বিশ্বরূপিণী মা শ্রীসারদাদেবীর নিকট গোপালের-মার নিদারুণ মহাপ্রয়াণের সংবাদ উপস্থিত হইল। শ্রীমা সেই সংবাদ শুনিয়া সাশ্রুনয়নে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা সারদা ও লক্ষ্মীমণি দেবী ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদার পাদপ্রান্তে স্থান লাভ করিয়া যে সকল ভক্ত-নরনারী তাঁহাদিগের জীবনকে ধন্য করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্মীমণি দেবী অন্যতমা। তিনি সকলের নিকটে পরে 'লক্ষ্মীদিদি' নামে পরিচিত ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই লক্ষ্মীদেবী শীতলা ও রঘুবীরের পূজায় আনন্দে ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষিণী ছিলেন, অথচ মেধা ও বুদ্ধি ছিল তাঁহার প্রখর ও অসামান্য। গ্রাম্যপাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য বাংলা ধর্মগ্রন্থ তিনি ভালভাবে পাঠ করিতে পারিতেন।

লক্ষ্মীদিদির বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখনই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই লক্ষ্মীদিদি বেশীরভাগ সময় সাধন-ভজনে সময় অতিবাহিত করিতেন ও সময় পাইলেই ছায়ার ন্যায় পার্শ্বে থাকিয়া সর্বদা শ্রীমার কাজে-কর্মে সহায়তা করিতেন। দক্ষিণেশ্বরের কথা উল্লেখ করিয়া লক্ষ্মীদিদি বলিতেন: "আমি শ্রীমার সঙ্গে নহবত-ঘরে থাকিতাম। ঘরটি অতি ক্ষুদ্র; তদুপরি উহা নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয় আহার্য-দ্রব্য দ্বারা প্রায় ভরা থাকিত। সেইখানেই মা রান্নাদি করিতেন এবং আমি তাঁহাকে সেই কার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতাম। ঐ সময় সারাদিন ভক্তসমাগম হইত এবং ভক্তগণের রুচি ও স্বাস্থ্যানুযায়ী তাঁহাদের জন্য আমরা পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থা করিতাম। নহবত-ঘরটি এত অল্পপরিসর যে, ঠাকুর উহাকে একটি পিঞ্জরের সঙ্গে তুলনা করিয়া আমাদিগকে রহস্য করিয়া শুক-সারী

বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু সেই শারীরিক অসুবিধার কথা একমুহূর্তের জন্যও আমার মনে জাগে নাই। এইরূপ পবিত্র স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীমার নিকট হইতে সর্বপ্রকার কাজ-কর্ম শিক্ষা করিবার এবং ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশ দিনের পর দিন শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ কোটিজন্মের সুকৃতির ফলে হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতাম।"

সত্যই বিশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর পবিত্র সেবার অধিকার লাভ করিয়া লক্ষ্মীদিদি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে দিব্যভাবের উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া কখনও কীর্তানানন্দে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন, কখনও মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া থাকিতেন, অথবা কখনও যোগ, ভক্তি, জ্ঞান বা কর্মের মর্মকথা সন্তান ও ভক্তগণকে শুনাইতে শুনাইতে ভাবে ও গভীর সমাধিতে মগ্ন হইতেন তখন শ্রীমার সহিত লক্ষ্মীদিদিও নহবত-ঘরের বাঁশের ঝাঁপড়িতে অঙ্গুলিপ্রমাণ ছিদ্র দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ সকল দিব্য-ভাবের লীলামাধুর্য দর্শন ও উপভোগ করিয়া আত্মহারা হইতেন।

জয়রামবাটীতে শ্রীমার সহিত যখন লক্ষ্মীদিদি কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন তখন অজস্র কর্তব্যকর্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও শ্রীমা ও লক্ষ্মীদিদির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা করিবার বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। শ্রীমা বলিতেন: "কাপারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগ্‌নে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে, বললে 'মেয়ে-মানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে (বই) কিনে আনলুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত।" শ্রীমা পুনরায় বলিতেন: "ভাল করে (লেখাপড়া) শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একা একা আছি। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে।

সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাক পাতা বাগান হতে যা আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।” কামারপুকুরে অবস্থান-কালেও শ্রীমা বিদ্যাচর্চার অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। তখন রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি সুর করিয়া পড়িতেন এবং লক্ষ্মীদিদি ও অপর সকলে শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

তাহাছাড়া দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কিভাবে উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সাংসারিক বিষয়ের খুটিনাটি বিষয়ে শ্রীমাকে শিক্ষা দিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া লক্ষ্মীদিদি একদিন একজন সন্ন্যাসী-সন্তানকে বলিয়াছিলেনঃ “ঠাকুর সদাসর্বদা মাকে সংসারের অনিত্যতা ও দুঃখ-কষ্টের কথা বলে বুঝাতেন—‘বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিই সার’। বলতেন, শেয়াল-কুকুরের মত কতকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা বিইয়ে কি হবে? মায়ের মার অনেক ছেলেমেয়ে হয়েছিল—কয়েকটি মারাও গিয়েছিল। মা তাঁর সেই ছোট ছোট ভাই-বোনদের কোলে-কাঁকে করেছেন, তাদের মৃত্যুতে তাঁর মা-বাপের শোক-কষ্টও দেখেছেন, নিজেও শোকতাপ করেছেন,—সেই সকল উল্লেখ করে ঠাকুর বলতেন, ‘তোমারও অনেক ঘাটাঘাটি হয়েছে। হাঙ্গামের দরকার কি? ওসব না হলে আছ ঠাকৃরুণটি’। মা-ঠাকৃরুণ সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কামারপুকুরের সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। একদিন সকালবেলা মা বাড়ীর ভিতরে ন্যাতা দিচ্ছেন (গোবরমাটি দিয়ে লেপছেন), ঠাকুর বাইরে দাঁতন করছেন, আর নানারূপ রঙ্গরসের কথা বলে সকলকে হাসাচ্ছেন। মা-ঠাকৃরুণকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘ছেলের অন্নপ্রাশনে যে কোমরে গোট পরে নাচবে গাইবে সেই ছেলে মরে গেলে সেই কোমর ভুঁইয়ে আছড়ে কাঁদতে হবে’। লজ্জাশীলা মা নীরবে সব শুনছিলেন। ঠাকুর বারংবার ছেলের মৃত্যুর কথা বলতে থাকলে তিনি অবশেষে আস্তে আস্তে বললেন, ‘সবগুলোই কি আর মরে যাবে?’ মার কথা

বের হতে না হতেই ঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে, জাতসাপের ন্যাজে পা পড়েছে রে, জাতসাপের ন্যাজে পা পড়েছে! ওমা আমি বলি, সাদাসিদে ভালমানুষ, কিছু জানে না,—পেটের ভেতর সব আছে! বলে কিনা, সবগুলো কি আর মরে যাবে?' মা ছুটে পালিয়ে গেলেন।"

এই সকল বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগ-তপস্যাদীপ্ত জীবনাদর্শ এবং কামগন্ধহীন স্বার্থশূন্য নির্দেশ, উপদেশ ও প্রেরণা লাভ করিয়া শ্রীমা ধর্মচিন্তায় ও অধ্যাত্মসাধনায় আপনাকে বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেজন্যই দেখি যে, শ্রীমার অনাঘ্রাত ও অম্লান কুসুমতুল্য পুত-পবিত্র জীবনের কর্ম ও আচরণ কোনদিনই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, বরং উদার-উদ্ভিন্ন আলোকমালার মত তাঁহার সর্ববিস্তারী হৃদয় ও চিন্তা সকল জ্ঞানলিপ্সু মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিল ও পবিত্র করিয়াছিল।

লক্ষ্মীদিদির সহিত শ্রীমার সম্বন্ধ ছিল একান্তভাবে মধুর ও নিবিড়। একবার শ্রীমা স্ত্রীভক্তগণের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর যে তাঁহাকে ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন সেই ঘটনা সরলা বালিকার মত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীমা বলিলেন, কিভাবে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার পদযুগলে আলতা দিয়া কপালে সিন্দুর পরাইয়াছিলেন, অঙ্গে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়াছিলেন এবং মুখে পান ও মিষ্টি প্রদান করিয়া ও আসনে বসাইয়া জগন্মাতাজ্ঞানে দিব্যভাবে পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীমার নিকট হইতে সেই বর্ণনা শুনিয়া লক্ষ্মীদিদি সহাস্যে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "তুমি তো অত লজ্জা কর, কাপড় কি করে পরালেন গো?" শ্রীমা পূর্বেকার মতো সরলভাবে বলিয়াছিলেন: "আমি তখন কি রকম যেন হয়ে গিছলুম।" শ্রীমা যে তখন বিশ্বসংসারের উর্ধে সমাধির আনন্দলোকে আত্মহারা ছিলেন তাহারই আভাস দিলেন তিনি লক্ষ্মীদিদি ও সমাগত সকলকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে ও শ্যামপুকুরের বাটীতে অসুস্থ ছিলেন তখন শ্রীমাকে সকল কার্যে সাহায্য করিবার জন্য

লক্ষ্মীদিদি সর্বদা শ্রীমার সঙ্গে থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যলীলার অবসানের পর শ্রীমার সহিত লক্ষ্মীদিদিও কয়েকবার তীর্থভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন ও পরে গঙ্গাসাগর, নবদ্বীপ, প্রয়াগ, গয়া, কাশী, জয়পুর, হরিদ্বার, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি উত্তর ও মধ্যভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহাসমাধির পূর্বমুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে নিকটে ডাকিয়া একদিন বলিয়াছিলেন: "তুমি কামারপুকুরে থেকো, আর লক্ষ্মীর দিকে একটু নজর রেখো। ওকে খেতে দিতে হবে না, তবে সে যেন বাড়ী থেকে কোথাও না যায়। আমাকে ভক্তরা যেমন ভক্তি করছে, ও তোমাকেও তেমনি ভক্তি করবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ শ্রীমা তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদিদি ও আদ্যাশক্তিরূপিণী শ্রীমার মধ্যে সম্পর্ক ছিল সেইজন্য চিরদিন মাতা ও কন্যার মতো এবং বিশ্বরূপিণী শ্রীমার আদেশ, উপদেশ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া লক্ষ্মীদিদি পরমসিদ্ধিলাভের পথে জীবনকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন।

শ্রীমা, লক্ষ্মীদিদি ও রামলাল দাদা তিনজনে একদিন কামারপুকুরের বাটীতে বসিয়া আছেন—এমন সময়ে একভক্ত শ্রীমার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিলেন। ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে শ্রীমা তাহাকে অকস্মাৎ বলিলেন: "বৈকুণ্ঠ, আমায় ডাকিস।" পরমুহূর্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শ্রীমা পুনরায় বলিলেন: "ঠাকুরকে ডেকো, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।" সেই কথা শুনিয়া লক্ষ্মীদিদি শ্রীমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন: "না মা, একি কথা? এ' তো বড় তোমার অন্যায়। ছেলেদের এমন করে ভোলান,—তারা কি করবে?" শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন: "কই, আমি কি করলুম?" লক্ষ্মীদিদি উত্তর দিলেন: "মা, তুমি এই মুহূর্তে বৈকুণ্ঠকে বললে, 'আমায় ডাকিস', আবার বলছ—'ঠাকুরকে ডেকো'।" শ্রীমা লক্ষ্মীদিদির কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে একটু অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্মীদিদি শ্রীমার অন্তরের ভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি

শ্রীমার কথার মর্ম বৈকুণ্ঠবাবুকে বুঝাইয়া বলিলেন : 'শ্রীমার মুখনিসৃত বাণী বিফল হইবার নয়। শ্রীমাকে আদ্যাশক্তি ভগবতী ভাবিয়া চিন্তা ও পূজা করিবেন।' লক্ষ্মীদিদির কথা শ্রীমা নীরবে শুনিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। বৈকুণ্ঠবাবুও তখন হইতে শ্রীমাকে ভগবতীজ্ঞানে চিন্তা, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আরাধনা করিতে লাগিলেন। শ্রীমা আপনার দিব্যস্বরূপের কথা ভক্তের নিকট করুণা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য।

লক্ষ্মিমণি বা লক্ষ্মীদিদি বহুগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। লক্ষ্মীদিদির প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন : "Amongst the ladies who lived more or lese continuously * * Sister Lucky, or Lakshmididi, as is the Indian form of her name, was indeed a niece of his, and is still a comparatively young women. She is widely sought after as a religious teacher and director, and is a most gifted and delightful companion. Sometimes she will repeat page after page of some sacred dialogue, out of one of the Jatras, or religious Operas, or again she will make the quite room ring with gentle merriment, as she poses the differnt members of the party in groups for religious *tableaux.* Now, it is Kali, and again Sarasvati, another time it will be Jagadhattri, or yet again, perhaps, Krishna under his Kadamba tree, that she will arrange, with picturesque effect and scant dramatic material.

"Amusements like these were much approved of, it is said, by Sri Ramakrishna, who would sometimes himself, according to the ladies, spend hours in reciting

religious plays, taking the part of each player in turns, aud making all around him realize the utmost meaning of the players. and worship uttered in the poetry"[২]; অর্থাৎ "যে-সকল মহিলা এই সময়ে প্রায় সর্বদা শ্রীমা সারদাদেবীর বাড়িতে বাস করিতেন, তাঁদের মধ্যে গোপালের-মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি ও অপর কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই বিধবা, তন্মধ্যে প্রথমা ও শেষোক্তা বাল-বিধবা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীতে ছিলেন তখন ইঁহারা সকলে তাঁহার অনুগ্রহপ্রাপ্তা শিষ্যারূপে গৃহীতা হন। লক্ষ্মীদিদি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং তখনও তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা। ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষালাভের জন্য অনেকে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে এবং সঙ্গিনী হিসাবে তিনি অশেষগুণসম্পন্না ও আনন্দপ্রদায়িনী। তিনি কখনও পালাগান বা যাত্রা-পুস্তক হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিয়া যান, কখনও পৌরাণিক মূকাভিনয়ে একা বিভিন্ন অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নীরব কক্ষে মৃদু আনন্দলহরী তুলেন। তিনি কখনও কালী সাজেন, কখনও সরস্বতী, কখনও জগদ্ধাত্রী, আবার কখনও বা কদম্বতলবাসী শ্রীকৃষ্ণ; অথচ অভিনয়োপযোগী প্রায় কোন পোষাক ব্যতীতই তিনি যথাচিত বাস্তবতার অবতারণা করেন।"

আর একবার লক্ষ্মীদিদি বৃন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া পালাগান আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রূপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল দেবীভাবাপন্ন, কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মিষ্ট, স্মরণশক্তি ছিল প্রখর এবং অপরের হাবভাব ও কথা নকল করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি দুই তিনঘণ্টা গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করিতে পারিতেন। সেইবার শ্রীমাও সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতার ইচ্ছানুযায়ী

---

2. Vide *The Master As I saw Him* (Udbodhan Office, 1959), pp. 146-147 এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ: 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' (১৩৫৯), ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৭

পরে লক্ষ্মীদিদি রামপ্রসাদের একটি শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীদিদির লীলাসংবরণের দিন যত নিকটতর হইতে লাগিল ততই তিনি দিবারাত্রি ধ্যান, জপ ও কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় অবৃত্তি করিতেন। লক্ষ্মীদিদি স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট বলিয়াছিলেন ঃ "আমি যা-কিছু জেনেছি বা শিখেছি, সবই ঠাকুর হতে।" লক্ষ্মীদিদি জীবনের সায়াহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর কথা বলিতে বলিতে ভাবসমুদ্রে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন। সাধক কমলাকান্তের একটি গানে আছে,

আপনাতে আপনি থেকো, যেও নাক কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

সত্যই একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাশীলা সাধিকা লক্ষ্মীদিদি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর পবিত্র আশীর্বাদে আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় আনন্দময় ভগবানের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সংসারবন্ধনের পারে উপনীত হইয়াছিলেন। বিশ্বের নারীসমাজে তিনি চিরদিন আদর্শস্থানীয়া ও পূজ্যা হইয়া থাকিবেন।

উপসংহার

কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর পুণ্যপদচ্ছায়ায় অতীতের কত কথা ও স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। একদিকে কামারপুকুর-গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া ভূতির খাল, আমোদর-নদ, মাণিকরাজার লুপ্তপ্রায় আম্রকানন, লাহাবাবুদের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ, ধনী কামারিণীর বাটী, যুগীদের শিবমন্দির, হালদারপুকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তরোপিত আম্রবৃক্ষ প্রভৃতি এবং অপর দিকে জয়রামবাটীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীসারদাদেবীর পুরাতন ও নূতন বসতবাটী, সারি সারি তালবৃক্ষশোভিত তালপুকুর, দেবী সিংহবাহিনীর স্মৃতিবিজড়িত মন্দির ও প্রতিমা এবং জয়রামবাটীর চতুর্দিকে শস্যশ্যামলা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর প্রভৃতি ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর দিব্যজীবনের অবিস্মরণীয় কাহিনী ও লীলামাধুর্যের আনন্দস্মৃতি বহন করিতেছে। ভক্তিপথের ও অধ্যাত্মসাধনার পথচারী যাঁহারা, যাঁহারা অতীতের পুণ্যস্মৃতির প্রেরণায় আপনাদিগের জীবন ধন্য ও প্রদীপ্ত করিতে চান, কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর এই উভয় পূণ্যলীলাক্ষেত্র তাঁহাদিগের নিকট পরম-তীর্থস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তিসাধনার ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর-উদ্যানবাটী, শ্যামপুকুরবাটী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর পদধূলিসিক্ত কলিকাতার বিভিন্ন পথ ও স্থানগুলি স্মৃতি ও শ্রদ্ধার সামগ্রী। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর ত্যাগদীপ্তজীবন সন্তান ও ভক্তগণ যে কলিকাতা ও বাঙলাদেশকে কেন্দ্র রচনা করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের জীবন শান্তিময় করিয়াছিলেন তাহাও স্মৃতির ফলকে চিরদিন জাগ্রত থাকিবে। তাহার পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে সমন্বয়মন্ত্রের সাধনা বিশ্ববাসীর জীবনে এক নবচেতনার সঞ্চার করিয়াছে ও ভবিষ্যতে করিবে সেই সাধনার মৃত্যুঞ্জয়-অমৃতমন্ত্রেই তিনি অভিষিক্ত করিয়াছিলেন আপনার দিব্যলীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীকে। মহাবিদ্যারূপিণী বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহা-সমাধির পর সেই সমন্বয়সাধনার মহামন্ত্রই বিশ্বের সকল নরনারীকে বিতরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অপার স্নেহ-করুণা, দিব্যপ্রেরণা ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার ত্যাগব্রতী সন্তানগণ এবং অসংখ্য সেবক ও সেবিকাগণ তাঁহাদিগের পরমকল্যাণময় জীবনসিদ্ধির পথের সন্ধান পাইয়াছিল ও জীবনে পরমশান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। স্মৃতিচারণায় বিশ্বরূপিণী ও মহাশক্তির অধিশ্বরী শ্রীসারদা-দেবী ও তাঁহার স্নেহের সন্তান ও ভক্তগণের এই 'জীবনস্মৃতি' বিশ্বের প্রতিটি নর-নারীকে প্রেরণাদীপ্ত করিয়া শান্তি দান করুক এবং তাঁহাদিগের জীবনচিন্তা, জীবনকর্ম ও জীবন-সাধনাকে সার্থক ও আনন্দসিক্ত করুক ইহাই আমাদের অন্তরের একান্ত কামনা।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

যে সকল শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি তাঁহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থগুলির নাম :

১। **স্বামী বিবেকানন্দ :**

(ক) বীরবাণী (উদ্বোধন কার্যালয়)

(খ) *Complete Works of Swami Vivekananda,* Vol. I-VII (Advaita Ashrama)

২। **স্বামী সারদানন্দ :**

(ক) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম-৫ম ভাগ (উদ্বোধন কার্যালয়)

(খ) ভারতে শক্তিপূজা (উদ্বোধন)

৩। **স্বামী অভেদানন্দ :**

(ক) আমার জীবনকথা (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা)

(খ) পত্র-সংকলন (ঐ)

৪। **স্বামী তেজসানন্দ :**

শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা (বেলুড় মঠ)

৫। **স্বামী গম্ভীরানন্দ :**

(ক) শ্রীমা সারদাদেবী (উদ্বোধন)

(খ) ভক্তমালিকা, ১ম ও ২য় ভাগ (উদ্বোধন)

(গ) *Sri Sarada Devi* (Madras Math, Mylapore)

৬। **স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ :**

মন ও মানুষ (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)

৭। **ভগিনী নিবেদিতা :**

(ক) *The Master as I saw Him* (Udbodhan)

(খ) *Footfalls of Indian History* (Advaita Ashram)

৮। **পরিব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা :**

ভগিনী নিবেদিতা

৯। **শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :**
লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড (আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা)

১০। **আশুতোষ মিত্র :**
শ্রীমা (কলিকাতা)

১১। **শ্রীমণি বাগচী :**
Nivedita (English)

১২। **শ্রীমতী লিজেল রেমঁ :**
নিবেদিতা (বসুমতী সাহিত্য-মন্দির)

১৩। **ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য :**
(ক) বাঙলার দুই ঠাকুর, (কলিকাতা)
(খ) শ্রীসারদাদেবী (কলিকাতা)

১৪। *The Great Women*
(Advaita Ashram)

১৫। ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ (উদ্বোধন)

১৬। স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র (উদ্বোধন)

১৭। শ্রীশ্রীমায়ের কথা (প্রকাশক স্বামী আত্মবোধানন্দ, উদ্বোধন)

১৮। প্রার্থনা ও সঙ্গীত (রামকৃষ্ণ মিশন, বিদ্যাপীঠ)

১৯। **স্বামী সারদেশ্বরানন্দ :**
শ্রীশ্রীচৈতন্য

২০। **দুর্গাপুরী দেবী :**
গৌরী-মা (সারদেশ্বরী আশ্রম, কলিকাতা)

২১। K. Okakura :
The Ideals of the East (London, 1903)

২২। **চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় :**
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা

২৩। বিশ্ববাণী (পত্রিকা) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

২৪। উদ্বোধন (পত্রিকা) : বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, উদ্বোধন (পৌষ, ১৩৭০)

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

॥ নিবেদন ॥

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৭	১৪	সম্পাকিত	সম্পর্কিত

॥ ভূমিকা ॥

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১৫	২৪	ঘটনাপারম্পর্যের	ঘটনাপারম্পর্যের
১৬	২৬	রে	বরে
২১	৩	তার!	তারা

॥ মূলগ্রন্থ ॥

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৫	১১	শঙ্কর	'শঙ্কর' শব্দ বাদ যাবে
১২	১৪	পরিস্কার	পরিষ্কার
৪৮	২৩	দক্ষিণ দিকে	উত্তর দিকে
৫৪	২৭	মনোমালিণ্যের	মনোমালিন্যের
৫৬	১৩	পরিষ্কাভাবে	পরিষ্কারভাবে
৬০	২৫	সুগস্ক	সুগন্ধ
৬২	৭	খেলো রাম	খোলো খোলো রাম
৭৪	৯	ধণাঙ্করে	দণাঙ্করে
৯১	৬	fash	flash
১১৬	৪	আকাশচুমী	আকাশচুম্বী
১২৭	১০	মূহুর্ত	মুহূর্ত
১৩৩	ফুটনোটে	উদ্বোধনে	উদ্বোধন,
১৩৪	২৩	একমহূর্তেও	একমুহূর্তেও
১৩৭	১৪	বিন্তু	কিন্তু
১৪৮	৩	গাহস্থ্যধর্ম	গার্হস্থ্যধর্ম
১৫১	৩	শীরর	শরীর
১৫১	৪	ব্রাহ্মানন্দ	ব্রহ্মানন্দ